বিদ্যামন্দির পত্রিকা

২০১৭-১৮

রামকৃষ্ণ মিশন

বিদ্যামন্দির পত্রিকা
২০১৭-১৮

বিদ্যামন্দির পত্রিকা ২০১৭-১৮

VIDYAMANDIRA PATRIKA 2017-18

आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি আবাসিক স্বশাসিত কলেজ)

বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

Ramakrishna Mission Vidyamandira

(A Residential Autonomous College affiliated to Calcutta University)

Belur Math, Howrah-711 202 • Phone : 2654-9181/9632

Website : www.vidyamandira.ac.in • e-mail : vidyamandira@gmail.com

প্রকাশক ঃ স্বামী দিব্যানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

মুখ্য সম্পাদক ঃ অধ্যাপক দুর্গাশঙ্কর চক্রবর্তী

পত্রিকা উপসমিতির সদস্যবৃন্দ ঃ

সুব্রত রায়চৌধুরী, প্রিয়ব্রত ঘোষাল, সুদীপ ভট্টাচার্য্য, শামিম আহমেদ, সন্দীপন সেন, দীপঙ্কর মল্লিক, শুভঙ্কর রায় (বাংলা), সৈয়দ শাহিদ রিয়াজ, বিপ্লব কোটাল, অঞ্জন দাস, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, অসীম কুমার চৌধুরী, গোপাল চন্দ্র বাইন, রাজেশ কর্মকার, অরিন্দম রায়, সাগর বিশ্বাস, অভিনব সিন্‌হা, সৌগত মিত্র, অর্ণব সাধুখাঁ, পুষ্পজিৎ হালদার, অনির্বাণ সামন্ত, তপন কুমার ঘোষ (আমন্ত্রিত)

প্রকাশ ঃ ১৩ই এপ্রিল ২০১৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ অধ্যাপক সুব্রত রায়চৌধুরী

ISSN No. 2321-9076

মুদ্রক ঃ সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট, ৯/৩, কে. পি. কুমার ষ্ট্রীট, বালি, হাওড়া
দূরভাষ ঃ ২৬৫৪-৩৫৩৬

সম্পাদকীয়

সময়ের হাত ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি একুশের এক একটি বছর। সেই অগ্রগতির পথরেখায় নানা বর্ণে, নানা রঙে আমাদের ভাবনা-চিন্তা, মন-মনন, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি বদলে যেতে থাকে। এই বদলটাই স্বাভাবিক। আমাদের সৃষ্টির ভুবন কত ভাবনার অনুভূতিতে সব সময় বহুরঙা প্রজাপতির মত বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই বৈচিত্র্যের বর্ণবৈভবে সাজানো রয়েছে আমাদের মননের সাজঘর। বিদ্যামন্দির পত্রিকা আমাদের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-ছাত্রদের নির্মাণ-স্বাতন্ত্র্যের এক অভিনব আয়োজন।

একাধিক স্নাতকোত্তর বিভাগ, এম.ফিল., পিএইচ.ডি. ডিগ্রি গবেষণার ক্ষেত্রভূমি এই বিদ্যামন্দির যেন প্রাচীন ভারতীয় তপোবন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সভ্যতা-সম্পৃক্ত জ্ঞানদীপ্ত এক প্রতিষ্ঠান। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নসৌধ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বঙ্গের ভূখণ্ড ছাড়িয়ে বিশ্বের আঙিনায় পৌঁছানোর কৃতিত্ব অর্জন করেছে। অত্যন্ত গৌরবের বিষয় হল, এবছর (২০১৮ সাল) National Institutional Ranking Framework (NIRF)-এর বিচারে ডিগ্রি কলেজ বিভাগে বিদ্যামন্দির সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নবম এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের মুখপত্র হল বিদ্যামন্দির পত্রিকা। এই পত্রিকার বিষয় গৌরব ভিন্ন মন-মেজাজের পরিচয় বহন করে। বাংলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় পত্রিকার লেখাগুলি বিন্যস্ত হয়েছে।

বাংলা বিভাগে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, ভ্রমণকাহিনিতে ভরপুর এই পত্রিকার বিষয় বহু বৈচিত্র্যমুখী। সাতটি কবিতা, বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ, তিনটি গল্প ও দুটি ভ্রমণকাহিনি এই পত্রিকার নিজস্ব নির্মাণশৈলীতে অনন্যসাধারণ। তিনটি ভিন্ন স্বাদের নাটক পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে।

দশটি ইংরাজি রচনা এই পত্রিকার কৌলীন্য বৃদ্ধি করেছে। অধ্যাপক বীরেন্দ্র সিং চৌহান ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্র পাল সিং-এর Convocation Address নিঃসন্দেহে ঝিনুকে মুক্তোর মতো অলংকৃত করার দাবি করে।

সংস্কৃত বিভাগের লেখাগুলি ক্লাসিক শব্দ সংযোজনায় রস-সৃজনের চমৎকার অনুভূতিতে সহৃদয় হৃদয়সম্বাদী পাঠকের চিত্তমুকুরে প্রতিবিম্বিত হওয়ার দাবি রাখে। এ পত্রিকার এই ছয়টি মূল্যবান লেখা নিঃসন্দেহে বিদ্যামন্দিরের দৃষ্টিকোণকে চিনিয়ে নেবার অন্যতম স্মারকচিহ্ন হয়ে উঠবে।

বিদ্যামন্দির পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে এগিয়ে চলেছে শতবর্ষের গন্তব্যের পথে। কর্মে-সাধনায়-সৃজনে-গবেষণায় এক আলোর পথের দিশারী এই মহাবিদ্যালয়, বর্তমানে যা একটি বিশ্ববিদ্যালয়-কল্প হয়ে উঠেছে। বিদ্যামন্দির পত্রিকার এই সৃজন উৎসবে যে সকল মনন-ঋদ্ধ রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাতে কোন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি থেকে গেলে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। বিদ্যামন্দিরের অধিদেবতার কাছে বিনম্র প্রার্থনা—এই সর্বাঙ্গীন কর্মপ্রয়াস নদীর স্রোতধারার মত চিরচলিষ্ণু হয়ে থাকুক।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বাংলা বিভাগ

কবিতা

মায়ের প্রতি	নিত্যানন্দ নস্কর	১
যন্ত্রের জীবন	শৌভিক সিংহ	২
হপ্তার পাঁচালী	উজ্জ্বল মণ্ডল	২
তবুও কাঁদে কেন	অমিত আইচ	৩
মঙ্গলচিহ্নেরা	মইজুদ্দিন মোল্লা	৪
একশো বছর পরে	অঙ্কন রায়	৬
ফরমুলা To ফেমাস	সৈকত হালদার	৮

প্রবন্ধ

বিশ্বায়ন ও কিছু দার্শনিক প্রসঙ্গ	অরূপ কুমার ধবল	৯
শিক্ষার আলোকে স্বামী বিবেকানন্দ	সন্তু কান্ডার	১৩
দর্শন কী এবং কেন?	সৌভিক দত্ত	১৬
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে নবধাভক্তি	সৌমেন অধিকারী	১৯
ভাষা আন্দোলন ঃ ইতিহাস ও প্রয়োজনীয়তা	সৌরভ দাস	২৪
কবিতায়' ২১	সুদীপ্ত দে	২৭
বহুভাষিক রাষ্ট্রে মাতৃভাষা চর্চা	শঙ্কর মণ্ডল	৩১
কান্টের ভাবনায় পরার্থ-দর্শন	সৌমেন পাল	৩৪

গল্প

সম্মান-অসম্মান	শুভঙ্কর ঘোড়ুই	৩৮
'বর্ণপরিচয়'	সুরজিৎ দাস	৪৩
গাঁইতি	শুভম সরেন	৪৮

নাটক

সম্ভবামি যুগে যুগে	স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, সৌম্যদীপ দাস	৫১
কল্পশব্দদ্রুম!	অর্করূপ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৫
রাখহরি ফিল্ম কর্পোরেশন	ছান্দস ভট্টাচার্য	৮৯

ভ্রমণকাহিনি

সবুজ পাহাড় ডাকে	অর্ণব সাধুখাঁ	১০০
শ্রীক্ষেত্র ভ্রমণ	নীলাদ্রি শেখর চক্রবর্ত্তী	১০২

ENGLISH SECTION

The 'Congress Exhibition' of Calcutta, 1901 & 1906	Prithwiraj Biswas	১০৫
BOLSHEVISM AND UNREST IN THE INDIAN LABOUR WORLD	Debasis Pal	১১০
Sister Nivedita : The Cauldron of Patriotism	Spandan Banerjee	১১৬
The Wavy Puri	Arkaprabha Adhikari	১১৯
Modern Science and Ancient Indian Culture	N.V.V.J. Swamy	১২১
Hey Ram : Gandhi & India Today	Dipanjan Muhuri	১২৯
Penetration Testing Methodology	Sourav Chabri	১৩৩
Speed of Light	Sudarshan Sarkar	১৩৫
Fourth Convocation Address on 10 December 2016	Prof Virendar Sing Chauhan	১৩৮
5th Convocation Address on 8th December 2017	Prof Dhirendra Pal Singh	১৪১

संस्कृत विभाग:

श्रीजीवगोस्वामिपाददिशा श्रीभगवत्स्वरूपपर्यालोचनम्	ड. हरेकृष्ण पट्टजोशी	১৪৫
'ध्रुवमपायेऽपादानम्' इति सूत्रे ध्रुवग्रहणतात्पर्यम्	असीमरुइदास:	১৫৫
श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्दयो: निवेदिता	सौभिकविश्वास:	১৬১
"समासे श्रीबुद्ध:"	सिद्धार्थ:वैराग्य:	১৬৩
सार्धशततमजन्मवर्षे भगिनी निवेदिता	श्रेयान् वन्दयोपाध्याय:	১৬৪
भारतीयनाट्योत्पत्तिविषयकपर्यालोचनम्	अर्घ्य-गुप्त:	১৬৭
अवस्थात्रयविचार:	बाप्पा राजवंशी	১৭০
"संङ्कृतम्" - यत्र मातृभाषा	भास्करच्याटार्ज्जिन:	১৭৩
रूपकालंकारस्वरूपविमर्श:	सन्दीपजाना	১৭৫

অমৃতকথা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ

সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেযে পরিশ্রান্ত হয় ; যখন কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হ'য়ে কেবল দুঃখ পায়, তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। অনেকের ভোগ না করলে ত্যাগ হয় না। ... কিন্তু কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ! এই আছে, এই নাই! ...

কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মশায়, ঈশ্বর কেন এমন সংসার করলেন? আমাদের কি কোনও উপায় নাই?' আমি বলি, উপায় থাকবে না কেন? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়,—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। ...

যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না, অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটির ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভিতরটি দেখতে পায়! কিন্তু যারা জ্ঞান লাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে, তারপর সংসারে আছে, তারা যেন শার্সির ঘরের ভিতর বাস করে। ঘরের ভিতরও দেখতে পায়, ঘরের বাহিরের জিনিসও দেখতে পায়। জ্ঞান-সূর্যের আলো ঘরের ভিতরে খুব প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি ঘরের ভিতরের জিনিস খুব স্পষ্টরূপেদেখতে পায়,—কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি নিত্য, কোন্‌টি অনিত্য।

ঈশ্বরই কর্তা আর সব তাঁর যন্ত্রস্বরূপ।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

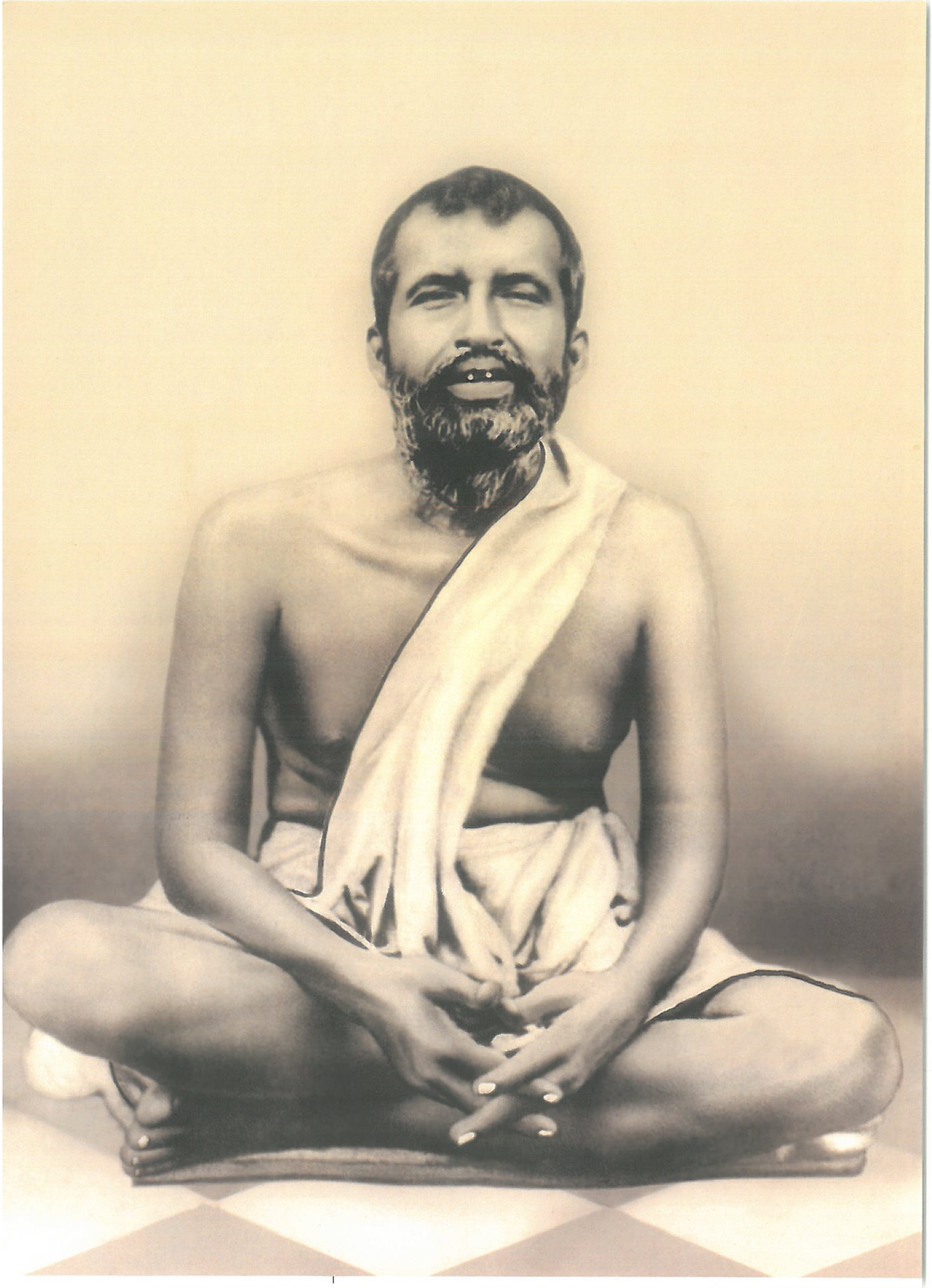

The Presidents of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission

Swami Brahmananda
(1901–1922)

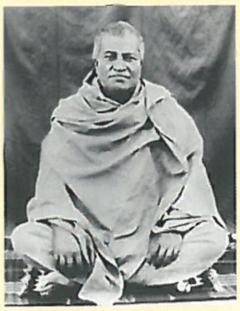

Swami Shivananda
(1922–1934)

Swami Akhandananda
(1934–1937)

Swami Vijnanananda
(1937–1938)

Swami Shuddhananda
(1938–1938)

Swami Virajananda
(1938–1951)

Swami Shankarananda
(1951–1962)

Swami Vishuddhananda
(1962–1962)

Swami Madhavananda
(1962–1965)

Swami Vireshwarananda
(1966–1985)

Swami Gambhirananda
(1985–1988)

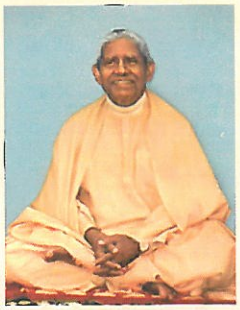

Swami Bhuteshananda
(1989–1998)

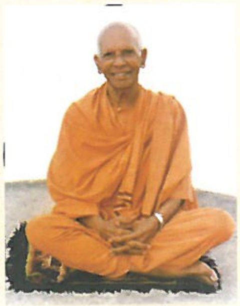

Swami Ranganathananda
(1998–2005)

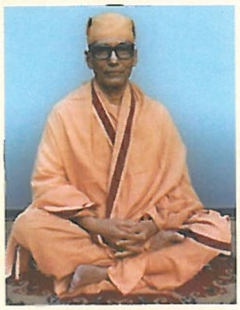

Swami Gahanananda
(2005–2007)

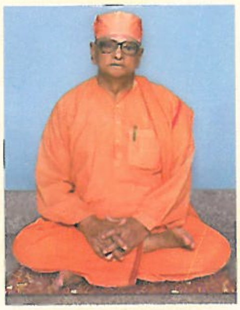

Swami Atmasthananda
(2007–2017)

Swami Smaranananda
(20017–)

কবিতা

মায়ের প্রতি

নিত্যানন্দ নস্কর
স্নাতকোত্তর বাংলা, প্রথম বর্ষ

মাগো, আমরা তোমার দামাল ছেলে—হট্টগোলের রাজা।
তাই বলে কি মুখ ফিরিয়ে দেবে মোদের সাজা?
ওমা সত্যি বলো
ওমা সত্যি বলো, এইবেলাতে আমরা কি পর হবো?
তুমি যদি দূরে ফেলো; কার কাছে আর যাবো?
জানি দুষ্টু মোরা
জানি দুষ্টু মোরা, অবোধ অতি, খেয়াল-খুশি চলি—
অজ্ঞানতার বশে তোমায় নানান কথা বলি।
তুমি তাই বলে কি!
তুমি তাই বলে কি, নির্বোধদের রাখবে দূরে ঠেলে!
হতে পারি দুষ্টু—তবু আমরা তোমার ছেলে।
মাগো নাইবা হলাম
মাগো নাইবা হলাম—তোমার রাখাল, শরৎ, শশী, যোগীন—
তা বলে কি দেখবো নাকো ভবপারের সুদিন?
ওমা তাই তো বলি
ওমা তাই তো বলি, আমরা সবাই তোমার কৃপাবলে—
মহাকালকে জয় করবো আজব রণ-কলে।
তুমি কৃপা করো
তুমি কৃপা করো ওমা উমে—ওগো মা শঙ্করী
এই অভাগা দুর্জনেরা তোমার পায়ে পড়ি।
ওমা এই মিনতি
ওমা এই মিনতি—সূর্য যখন যাবে অস্তাচলে—
আমরা যেন ঠাঁই পাই মা, তোমার নীরব কোলে।

আমরা যেন ঠাঁই পাই মা...

যন্ত্রের জীবন

শৌভিক সিংহ
স্নাতকোত্তর বাংলা, প্রথম বর্ষ

পুকুরের পাশে থাকা পুঁই গাছটা গন্ধ হারিয়েছে পাঁকের কাছে,
থামছে না ঝড়, উড়ছে ধুলো, বিষাক্ত বাতাস
ঢুকছে নাকে, কষ্ট হচ্ছে,
বোধহয় জীবন থামবে এখানেই...।
এত অল্পতেই শেষ, পারবে তাহলে কে!
সূর্যের কাছে ভ্রমরের মতো এক টুকরো মেঘটাকে সরাতে।
ঘুমিয়ে আছে আজও ওরা, পারছে না কাঁদতে হাসতে,
ছটকাচ্ছে শুধু যন্ত্রণায়,
বিষাক্ত বাতাস নিতে পারছে না
পাষাণ প্রাণ—
তুলে দিতে পারি না বিশুদ্ধ জল এক ফোঁটা
তৃষ্ণার্ত শিশুর মুখে?
জীবন যন্ত্র, জীবন ব্যস্ত, জীবন যন্ত্রণার
কি করে ফুটবে সকালের পদ্ম
তুলে নেবে কারা চোখ ভেজা শিশুদের?
নাকি আজও মেঘটুকু আটকে থাকবে সূর্যের কাছে।

হপ্তার পাঁচালী

উজ্জ্বল মণ্ডল
স্নাতক বাংলা, তৃতীয় বর্ষ

সোমবার আসে জ্বর শরীরটা টনটন,
ইস্কুলে যেতে তাই দমে যায় মনটন।
মঙ্গলে বল দেখি পেট কেন কামড়ায়?
আগুনের ছ্যাঁকা কেউ দেয় বুঝি চামড়ায়।
বুধবারে কাশ এসে কী ভীষণ পাকড়ায়
পাঁজরের হাড়গুলো প্রাণপণে ঝাঁকড়ায়।
বেস্পতি এলে জানি চমকাবে শ্রীচরণ
চুন আর হলুদের তখনিত নিই স্মরণ।
শুক্কুরে মাথাঘোরা রীতিমতো কষ্ট,
ইস্কুলে যাওয়া নেই জলবৎ পষ্ট।
শনিবারে হাফদিন, না গেলেও চলে যায়,
এইসব ভেবে শেষে বাড়ি থাকি নিরুপায়।
রোববারে শেষ হয় হপ্তার পাঁচালী,
হাসিমুখে বলি তাই, এযাত্রা বাঁচালি।

তবুও কাঁদে কেন

অমিত আইচ
স্নাতকোত্তর বাংলা, প্রথম বর্ষ

দেওয়া হয়েছে তাদের হাজারও সুবিধা,
এগিয়েছেও তারা অনেক,
সাথে সাথে পা মিলিয়ে হেঁটেছে
অনেক রাস্তা।
হাঁটতে হাঁটতে ক্ষয়ে গেছে তাদের জুতোর তল।
দেওয়া হয়েছে তাদের হাজারও সুবিধা,
জয়ীও হয়েছে তারা
তবুও একাকী, ঘরের দরজা দিয়ে নিভৃতে
তারা কাঁদে কেন
আজো?

“ভয় কি বাবা, মনে ভাববে আর কেউ না থাক, আমার একজন ‘মা’ আছেন।”

—শ্রীমা সারদা

মঙ্গলচিহ্নেরা

মইজুদ্দিন মোল্লা
স্নাতক বাংলা, তৃতীয় বর্ষ

সেই সব আকাশ
সেই সব বাতাসের সমুদ্র কোলাহল
ভৃঙ্গরোল যত বনের
কুয়াশার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে কোথায় গিয়েছে মিশে
পৌষের বিনিদ্র তারাদের ভালোবেসে সেই সব মানুষের
শখ
ঠেকেছে কোথায়
শঙ্খচিলের মতো বিছিয়ে রেখে চোখ?

আমি দেখেছি তাদের মনে হয় কোনো একদিন
কোনো এক সন্ধ্যার মাঠে
শ্যামলীর ঘাটে তাদের আসা যাওয়া
শুনেছি গল্প কত
কত অরিত্র বাওয়া মাঝিদের হাঁক গেছে খেলে
ডান মেলে উড়ে গেছে দাঁড়কাক।

আমি জানি, আমিও তাদের সাথে
হাতে হাত রেখে ঘুরে গেছি কত পৃথিবীর পথ
কত আকাশ গেছি ফেলে আকাশের ওপারে
বিষণ্ণ দুপুরে
ভেঙে গেছি কত জীবনের স্রোত।

আজ এখানে;
এই ভাগীরথীর তীরে ঘুম থেকে উঠে দেখি
চোখের ভিতর থেকে চলে গেছে তারা।
পাগলপারা করে যারা রেখেছিল গানে

মনে মনে সন্ধি এঁটে
কোন্ আকাশ কোন্ জ্যোতিষ্কজগতে গেছে হেঁটে?

পরাহত ঘোড়ার মতো ছায়াদের মৃত্যু দেখে
ধান ঝরা হেমন্ত রাতে স্বপ্ন মরে গেছে কি তবে
প্রেম বুঝি ফুরিয়ে যায়?
আদিগন্ত স্বপ্নের অভিযাত্রায় হৃদয় তবু থাকে
হৃদয়কে ভালোবেসে তাই

শোনো বন্ধু;
তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য
আমার অনেকবার মৃত্যু এসেছে
অনেকবার কম্পিত আলোর সাগর জোয়ার তুলেছে চোখে
শায়িত ঝিনুকের সাথে ডুবেছে প্রাণের ঢেউ
আছে কি কেউ বাক্‌হারা মুখে ভাষা দেবার?
আমি জানি,
রিক্ততার এই সংসারে তোমার কাছেই আছে মুক্তির চাবি
আছে ফসলের অফুরান পাহাড়।

তাই বলি শোনো;
সব আশা
সব সান্ত্বনার শেষে
নক্ষত্র জ্বলিত আকাশ যদি অন্ধ হয়ে আসে
বন্ধ হয়ে যায় যদি দেবতার চোখ,
তবে শূন্যতার উপহাসে মশাল জ্বালিয়ো তোমার।
দ্বীপাতীত নাবিকের দুরন্ত আহ্বানে
স্রোতের বিপক্ষশায়ী মঙ্গলচিহ্নেরা জেগে উঠুক
তেড়ে উঠুক দুর্নিবার ঝড়ে
সমস্ত আঁধার, সমস্ত ক্রান্তিবলয় ছিঁড়ে
দীপ্ততার অমোঘ সন্ধানে।

একশো বছর পরে

অঙ্কন রায়
স্নাতক বাংলা, প্রথম বর্ষ

(১)

ফুটপাতে কুঁকড়ে আছে একটা মাথা;
শূন্য জঠর।
বছর দশের দুটো জীর্ণ হাত
মুক্তির আকুতি জানায় প্লেগের দণ্ড থেকে।
এগিয়ে আসে শ্বেতাঙ্গীর দুটো কোমল হাত—
কে এই প্রবাসী অপরিচিতা?

(২)

পর্দার আড়ালে বালিকা এখন বন্দি,
ফুটফুটে তার চেহারা, নরম তার মন।
শিক্ষালাভে সমাজ তাকে ঘোষণা করেছে অযোগ্যা।
বালিকার বাড়ি পৌঁছে গেলেন ভিনদেশি, হাতে সাহসের আলো...
একে একে ছিঁড়ে গেল সব পর্দাগুলো।

(৩)

দেশ পরাধীন,
জেগে উঠছে বিপ্লব তার শিরায় শিরায়,
রক্ত জোগাচ্ছেন এক ইউরোপীয় কন্যা।
ভেঙে পড়ল সাম্রাজ্যবাদের মিথ্যা দম্ভ-প্রাচীর।
হাতে হাত রেখে সঙ্গে আসছে 'ভগিনী',
যেন অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসা রাগিণী।

(৪)

পাশ্চাত্যের ঝড় বইছে প্রবল বেগে—
ভারতবর্ষী ভাবনাগুলো খুব ক্লান্ত,
সমুদ্রের ওপার থেকে নতুন প্রেরণা এল;
দেশের ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলে উঠল আবার—
সে ভিনজাতির এক ভারতীয়া।

(৫)

এদেশ তোমাকে চিনবে অনেক পরে!
হয়ত দেড়শো বছর লেগে যাবে—
তারপর...
সমারোহে সেদিন পালন হবে তোমার জন্মদিন,
তোমাকে নিয়ে তোলপাড় হবে শিক্ষা-মহল,
তর্ক চলবে ঢের,
পরদিন কাগজে ছাপা হবে সেই খবর।
সেই কাগজ,
যেখানে পাতায় পাতায় মুদ্রিত হয়—
নির্যাতন আর দুর্নীতি,
পাঠকের মনে আঁচড় কাটে কষ্ট আর হতাশা।

“যদি শান্তি চাও, মা, কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগতকে আপনার করে নিতে শেখো। কেহ পর নয় মা, জগত তোমার।”

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

ফরমুলা To ফেমাস

সৈকত হালদার
স্নাতক বাংলা, তৃতীয় বর্ষ

চুপ! যত সত্যি কথা। ঢাকনা দিয়ে রাখনা।
স্বচ্ছ জলে মরছে কারা? মেলছে কি পাখি পাখনা?
থাক্। যত মিথ্যে বাক্য। ফলিত জ্যোতিষ চর্চা।
অল্প স্বল্প জল মিশিয়ে নিখুঁত স্মৃতির কড়চা।

রাখ্ স্মৃতি-শ্রাদ্ধটুকু। অতল ভরসা নিবি।
পিচ্ রাস্তায় নতুন প্রোডাক্ট! 'আমরা বুদ্ধিজীবী'।
রূপ! সারা মিছিল জুড়ে। বিপ্লব থেকে ধরনা।
জ্ঞানের আলোয় নিভছে প্রদীপ। অহংমত্ত ঝরনা।

তফাৎ? সে কি কাব্য কলায়! কিসের বুদ্ধিজীবী?
বুদ্ধির ঝোড়া দূষণ ছড়ার ভ্রান্ত পথের দাবি।
হোক-যত চিত্ত শুদ্ধি বুদ্ধি কোথায় তার?
জ্বলছে তথ্য শহর সিক্ত। এ কোন্ অহংকার?

দাও যত অস্ত্র-শস্ত্র কামান-পরমাণু।
এসব প্রোডাক্ট ধ্বংস করি বীভৎস জীবাণু।
থাক যত লোক দেখানো মিথ্যে কথার ছবি।
বুদ্ধি দিয়ে চোখ ঢাকিয়ে ফেমাস্ ভণ্ডজীবী।

"চরিত্রই প্রকৃত শক্তি, আধ্যাত্মিকতার অর্থ সেই চরিত্রশক্তি অর্জন করা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রবন্ধ

বিশ্বায়ন ও কিছু দার্শনিক প্রসঙ্গ

অরূপ কুমার ধবল
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

প্রকৃতিগত ভাবেই মানুষ হল সামাজিক জীব। সমাজকে বাদ দিয়ে কোন মানুষই এক মুহূর্তের জন্য তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয় না। বহু পথ অতিক্রম করে আজ আমরা যে সমাজে বসবাস করছি, তা কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। বিবর্তনের এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আজ আমরা সভ্যতার যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, তার জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি; কেননা আমরা এই সত্যটা জানি যে, পৃথিবীর বয়সের সঙ্গে তুলনায় পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব খুব বেশি দিনের ইতিহাস নয়। প্রায় আড়াই লক্ষ বছর ধরে মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করছে। এই সময়ের মধ্যেই মানুষ তার জীবনে এনেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যা তার সমাজ ও সভ্যতাকে এক দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছে।[১]

একদল হাতিয়ারহীন, শিল্পকলাজ্ঞানহীন যূথবদ্ধ আদিম মানুষ তার কঠিন পারিপার্শ্বিকের সাথে অবিরত সংগ্রাম করতে করতে ক্রমশ এগিয়ে এসেছে সভ্যতার দিকে। এখন আমরা বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মর্গ্যান সাহেবকে অনুসরণ করে এই সভ্যতার আদিপর্ব থেকে সভ্যপর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন বিকাশের স্তরগুলি আলোচনা করবো। সমাজবিকাশের এই ধারাটিকে তিনি তিনটি পর্বে বিভক্ত করেন। এই পর্বগুলি হল যথাক্রমে—বন্যযুগ (Savagery), বর্বরযুগ (Barbarism) এবং সভ্যযুগ (Civilization)। তাঁর মতে, প্রথম দুটি পর্ব জীবনোপকরণ উৎপাদনের অগ্রগতি অনুযায়ী নিম্নতম ও মধ্যবর্তী স্তর এবং শেষ স্তরটি হল উচ্চতম স্তর।

মানবজাতির শৈশব অবস্থা হল এই নিম্নতম স্তরটি। এই অবস্থায় মানুষ বসবাস করত বনভূমিতে। এসময় তার সবথেকে নিকট প্রতিবেশী ছিল সকল প্রকার বৃহদাকার হিংস্র জন্তু। এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে সেই সময় বাস করতে হত গাছের ওপর। আর দ্বিতীয় বাঁচার উপকরণ হল খাদ্য, যা ছিল কেবলমাত্র ফল-মূল। তবে মর্গ্যান সাহেবের মতে, এই পর্বের সবচেয়ে বড় দান হল, পৃথকোচ্চারিত ভাষার ব্যবহার করতে শেখা। তবে একথা মেনে নিতে হবে যে, এই পর্বের কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। কিন্তু মানব সভ্যতার বিকাশ যে একদিনে হয়নি, সে ব্যাপারে দ্বিমত থাকা উচিত নয়। আর তা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের যৌক্তিক ভাবে মেনে নিতে কোন বাধা নেই যে, এমন একটা অবস্থা একদিন ছিল যা সম্ভবত হাজার হাজার বছর ধরে চলেছিল।

এরপরের স্তরটি হল 'মধ্যবর্তীস্তর'। এ অবস্থায় মানুষ প্রথম জলজ জীবকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে শেখে। এই জলজ জীবের মধ্যে রয়েছে মাছ, কাঁকড়া, শামুক এবং অন্যান্য আরও কিছু জীব। আগুনের ব্যবহারও এই স্তরেই শুরু হয়। মর্গ্যানের মতে, মাছ ও আগুন হল পরস্পরের পরিপূরক; কেননা একমাত্র আগুনের সাহায্যেই মাছ পূর্ণমাত্রায় খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের যোগ্য হয়। নদীর গতিপথ এবং সমুদ্রের উপকূল ধরে মানুষ আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে। অজানাকে জানার এবং অচেনাকে চেনার এক প্রয়াস এখান থেকেই শুরু হল। অপার বিস্ময়ে নীল নদীর জলের দিকে তাকিয়ে হয়তো সেদিনই মানুষ প্রথম ভেবেছিল, ওপারে কী রয়েছে?[২]

এই বিস্ময়কেই সামনে রেখে মানুষের গতিপথ আরো এগিয়ে চলল সামনের দিকে। আর এক স্তরের উত্তরণ ঘটলো, যা আগের স্তরগুলিকে ছাপিয়ে গেল। এই সময় শিকার হল তার স্বাভাবিক পেশা। এই পর্বেই মানুষ তীর-ধনুকের প্রথম ব্যবহার শিখলো। কি শ্রম ও ধৈর্যের পরিচয় সেদিন সে মানুষগুলি দিয়েছিল, আজ এতযুগ পরেও আমরা তা অনুমান করতে পারি। এই পরিবর্তন মানুষকে বেঁচে থাকার রসদ সেদিন যুগিয়েছিল। এই সময়েই জীবনোপকরণ উৎপাদনের ওপর মানুষের আধিপত্য জন্মে। এই সময়ই মানুষ বিভিন্ন কাঠের জিনিস ও বাসনপত্র, হাতে করে গাছের বাকল থেকে বস্ত্রবয়ন, গাছের ছাল ও শর জাতীয় জিনিস দিয়ে বোনা ঝুড়ি-চুপড়ি এবং মার্জিত পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে শেখে। এ সময়ই গাছের গুঁড়ি থেকে কুঁদে তোলা ডোঙ্গা তৈরিতেও মানুষ পারদর্শী হয়। আর এর মধ্য দিয়েই মানবীয় সভ্যতা চলতে থাকে আপন গতিতে। এই গতি আজও চলছে, স্থির হয়ে যায়নি। চলাই হল জগতের ধর্ম। যাকে আমরা স্থির বলে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখছি, তা একদল দার্শনিকের দৃষ্টিতে বা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অন্যরকম। যেমন—গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস পঞ্চম শতকে এলিয়াটিকদিগের গতিহীন নিশ্চল সত্তার বিরুদ্ধে পরিবর্তন ও গতির সত্যতা প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে, সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতার ওপর নামই জগৎ। একই রকম চিন্তার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি আমাদের দেশের বৌদ্ধদের মধ্যেও। তাঁদের মতে সবকিছুই ক্ষণিক; স্থায়িত্ব আসলে মনের ভ্রমমাত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ক্ষণই এক একটি পৃথক সন্তান উৎপন্ন করে এগিয়ে যাচ্ছে অনন্তের দিকে।[৩]

এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা আমরা করলাম, তার মূল সুরটি হল এই যে—পরিবর্তন হল প্রকৃতির আপন স্বভাব। প্রকৃতির প্রতিটি বিষয় কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই শৃঙ্খলের মধ্য দিয়েই সে প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। আর এই প্রকৃতির নিয়মেই মানুষ ও তার সভ্যতা আজ এমন এক উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে; যেখানে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে দূরত্বটা অনেকটাই কমে এসেছে। আজকের বিশ্ব একটা 'বিশ্বপল্লী' (Global Village)-তে রূপান্তরিত হয়েছে। আজ মানুষ দেখেছে এক নতুন বিপ্লব, যা অতীতের সব বিপ্লকে বহু আলোকবর্ষ পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। এই বিপ্লব হল 'বিশ্বায়ন' বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'Globalisation'। ১৯৯০ সালের শুরুতে আমরা এই পদটির সাথে পরিচিত হই। কিন্তু এই পদটি নিয়ে আজও বিতর্কের অন্ত নেই। তবে তার এক স্বাভাবিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলতে পারি—"...the term "Globalisation" is used to characterize the planet wide integrative and disintegrative process in the spheres of economy, politics and culture, as well as anthropogenic environmental changes, which are formally universal and essentially important for the entire world community."[৪]

এই উপরের সংজ্ঞা থেকে এটুকু স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বিশ্বায়নের প্রভাব সার্বিক। এটি এমন এক বিপ্লব, যা আজকের মানবীয় সভ্যতার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রগুলিকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। শুধু তাই নয়, এই বিপ্লব এমন একধরণের নৃতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটায়; যার প্রভাব সারা বিশ্ব সংসারের নিকট যেমন সার্বিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বব্যাপী এক সামাজিক সম্পর্কের মেলবন্ধন ঘটে এই বিশ্বায়নের ফলে। অবশ্য বিশ্বায়নের আর এক অবস্থানও আছে যা খুবই সংকীর্ণ। এই ক্ষেত্রে সমাজের সামাজিক বিকাশের যে ছবি দেওয়া হয়, সেখানে প্রগতির ইতিহাসের প্রতি কোন নির্দেশ থাকে না। অর্থাৎ, আজ যে সম্পর্ক দেখছি, তা যে এক গভীর বিবর্তনের

ফল; তার প্রতি এক্ষেত্রে কোন দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়নি। তবে আজ যে বিশ্বায়নের রূপ আমরা দেখছি, তার পরিচয় অনেক আগেই কিছু কিছু চিন্তাশীল মনীষীর লেখার মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি। যেমন—Malthus, Kant এবং Marx প্রমুখ চিন্তাবিদ্গণ প্রথম অনুভব করেছিলেন এক বিশেষ বিশ্ব-ধারা (World trends), যা উদ্ভূত হতে চলেছে আগত দিনগুলিতে। তাই এই সকল চিন্তাবিদ্দের আলোচনাতেই প্রথম আমরা বিশ্বায়নের বীজকে অনুভব করি। ইমানুয়েল কান্ট তাঁর সৃজনশীল দার্শনিক জীবনের শেষদিকে ১৭৯৫ সালে একটি অসাধারণ প্রবন্ধ রচনা করেন যার নাম হল "Zumewigen Frieden", বাংলায় যার শিরোনাম দাঁড়ায় "নিরন্তর শান্তি"। এই প্রবন্ধে তিনি স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহকে এক মহান রাষ্ট্রসংঘের (U.N.O) সদস্যরূপে উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি একাধারে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে সকল রকমের আপেক্ষিকতাবাদ বর্জন করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, আপেক্ষিকতাবাদ বিচারের দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করে। আর এর ফলেই আমরা কোনটি শুভ আর কোনটি অশুভ তা নির্ণয় করতে পারি না।

আবার মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছেন সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় এই জাতীয় কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। উৎপাদন শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে পরিবর্তন শুরু হয়। সমাজের এই যে পরিবর্তন, যা আজ আমাদের বিশ্বায়নের দোরগোড়ায় এনে তুলেছে; তা কিন্তু আকস্মিক কিছু নয়। এক শক্তি আর এক শক্তিকে পরাভূত করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়ে করে চলেছে সমাজের অগ্রগতি। আর তারই ফল হল আজকের বিশ্বায়ন।

আজকের দার্শনিকদের মতে রাষ্ট্র কোন বিশালাকার সামুদ্রিক প্রাণীর মতো নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র কোন বিশালাকার প্রতিষ্ঠান নয়; যেখানে সকল রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ক্ষমতাকে একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত করা হবে। তাই কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক আজ কমে এসেছে। আজ সকল ক্ষেত্রেই এক অবাধ স্বাধীনতার দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছে। আজ দূর হয়েছে কাছের; অনাত্মীয় হয়েছে আত্মার সম্বন্ধে আবদ্ধ অর্থাৎ আত্মীয়।

এখন এই বিশ্বায়নের জোয়ারের ফলে কি ব্যক্তির স্বকীয়তা বা অনুপমত্ব বলে কিছু থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজবো আর এক দার্শনিকের নিকট, যিনি হলেন 'Theory of Justice'-এর লেখক John Rawls।[৫] তাঁর মতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক দু-ধরণের হতে পারে। একটি হল চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক এবং অপরটি হল হাইয়ারাকিকাল সম্পর্ক। আমরা জানি টমাস্ হবস্ বলেছিলেন, সভ্যতার এমন এক স্তর ছিল যখন মানুষ ছিল 'কদর্য, বর্বর ও সংক্ষিপ্ত'। প্রকৃতির রাজ্যের এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি তৈরি করে। অবশ্য এক্ষেত্রে মানুষের 'একাকিত্বে'র উদ্বেগজনক সঙ্কটও একটি কারণ ছিল। তবে এই উদ্বেগের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য হবস্ ব্যক্তিগত দিকটিকে অস্বীকার করেন। তাঁকে ব্যক্তিগত প্রভুত্ব বিসর্জন দিয়ে অপর একজনের হাতকে শক্ত করে ধরতে হয়েছিল এবং তাকেই সর্ববিধ কর্তৃত্ব দান করতে হয়েছিল। আর, এভাবেই যদি রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ক্ষমতাকে একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়, তবে আমার অনুপমত্ব কীভাবে রাখবো—এই প্রশ্ন আমরা হবস্কেও করতে পারি। অবশ্য এই সামাজিক চুক্তি দিয়ে অপর একটি মতবাদও আমরা পেয়ে থাকি। এই মতবাদের সমর্থক হলেন ফরাসী দার্শনিক রুসো। তাঁর মতে, মানুষের সামাজিক অবস্থা তার প্রাকৃতিক অবস্থারই ফলস্বরূপ। রুসোর সামাজিক চুক্তির উদ্দেশ্য সকলকেই

একত্রিত করা এবং সমান অধিকার ভোগে সমর্থ করা এবং সকলের কর্তব্যের সমতা সাধন করা। আসলে রুসো প্রকৃতির মধ্যে নীতি ও ধর্মের উৎস দেখতে পেয়েছিলেন।

অমর্ত্য সেন তাঁর 'নীতি ও ন্যায্যতা' বইটিতে দেখিয়েছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ্ টমাস্ হবস্ একটা ধারার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং রুসোর মত দিকপাল্ তাত্ত্বিক এই ধারার অনুসরণ করে কীভাবে সমাজের ন্যায্য বিধিব্যবস্থা তৈরি করা যায়, তারই চেষ্টা করেছিলেন। অধ্যাপক সেন এই পদ্ধতির নামকরণ করেন 'সর্বশ্রেষ্ঠান্বেষী প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ' (Transcendental Institutionalism)। এই তত্ত্বের প্রধান লক্ষ্যই হল আদর্শ প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করা। আর তা করতে পারলে সর্বশ্রেষ্ঠের অন্বেষণ সফল হবে। অমর্ত্য সেনের মতে এই সকল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের সন্ধানী তাত্ত্বিকেরা কিন্তু অনেক সময়ই সমাজের পক্ষে উপযোগী আচরণ কেমন হওয়া উচিত তারও নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, এই ন্যায্য ও উপযোগী আচরণই আমাদের এক মানুষের সাথে অপর মানুষকে যুক্ত করে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক তৈরি করে।[৬]

আমাদের আলোচনার বিষয় এটিই। অর্থাৎ, আজ যে বিশ্বায়নকে দেখে আমরা আপ্লুত, তা কি আমাদের সেই সকল সূক্ষ্ম অনুভূতিকে জলাঞ্জলি দেবে; যার জন্য আমরা আমাদের ব্যক্তিক অভিন্নতাকে অক্ষুণ্ণ রাখি? আর এই পরিচয়ই আমার নিজস্ব, যার জন্য আমি মানুষ। আমরা জানি প্রতিটি মানুষ দেহ ও মনে স্বতন্ত্র বা আলাদা। মানুষ নিজ সমাজ ও তার বাইরের মানুষের সাথে যুক্ত হয় তার স্বতন্ত্রতাকে শাণিত করার উদ্দেশ্যেই। এই সম্পর্কের ভিত্তি হল "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে"[৭] মন্ত্র। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যখন আমি এই বিশ্বায়নের যুগে নিজেকে উন্মুক্ত করব অপরের কাছে, তখন সভ্যতার মহাসমুদ্রে আমি আমার স্বাভিমান হারাবো না; কেননা এই স্বাতন্ত্র্য বা স্বাভিমানই হল আমার মৌলিকতা, যা থেকেই গড়ে ওঠে আমার ব্যক্তিত্ব। আর এই ব্যক্তিত্বের পরিচয়েই গড়ে উঠবে এক নতুন ভবিষ্যৎ, যেখানে বিচ্ছিন্নতা থেকে, আতঙ্কবাদ থেকে বা বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নঞর্থকতা থেকে মানুষ পরিত্রাণ পাবে। আর তখনই মানুষের সমাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষ নিজেকে সমস্ত প্রকার বঞ্চনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে অপরের সঙ্গে এক নতুন সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে পারবে, যা তাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা প্রদান করবে। তখন প্রতিটি জাতিই হবে অপর জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল; প্রতিটি মানুষ হবে অপর মানুষের নিকট পবিত্র। আর তখনই এই বিশ্বে 'Kingdom of Ends' বা 'স্বনিয়ন্ত্রক তথা স্বাধীন ব্যক্তিসমূহের রাজ্য' নেমে আসবে, যা 'বিশ্বায়ন' নামক বিপ্লবকে প্রদান করবে হীরের ঔজ্জ্বল্য এবং যা তার নিজপ্রভায় হবে উদ্ভাসিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

১) মার্ক্সীয় দর্শন—সরোজ আচার্য্য।
২) কার্ল মার্কস ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-রচনা সংকলন।
৩) ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস—শ্রী তারকচন্দ্র রায়।
৪) Globalization As a Natural Historical Progress—(Web Data)।
৫) নৈতিকতা ও নারীবাদ—শেফালী মৈত্র।
৬) নীতি ও ন্যায্যতা—অমর্ত্য সেন।
৭) 'ভারততীর্থ'—গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিক্ষার আলোকে স্বামী বিবেকানন্দ

সন্তু কান্ডার
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শিক্ষা সম্পর্কিত নানান ধারণার উদ্ভব হয়েছে। তবে, স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনায় রয়েছে যথেষ্ট অভিনবত্ব। কেননা, শিক্ষা কী তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—*"Education is the manifestation of perfection already in man."*[১] অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম থেকে বর্তমান তারই প্রকাশ। মানুষের ভিতর যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ বর্তমান না থাকত, তাহলে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে কখনো জ্ঞানী ও শক্তিমান হতে পারত না। অর্থাৎ, জ্ঞান বাইরে থেকে আরোপিত কোন ব্যাপার নয়। একজন মানুষ যখন তার নিজের মনের সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়, তখনই তার আত্মজ্ঞান বা প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয়। অর্থাৎ ভাবনার আত্মীকরণ যখন সমস্ত দেহ-মন জুড়ে হয় তখনই শিক্ষা সার্থক হয়। তাই স্বামীজী বলতেন, *"Education is the nervous association of certain ideas."*[২] অর্থাৎ শিক্ষা হল কতকগুলি ভাবের স্নায়বিক অনুষঙ্গ।

শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—*"End of all education, all training should be man making."*[৩] অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানুষ তৈরি করা। তিনি মনে করতেন যে, একজন শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে জোর করে জ্ঞান ঢুকিয়ে দেওয়া, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য নয়। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হবে—শিক্ষার্থীর জীবন গঠন করা, তাকে মনুষ্যত্বের অধিকারী করা ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হিসাবে গড়ে তোলা। তাঁর মতে শিক্ষার প্রথম সোপান হল সমন্বয়—মস্তিষ্ক, মাংস পেশী, হৃদয় ও সমস্ত বৃত্তির সমান পরিপুষ্টি সাধন। তবে তার জন্য প্রয়োজন একাগ্রতা। শিক্ষার মধ্যে এই একাগ্রতা গড়ে তোলার উপায় হিসাবে তিনি নির্ধারণ করলেন আত্মসংযমী জীবন যাপনের আদর্শকে। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য ছাত্রজীবনে আবশ্যক। এই একাগ্রতা গড়ে তুলতে পারলে শিক্ষার্থীর মনে আত্মপ্রত্যয় জন্ম নেবে, শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠবে। স্বামীজী শ্রদ্ধার একটি অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, *"প্রাচীন ধর্ম মতে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক, নতুন ধর্ম বলে, নিজেকে যে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক"*[৪]

পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে স্বামীজী বার বার জাতীয় প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি জনসাধারণকে তাদের জীবনের উপযোগী শিক্ষা দেবার কথা বলতেন। যাতে তারা আত্মনির্ভর, কর্মক্ষম, স্বাধীন ও যুক্তিশীল হয়ে ওঠে। তাই স্বামীজী পাঠ্যক্রমে স্থান দিলেন শুধু প্রাচ্য ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান নয়, শিক্ষার্থীকে জানতে হবে পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, কারিগরীবিদ্যা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে সঙ্গীত ও হস্ত শিল্প অবশ্যই থাকবে। শরীরচর্চার ওপর স্বামীজী সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। কারণ স্বাধীন, কর্মকুশল, সুস্থ, শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় শিক্ষার্থী সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠবে—এটাই তো প্রকৃত শিক্ষার যথার্থ স্বরূপ।

শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ হিসাবে তিনি প্রাচীন ভারতের গুরু গৃহবাস ও ব্রহ্মচর্য পালনকে উপযুক্ত বলে মনে করতেন। স্বামীজীর মতে, শিক্ষকের কাজ শুধু তথ্য পরিবেশন করা নয়, শিক্ষকের কাজ, শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও আত্মার সুষম বিকাশে সহায়তা করা। তিনি দরিদ্র জনসাধারণ, ক্ষুধার্ত জনসাধারণ ও সমাজের ব্রাত্য জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার কথা বলেন যা হবে উপযোগী শিক্ষা, বাস্তব শিক্ষা ও আত্মপ্রত্যয়ের শিক্ষা। এই জনশিক্ষার দায়িত্ব দিতে চাইলেন যুবক সম্প্রদায়কে। কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, মানুষের পক্ষে বিদ্যালয়ে আসা সম্ভব নয়, তাই বিদ্যালয়কে পৌঁছে দিতে হবে তাঁদের কাছে। স্বামীজীর ভাষায় "মহম্মদের কাছে পর্বত না এলেও মহম্মদকে পর্বতের কাছে যেতে হবে।"[৫]

স্বামীজী বলতেন, যে সমাজে নারীরা বা মায়েরা অবহেলিত সে সমাজ কখনই উন্নত নয়। একটি পাখায় ভর করে পাখি যেমন উড়তে পারে না তেমনি জাতির পক্ষে শুধু পুরুষ উন্নত হলে সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। পুরুষ-নারী উভয়ের শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, উভয়ে মিলিত ভাবে জাতি গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করলে তবেই জাতির উন্নতি সম্ভব। তিনি সগৌরবে ঘোষণা করেছেন, "হে ভারত ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।"[৬] তিনি ধর্মকে শিক্ষার সার জিনিস বলে মনে করেছেন। ধর্ম মানে প্রচলিত পূজা, উপাসনা, সাম্প্রদায়িক আচার অনুষ্ঠান নয়। ধর্ম মানে আত্মবিশ্বাস বা আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জাগ্রত হলে মানুষ আর ভাগ্যের হাতে অসহায় আত্মসমর্পণ করবে না। একেই তিনি Man making education বলেছেন, Money making নয়।

শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, তিনি শিক্ষাকে কেবল কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চান না, এমন কি তাঁর শিক্ষা নির্দিষ্ট কোন বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা থেকে একথাই স্পষ্ট। শিক্ষা বলতে যদি, মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম থেকে বর্তমান তারই প্রকাশকে বোঝায়, তবে এই প্রকাশ যেকোনো মুহূর্তে, যে কোন বয়সে হতে পারে। তিনি একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন—তিনি বলেছেন, চকমকি পাথরের মধ্যে আগুন জ্বলার সম্ভাবনা থাকে বলেই ঘর্ষণের ফলে তার থেকে আগুন বেরিয়ে আসে; আগুন বাইরে থেকে তার ওপর আরোপ করা হয় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। স্বামীজী বলেছিলেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—*Arise! Awake! and stop not till the goal is reached.*[৭]"আর এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, সেটি হল জীবনোপযোগী ও সময়োপযোগী শিক্ষা। স্বামীজী যে শিক্ষার কথা বলেছিলেন সেটা প্রত্যেকটা মানুষের, প্রত্যেকটা দিনের উপযোগী শিক্ষা। তাঁর শিক্ষা ছিল আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হবার শিক্ষা। যে শিক্ষা শুধুমাত্র একটি যুগে আবদ্ধ নয়। আজ থেকে ৫০০০ বছর পরেও যদি মানুষের অস্তিত্ব থাকে তাহলেও স্বামীজীর শিক্ষার ধারা সমান ভাবে বহনীয় হবে। স্বামীজীর প্রত্যেকটা বাণীই আমরা যতবার পড়ব ততবারই একটা নতুনত্বের আভাস পাব। তাই কাউকে যদি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত বলতে চাই তবে তাকে সব দিক থেকে উপযোগী হতে হবে। স্বামীজী তাই বলেছেন, *"Education is all round development"*[৮]। সুতরাং এই দিক থেকে স্বামীজী সব সময়ই এগিয়ে থাকবেন।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ঃ

স্বামীজী যে সময়ে দাঁড়িয়ে এই শিক্ষার কথা বলেছিলেন তখন আমাদের দেশ পরাধীন ছিল। কিন্তু এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকাও নিচ্ছে, আমরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা ফিরে পাচ্ছি তবুও যতটা শিক্ষার বিস্তার হবার কথা তা হয়নি বা স্বামীজী যে শিক্ষাকে মানুষ গড়ার শিক্ষা বলতেন সে শিক্ষার প্রবর্তন আজও ঘটেনি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ অন্ধকরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, যেখানে শিক্ষা কেবল পুস্তকী শিক্ষা, ডিগ্রি অর্জনের শিক্ষা, কার্যকরী শিক্ষা নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে রাজনীতি ও ভ্রান্ত শিক্ষানীতি, যা মানুষ তৈরি হতে দিচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রীরা হয়ে পড়েছে হতাশ, দিশাহীন, আশাহীন। আর এই অবস্থা থেকে ফিরে আসতে হলে আমাদের, স্বামীজী যে আদর্শগুলির কথা বলেছেন সেগুলি যতটা সম্ভব মেনে চলা দরকার। অর্থাৎ এই দিশাহীন ছাত্র সমাজকে আশার আলো দেখাতে পারে স্বামীজীর বাণী, স্বামীজীর রচনা। আর এই পথে এগোলে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ডিসেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩১৪
২) Swami Vivekananda Complete Works of Swami Vivekananda (vol.-4), 17th Reprint, Udbodhan Oct 2007, Page No.-212
৩) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১১৫
৪) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৭৫-১৭৬
৫) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৩৪
৬) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ডিসেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯৪
৭) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড), ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ডিসেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬১
৮) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ডিসেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২১

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, জানুয়ারি ২০০০
২) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (চতুর্থ খণ্ড), চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, মে ২০০২
৩) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ফেব্রুয়ারি ২০০৩
৪) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ডিসেম্বর ২০০২
৫) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড), দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ডিসেম্বর ২০০১
৬) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (দশম খণ্ড), দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ফেব্রুয়ারি ২০০৩
৭) স্বামী বিবেকানন্দ, আমার ভারত অমর ভারত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, ২০১৪

দর্শন কী এবং কেন?

সৌভিক দত্ত
স্নাতকোত্তর দর্শন, দ্বিতীয় বর্ষ

আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দাঁড়িয়ে যখন দেখছি সমগ্র বিশ্ব পারিবারিক, সামাজিক ভাঙ্গনের উন্মাদনায় মেতে উঠেছে, তখনই সেই রোগগ্রস্ত উন্মাদনাকে কাটিয়ে তোলার জন্য আমরা সেখানে প্রতিষ্ঠা করব সমাজবিদ্যার অন্যতম বিষয় দর্শনকে। UNESCO World Philosophy Day পালন করে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি ও মানবিক মর্যাদা, বৈচিত্র্যকে তুলে ধরার জন্য। সমাজ জীবন, ব্যক্তিজীবনে রয়েছে এই বৈচিত্র্য। আর এই বৈচিত্র্যই ব্যক্তিমানুষকে বেঁচে থাকার তাগিদ যোগায়। আমাদের বেদ-বেদান্তেও এই বৈচিত্র্যের কথা আছে। বর্তমান দিনে এই বৈচিত্র্যে ভাঁটা পড়ছে, যা মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনকে প্রভাবিত করছে; তাই হয়ত UNESCO গত ১১ বছর ধরে এই World Philosophy Day পালন করে আসছে। যাতে মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সঞ্চার হয় এবং মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। একই সাথে দর্শনের গুরুত্বও যাতে মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়।

এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে দর্শন কী? F. Thilly তার 'A History of Philosophy' গ্রন্থের ভূমিকায় বলছেন, দর্শনের লক্ষ্য হল এমন কিছু সমস্যার সমাধান করা যা মানুষের অস্তিত্ব বিষয়ক। এছাড়াও অন্য আরেকটি লক্ষ্য হল-মানুষের ইতিহাসকে অনুধাবন করা। এখন এ থেকে আরেকটি প্রশ্ন উঠে আসে, ব্যবহারিক সমাজে এই দুয়ের ভূমিকা কেমন? এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে কৌতূহল ও বিভ্রান্তির অন্ত নেই। কেউ কেউ মনে করেন যে, দর্শন নিতান্তই একটি তাত্ত্বিক ব্যাপার, তাই সুখ, দুঃখ হাসি কান্নার বা বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু একটু যদি সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে ভাবা যায় তাহলে দেখা যাবে দর্শন হল, মানববিদ্যার প্রাণশক্তি স্বরূপ। দর্শন যে নিতান্তই তাত্ত্বিক বিষয় নয় তা যে মানববিদ্যার অন্তর্গত তা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করব। পূজনীয় স্বামী মেধসানন্দজী মহারাজের কাছে শুনেছিলাম, (মহারাজ এখন টোকিও সেন্টারের দায়িত্বে আছেন, তিনি আমাদের পূর্বতন অধ্যক্ষও বটেন।) জাপানের সভ্যতা অনেক উন্নত, ওরা খুব সৎ প্রকৃতির মানুষ, ২/৩ বার প্রাকৃতিক দুর্যোগ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা শিল্প-বাণিজ্যে খুবই উন্নত, ঐ দেশের মনো রেলের সময়ের কথা বলেছিলেন ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় বলেছিলেন; কিন্তু যেটা বলার বিষয় সেটা হল ঐ দেশে মানুষ সবচেয়ে বেশি মানসিক সমস্যায় ভোগে, বিবাহবিচ্ছেদ সাধারণ একটা বিষয়। তারা এই সমস্ত বিষয় থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে ভারতীয় শাস্ত্র, বিশেষত ভারতীয় দর্শনকে জানতে চাইছে। দর্শনের ছাত্র হিসেবে এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে।

একটি ছোট পাখি যেমন তার ডানা মেলে উড়ে যেতে চায় অনেক দূরে, পরিচিত হতে চায় পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা, জনপথ তথা সমগ্র বসুন্ধরার সঙ্গে, তেমনি কৌতূহলী মানুষ তার শত সীমাবদ্ধতাকে

উপেক্ষা করে ব্রতী হয় জ্ঞান অনুশীলন ও সত্য অনুসন্ধানের দুর্গম পথে। এটা মানব সত্তার আবেদন আর এই আবেদনে সাড়া দিতে গিয়েই কপিল, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কান্ট, রাসেল, প্রমুখ ভাবুক নির্মাণ করেছেন দর্শনের সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা শক্ত পথকে। দর্শন চায় সেই তত্ত্ব ও সত্যকে অনুসন্ধান করতে, যাকে জানলে ভেদ করা যায় জগত ও জীবনের অন্তরতম সত্তাকে। দর্শনের পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'ভূমা'। পরম সত্তা ভূমাকে সসীম মানুষ অনুভূতি, ভেদবুদ্ধি কিংবা নৈয়ায়িক যুক্তি দিয়ে জানে না, জানে অনুভব প্রজ্ঞা-স্বজ্ঞার সমবায়ে গঠিত সমগ্র চেতনা বা প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। এই অর্থে যথার্থ দর্শন মানে, বোধ বা উপলব্ধিকে প্রমাণযোগ্য করে, বুদ্ধি প্রসূত সত্যকে তুলে ধরা এবং বাস্তব সত্তার সামগ্রিক রূপস্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস করা। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ সমসাময়িক দার্শনিকের নাম করা যায় যাঁরা শুধু তাদের বোধ বা উপলব্ধির দ্বারা প্রচলিত দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে নতুন আঙ্গিকে সমকালের প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত, বিশেষত ইউরোপের এক সংকটের কাল, তাঁর আগে মানুষ দুটি মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেছে। জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ মানুষের কণ্ঠরোধ করতে সচেষ্ট, মানুষ ক্রমশই তাঁর অস্তিত্বের সংকট অনুভব করছে, বিজ্ঞানের প্রতি সমস্ত আস্থা মানুষ হারিয়ে ফেলেছে এইরকম একটা পরিস্থিতিতে ফরাসি দেশের অস্তিবাদী দার্শনিক জাঁ-পল সাঁত্রে রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Being and Nothingness'। এই গ্রন্থ অস্তিবাদী দর্শনের এবং সমকালীন দর্শনের এক অনন্য দলিল। যা মানুষের অস্তিত্বের ধারণার একটি পথের উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

এখন স্বাভাবিক ভাবেই আরেকটি প্রশ্ন ওঠে, দর্শনের মূল্য কোথায়? কেনই বা দর্শন? দার্শনিক Russell তাঁর 'Problems of Philosophy' গ্রন্থে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলছেন, বর্তমান যুগে দর্শন পড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। কেননা, বিজ্ঞানের প্রভাবে এবং বাস্তব ঘটনার চাপে পড়ে অনেকে দর্শন পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। অনেকের ধারণা দর্শন এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তাঁদের মতে, দর্শন নিরর্থক বাজে বকা ছাড়া আর কিছু নয়। Russell বলছেন, দর্শন সম্পর্কে এই অনীহার কারণ কিছুটা এসেছে জীবনের পরিণাম সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে। বিজ্ঞানের উপযোগিতা এখন কেবল বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে দর্শনের সীমাবদ্ধতা কেবল দর্শনের ছাত্রদের মধ্যে। কেননা, যারা বিজ্ঞান পড়েন না, জানেন না, তাঁরাও বিজ্ঞানের দ্বারা উপকৃত, তাঁরাও বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী। যদি দর্শনের কিছুমাত্র প্রভাব অন্যদের উপর পড়ে—তা পড়ে পরোক্ষভাবে। অন্যান্য শাস্ত্রের মত দর্শনও জ্ঞান লাভের কথাই বলে। দর্শনের লক্ষ্য এমন জ্ঞান লাভ করা যার সাহায্যে সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপিত হতে পারে। দর্শন কেন এখনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেনি এ প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ Russell বলেছেন, যদি কোন গণিতশাস্ত্রবিদ বা খনিজতত্ত্ববিদ কিংবা কোন ঐতিহাসিককে প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমরা যতক্ষণ শুনতে চাইব তাঁরা আমাদের ততক্ষণ শুনিয়ে যাবেন। কিন্তু যদি এই একই

প্রশ্ন একজন দার্শনিককে করা হয় তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, অন্যান্য বিজ্ঞান সুনির্দিষ্টভাবে যেমন অনেককিছু জানতে পেরেছে, ঠিক সে ধরণের কোন জ্ঞান দর্শন এখন লাভ করতে পারেনি। Russell বলেন, এর কারণ হল যখন কোন বিষয়ের জ্ঞান সুনির্দিষ্টভাবে জানা হয়ে যায় তখন সেই বিষয়কে আর দর্শন বলা হয় না। তখন তাকে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র বলে মনোনীত করা হয়। তিনি আরও বলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান একসময় দার্শনিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিউটনের বিখ্যাত বইটির নাম—'The mathematical Principles of Natural Philosophy'। যে সব সমস্যার এখনো কোন সুষ্ঠু সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি সেগুলি নিয়েই দর্শন আলোচনা করে চলেছে।

একটি সমস্যা থেকে যে সমাধান পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ নয়। সেই অসম্পূর্ণ সমাধান আবার নিজেই সমস্যা হয়ে ওঠে। আবার চলে তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা। দর্শন হয় আমাদের কোন সুনিশ্চিত সত্যের সন্ধান দিতে পারেনি, না হয় দর্শনই আমাদের অনন্ত সম্ভাবনার মুক্ত রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছে। দার্শনিক চিন্তার সাহায্যেই কেবল মানুষ তার ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্র স্বার্থের জগত থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। কোন প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তরের প্রত্যাশায় দর্শন অধ্যয়ন করা যাবে না। কারণ বাস্তব পক্ষে, কোন সুনিশ্চিত সত্যকে সুনিশ্চিত সত্য বলে প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। দর্শন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা আছে কেবল সমস্যাগুলিকে চিনে নেবার জন্য। কারণ এই সব প্রশ্ন সম্ভাবনার ধারণাকে প্রসারিত করে, মন বিশাল বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে মুক্ত চিন্তার অধিকারী হয়। এই জন্যই দর্শনের প্রয়োজনীয়তা।

যতদিন মানব সভ্যতা থাকবে ততদিন দর্শন থাকবে। মানুষের বৈশ্লেষণী মন যতবেশি বিশ্লেষণ করতে পারবে সমাজ এবং দর্শনশাস্ত্রের বিষয়গুলিকে ততই মানুষ দর্শনের মূল্য এবং উদ্দেশ্যকে সহজতর করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবে।

"ঈশ্বর লাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে নবধাভক্তি

সৌমেন অধিকারী
এম.ফিল. গবেষক, দর্শন বিভাগ

মহাভারতের আঠারোটি পর্বের মধ্যে ষষ্ঠ পর্ব হল ভীষ্ম পর্ব। এই পর্বে দেখা যায় যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রাক্‌কালে কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তা দেখার জন্য অর্জুন তাঁর রথের সারথী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রথটি উভয় সেনার মধ্যস্থলে স্থাপন করতে বলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথটিকে উভয়সেনার মধ্যস্থলে স্থাপন করলে অর্জুন কৌরবপক্ষের সেনাবাহিনীতে অবস্থানকারী পিতৃগণ, মাতুলগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ, এবং সুহৃদগণকে দেখে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ঐ স্বজনবধরূপ মহাপাপ করবেন না বলে মনস্থির করে বলেন যে, 'যদি আমাকে শাস্ত্ররহিত ও প্রতিকারহীন অবস্থায় দেখে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা বধও করে, তবে সেই মৃত্যুও আমার জন্য কল্যাণকর হবে।'[১] এই বলে তিনি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের মধ্যে উপবেশন করেন। এমন অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মোহভঙ্গ করার জন্য একে একে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগ সহ হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বগুলি উপদেশ করেন। সেই সময় অর্জুনের মোহভঙ্গ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা যা উপদেশ করেছিলেন তাই হল শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বিষয়বস্তু।

গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ বিষয়ে প্রশ্ন করলেও ভক্তিযোগ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেননি। ভগবান নিজে নিজেই ভক্তির কথা বলেছেন। গীতার এমন কোন অধ্যায় নেই যেখানে ভক্তির প্রসঙ্গ নেই। যদিও দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ তবুও ভক্তির প্রসঙ্গ, ভক্তির কথা প্রত্যেক অধ্যায়েই কোন না কোন ভাবে আছে। এই ভক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবতে যে নয় প্রকার সাধনভক্তির কথা বলা হয়েছে, যা 'নবধাভক্তি'[২] নামে প্রসিদ্ধি, তাও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যদিও তিনি যথার্থ ক্রমানুসারে নবধাভক্তির আলোচনা করেননি তবুও অন্যান্য সাধনের বর্ণনার সাথে সাথে এই নবধাভক্তির বর্ণনাও এসে পড়েছে।

ভগবানের প্রতি অপরিসীম ভালবাসাই হচ্ছে ভক্তি।[৩] ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেমই ভক্তি। সাধারণ প্রেমে কাম ও প্রেম দুইটিই থাকে, কখনো কখনো কামভাব বেশী থাকে, কিন্তু ভগবানের প্রতি ভক্তিরূপ যে প্রেম তাতে শুধু প্রেম আর প্রেম, কামের গন্ধমাত্রও থাকে না। এই ভক্তিরূপ যে প্রেম তার বিরতিও নেই শেষও নেই। সহজ কথায় মনে প্রাণে ঈশ্বরময় হয়ে যাওয়াই ভক্তি। আর এই ভক্তিতে কোন অহঙ্কার থাকে না, অহঙ্কার নাশ করে ঈশ্বরে পৌঁছে দেয়। এই ভক্তি দুই প্রকার—সাধনভক্তি ও সাধ্য ভক্তি। একজনের কথা ভেবে ভেবে তার প্রতি যে ভক্তি জন্মায় তা সাধনভক্তি। আর সাধনভক্তি অসার পর যত তাকে জানা যায় ততই ভক্তি বাড়ে, একে সাধ্যভক্তি বা সাধন সঞ্জাত ভক্তি বলা হয়। সাধ্যভক্তিকে বলা হয় প্রেমভক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তি।[৪] এই প্রেমভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত কোন সাধনভোজনের, লোকধর্ম, দেহধর্ম, বেদধর্মের অপেক্ষা রাখে না।[৫] সাধনভক্তি আবার দুই প্রকার—রাগানুগাভক্তি ও বৈধীভক্তি।

ভালোবাসা থেকে ভালোবাসা জন্মায়, এ হল রাগানুগাভক্তি আর যে ভক্তিতে লোভ প্রবর্তক হয় না, শাস্ত্রশাসনই প্রয়োজন হয় তাকে বৈধীভক্তি বলে। আর এই বৈধীভক্তির মধ্যে নবধাভক্তি (শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা বা পরিচর্যা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন) অন্তর্গত। আবার কেউ কেউ বলেন যে নবধাভক্তির মধ্যে প্রথম সাতটি, শ্রবণ থেকে দাস্য পর্যন্ত সাধনভক্তির মধ্যে ধরা হয়, সখ্যকে সাধন ও সাধ্য উভয়াত্মক বলা হয় এবং আত্মনিবেদনকে প্রেমভক্তির বা রাগাত্মিকাভক্তির অন্তর্গত করা হয়।

এখন এই নবধাভক্তি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে কি বলেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করব। প্রথমে নবধাভক্তির প্রত্যেকটির ভাগবদ্‌কৃত অর্থ বলা হবে, তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে কি বলেছেন তা বলা হবে—

শ্রবণ ঃ নবধাভক্তির প্রথম হল শ্রবণ। শ্রীমদ্ভাগবতে বিষ্ণুর নাম-রূপ-মাহাত্ম্য শ্রবণের কথা বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও শ্রবণের কথা বলা হয়েছে এই বলে, আবার কেউ কেউ যাঁরা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন তাঁরা এইভাবে (ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি সাধন) আত্মাকে না জানতে পেরে অন্যের নিকট অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট শুনে তদনুসারে উপাসনা করেন এবং এইরূপ যাঁরা শ্রবণ পরায়ণ হয়ে উপাসনা করেন তাঁরাও মৃত্যুরূপ সংসারসাগর নিঃসংশয়ে অতিক্রম করেন।'[৬] তাহলে নবধাভক্তির প্রথম যে শ্রবণ তার শক্তি এতটাই যে, অল্পজ্ঞ, গৃহীব্যক্তি, যারা সংসার তাপে জর্জরিত তাঁরাও শ্রবণ পরায়ণ হয়ে জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে উপনিষদের একটি উপাখ্যান উল্লেখ করা হল—জাবালার পুত্র সত্যকাম ব্রহ্মকে জানার আশায় গৌতম ঋষির কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। ঋষি তাঁকে চারশত অত্যন্ত দুর্বল ও কৃশ গাভী পৃথক করে তাঁকে বলেন, 'হে সৌম্য! তুমি এই কারুদের পিছনে পিছনে যাও; গুরুর আদেশ শুনে সত্যবান অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললেন যে, 'এই চারশত গাভীকে এক হাজারে পরিণত করে নিয়ে আসব।' তিনি গরুগুলিকে তৃণ ও জলপূর্ণ গভীর বনে নিয়ে গেলেন এবং যেগুলির ঠিকঠাক সেবাযত্ন করে একহাজারে পরিণত করে গুরুগৃহে ফেরার পথেই ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে গেলেন।[৭] এইভাবে তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের আদেশ শ্রবণ করে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধানুসারে আচরণ করলে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করা যায়।

কীর্তন ঃ নবধাভক্তির দ্বিতীয় ভক্তি হল কীর্তন। শ্রীমদ্ভাগবতে বিষ্ণুনাম কীর্তন ও কৃষ্ণনাম কীর্তনের অনেক ঘটনা আছে। শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের শুধু নাম কীর্তন করলেও এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'দৃঢ়ব্রতভক্তগণ নিত্য আমার নাম, রূপ, লীলার গুণকীর্তন করে আমাকে লাভের জন্য চেষ্টা করেন।...'[৮] এছাড়া অন্য এক জায়গায় অর্জুন ভগবানকে বলছেন, '...আপনার নামরূপ ইত্যাদি মাহাত্ম্য কীর্তনে সমস্ত জগৎ আনন্দিত হয় ও আপনার প্রতি অনুরক্ত হয়।'[৯]

স্মরণ ঃ নবধাভক্তির তৃতীয়টি হল স্মরণ। সর্বদা ভগবানকে স্মরণের দ্বারাও ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতাতে ভগবান নিজেই বলেছেন যে, '...যিনি অনন্যচিত্তে আমাকে নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই

নিত্যনিরন্তর স্মরণশীল যোগীর নিকট আমি সহজলভ্য।'[১০] অর্থাৎ যাঁরা নিত্যযুক্ত হয়ে অর্থাৎ আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার—এইভাবে নিত্যসম্বন্ধ হয়ে থাকেন তাঁরা সহজেই ভগবানকে লাভ করেন। এছাড়াও ভগবান গীতাতে আর এক জায়গায় বলেছেন, '...যিনি 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করতে করতে এবং তার অর্থ স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মরূপ আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।'[১১] অতএব স্মরণের মাহাত্ম এতটাই যে দেহত্যাগের সময়ও যদি ভগবানের নাম স্মরণ করেন তাহলে এই সংসারচক্র থেকে নিস্তারলাভ করে ভগবানের আশ্রয় লাভ করেন।

পদসেবন বা পদবন্দনা ঃ নবধাভক্তির চতুর্থ ভক্তি হল পদসেবন বা পদবন্দনা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীহরির পদসেবা করার কথা বলা হয়েছে। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন '...ভক্ত প্রীতিপূর্বক আমাকে নমস্কার করে অনন্যভক্তিপূর্বক আমায় ভজনা করেন।'[১২] ভক্তিবাদী যে কোন দর্শন সম্প্রদায়ের প্রধান বক্তব্য হল ভগবানের পদসেবন দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া, তারা চায় ভগবানের পদসেবা করে অমৃত লাভ করতে। গীতাতেও ভগবান এ কথাই বলেছেন।

অর্চনা ঃ নবধাভক্তির পঞ্চম ভক্তি হল অর্চনা। ভগবানের নাম শ্রবণ, ভগবানের নামকীর্তন, ভগবানের নাম মনে মনে স্মরণ এবং ভগবানের সেবা ছাড়াও ভগবানের অর্চনা করলে অর্থাৎ, পতিব্রতা, রমণী যেমন স্বামীকেই তার সর্বস্ব মনে করে সর্বদা পতির চিন্তা করে, পতির আজ্ঞানুসারে পতির জন্যই কায়, মন ও বাক্যে কর্ম করে, ঠিক তেমনই পরমেশ্বর অর্থাৎ ভগবানকেই সর্বস্ব মনে করে তাঁর চিন্তা করলে এবং তাঁরই আজ্ঞানুসারে তাঁর জন্যই কায় মন ও বাক্যে কর্তব্য কর্ম করলেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই বলেছেন, 'যে পরমেশ্বর হতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই পরমেশ্বরকে নিজের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারা অর্চনা করে মানুষ পরমসিদ্ধি লাভ করেন।[১৩] 'তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও, আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও।'...তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে।'[১৪] এছাড়াও আরো কিছু জায়গায় ভগবান অর্জুনকে তাঁকে অর্চনা করার কথা বলেছেন।

বন্দনা ঃ নবধাভক্তির মধ্যে ষষ্ঠ ভক্তি হল বন্দনা। বন্দনারূপ ভক্তির দ্বারাও ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্জুন ভগবানের বন্দনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার পিতাও আপনি। আপনাকে সহস্রবার প্রণাম করি। পুনরায় প্রণাম করি। আপনাকে বার বার প্রণাম করি।'[১৫] অর্জুন আরো বলেছেন, 'হে অনন্ত সামর্থ্য সম্পন্ন! আপনাকে সম্মুখে প্রণাম, পশ্চাতে প্রণাম! সর্বদিক হতে প্রণাম।'...[১৬] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেও অর্জুনকে তাঁকে নমস্কার করার কথা, বন্দনা করার কথা বলেছেন, 'হে অর্জুন! তুমি আমার প্রতি মনযুক্ত হও, আমার পূজা করো এবং আমাকে নমস্কার করো।...তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে।...'[১৭]

দাস্য ঃ নবধাভক্তির সপ্তম ভক্তি হচ্ছে দাস্য। দাস্যভাবে ভক্তি হচ্ছে, 'ভগবান তুমি মালিক আমি হচ্ছি তোমার দাস।' দাস্যতে ভগবান মালিক বা প্রভু, ভক্ত তাঁর ভৃত্য, ভগবান ঐশ্বর্যশালী, ভক্ত দীন।

এই ভক্তিতে ভক্ত ভগবানের দাস হিসেবে সেবা করেন। অর্জুন ভগবানকে বলছেন, '...আমি আপনার শিষ্য (দাস), আপনার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দিন।'[১৮] ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন, 'হে পার্থ তুমি আমার ভক্ত।....'[১৯] গীতাতে অর্জুন হলেন ভগবানের দাস। অর্জুন মোহান্বিত হয়ে পড়ার পর, অর্জুনের মোহভঙ্গ করার জন্য ভগবান একে একে তাঁকে বিভিন্ন যোগ ও তথ্যের কথা বলে বিশ্বরূপ দর্শনও করিয়েছেন। ক্রমে ক্রমে অর্জুনের মোহভঙ্গ হয়েছে এবং অর্জুন তাঁর রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানতে পেরে তাঁকে নিজের গুরু হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং নিজেকে তাঁর ভক্ত, দাস, সেব্য বলে তুলে ধরেছেন।

সখ্য ঃ নবধাভক্তির অষ্টমভক্তি হল সখ্য। দাস্যভক্তিতে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে দূরত্ব থাকে তা কেটে যায়, দূর হয়। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, 'তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয় সখা...।'[২০] আবার অর্জুন ও ভগবানকে বলেছেন, 'হে দেব! পিতা যেমন পুত্রের; সখা যেমন সখার এবং পতি যেমন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করেন তেমনই আপনিও আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।'[২১] তাহলে গীতাতে ভগবান নিজেও অর্জুনকে যেমন সখা বলেছেন তেমনই অর্জুনও ভগবানকে নিজের সখা ভেবেছেন।

আত্মনিবেদন ঃ নবধাভক্তির নবম বা শেষ ভক্তি হল আত্মনিবেদন। সর্বশেষে সর্বনিয়ন্তা, সর্বান্তর্যামী ভগবানের প্রতি, হরির প্রতি সর্বপ্রকারে শরণাগত হওয়াই হল আত্ম-নিবেদন। ভগবান অর্জুনকে বিভিন্ন সময় তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করার কথা বলেছেন, 'তারপর সর্বতোভাবে যেই পরমপদরূপ পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করা উচিত, যাঁকে প্রাপ্ত হলে জগতে আর ফিরে আসতে হয় না এবং যে পরমেশ্বর হতে এই অনাদি সংসার ব্রহ্মের বিস্তার হয়েছে, আমি সেই আদি পুরুষ নারায়ণের শরণাগত হই'[২২] 'হে ভারত! তুমি সর্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরেরই শরণ গ্রহণ করো।'...[২৩] সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত কর্তব্যকর্ম আমাতে অর্পণ করে তুমি সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমেশ্বররূপে একমাত্র আমার শরণ নাও...।[২৪] অর্থাৎ ভগবান অর্জুনকে সফল কর্তব্য অকর্তব্যাদি অর্পণ করে সর্বতোভাবে তাঁর শরণ, তাঁর কাছে আত্মনিবেদনের কথা বলেছেন এবং এও বলেছেন যে সেই পরমেশ্বরের (আমাতে) শরণ গ্রহণ করলে এই জগতে আর ফিরে আসতে হয় না, জগতের এই বেড়াজাল থেকে মানুষ মুক্তিলাভ করে।

এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতকৃত যে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদবন্দনা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদনরূপ নবধাভক্তির উল্লেখ যে গীতাতেও আছে তা দেখানো হল। যদিও গীতাতে এই নবধাভক্তির প্রত্যেকটি পরপর আলোচনা নেই তবুও ভগবানের বাণী এত সবিশেষ যে, তাতে অন্যান্য সাধনের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নবধাভক্তির বর্ণনাও করা হয়েছে। অবশেষে বলা যায় যে, গীতাতে সকল শাস্ত্রীয় কথাই বলা হয়েছে, এমন কোন শাস্ত্রীয় কথা নেই যা গীতাতে বলা হয়নি। তাই গীতার অর্থ ঠিকঠাক যদি কেউ অনুধাবন করতে পারেন তাহলে তাঁর আর অন্য কোন শাস্ত্র পড়ার প্রয়োজন হবে না, তাঁর পরমানন্দ প্রাপ্তি হবে কারণ, গীতা হল সব শাস্ত্রের সার।[২৫] গীতা জানলে আর অন্যশাস্ত্র জানার আর প্রয়োজন পড়ে না।

তথ্যসূত্র ঃ

১। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১।৪৫
২। শ্রবণ্য-কীর্তন্য বিষ্ণোঃ স্মরণং পদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যম্ সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।—শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।২৩
৩। স্বামী ভূতেশানন্দ, নারদীয়ভক্তিসূত্র, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ১৫
৪। 'রাগ' শব্দের অর্থ হল, ইষ্টবস্তুর প্রতি প্রেমময় তৃষ্ণা। আর 'রাগ'ই আত্মা যে ভক্তির অথবা রাগৈক-প্রেরিতা' যে ভক্তি তাকেই বলে রাগাত্মিকা ভক্তি।—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।২৭২
৫। সনাতন গোস্বামী, বৈষ্ণবপদাবলী পরিচয়, শম্পা বুক হোম, ৯এন্টনীবাগান লেন, কলিকাতা, ২০০২, পৃঃ ৩০
৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১৩।২৫
৭। ছান্দোগ্যউপনিষদ্ ৪।৪-৯
৮। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৯।১৪
৯। তদেব ১১।৩৬
১০। তদেব ৮।১৪
১১। তদেব ৮।১৩
১২। তদেব ৯।১৪
১৩। তদেব ১৮।৪৬
১৪। তদেব ৯।৩৪
১৫। তদেব ১১।৩৯
১৬। তদেব ১১।৪০
১৭। তদেব ১৮।৬৫
১৮। তদেব ২।৭
১৯। তদেব ৪।৩
২০। তদেব ৪।৩
২১। তদেব ১১।৪৪
২২। তদেব ১৫।৪
২৩। তদেব ১৮।৬২
২৪। তদেব ১৮।৬৬
২৫। তস্মাদ্ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রযোজিকা। সর্বশাস্ত্রসারভূতা সা বিশিষ্যতে।।—গীতামাহাত্ম্যম-১৯

" 'আমি ও আমার' এই দুটি অজ্ঞান। 'আমার বাড়ী, আমার টাকা, আমার বিদ্যা, আমার এইসব ঐশ্বর্য' এই যে ভাব এগুলি অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর এ-সব তোমার জিনিস—বাড়ী, পরিবার, ছেলে-পুলে, লোকজন, বন্ধু-বান্ধব—এসব তোমার জিনিস'—এ-ভাব জ্ঞান থেকে হয়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

"ঠাকুরই সব। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট। তাঁর মাঝে গুরু ইষ্ট সব পাবে। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি, তিনিই সর্ব দেবময়; সর্ব বীজময়। তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।"

—শ্রীশ্রীমা সারদা

ভাষা আন্দোলন ঃ ইতিহাস ও প্রয়োজনীয়তা

সৌরভ দাস

স্নাতকোত্তর বাংলা, দ্বিতীয় বর্ষ

একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যেতে পারে ইতিহাসের সুরটিকে তথ্যের বাইরে জীবনমুখী করে তোলার জন্যই। কারণ সাহিত্য যেমন জীবন সত্যকে তুলে ধরে, ইতিহাসও তেমনি কালের সত্যকে ধারণ করে। সত্য প্রকাশের বিন্দুতেই দু'জনে এক হয়ে যায়। হঠাৎ করে ইচ্ছা হল 'উজ্জ্বল নীলমণি' পড়ব। লাইব্রেরি থেকে ঘটা করে একটা বইও ইস্যু করলাম। যদিও বইটা সংস্কৃতে লেখা; কারণ বইটার কোনো বাংলা অনুবাদ আমি পাইনি। কিন্তু গল্পটায় তার থেকেও বড়ো সত্যটা হল আমি সংস্কৃত পড়তে পারি না। তবুও ইস্যু করলাম একটা সংস্কৃতের ছাত্রের (আমার হার্দিক বন্ধু আর কি) ভরসায়। কিন্তু বইটা যে যতটা আনন্দের সঙ্গে নিল তার থেকেও নিরানন্দের সঙ্গে জানাল টীকা উদ্ধার করা সম্ভব, কিন্তু কি জানিস সময় লাগবে বেশ। আমি তখন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার জাবর কেটে 'উজ্জ্বল নীলমণি'র জ্ঞান ঝাড়ছিলাম, আর কি! হঠাৎ করে, যা হয় আর কি—মোটা ও দুর্বোধ্য বই, শেষ পৃষ্ঠা খুলে বললাম—কতগুলো পাতা আছে বলতো? এবং প্রশ্নটা করার পর আমি যৎপরোনস্তি বিভ্রান্ত হলাম আমার 'নিরস্তরতা' নিয়ে।

২১শে ফেব্রুয়ারির পিছনেও এরকম এক বিভ্রান্তির ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। সংকটটা তৈরি হয়েছিল মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে। সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চওয়ায় বাংলা ভাষা-ভাষী পূর্ব পাকিস্তানীদের সম্মিলিত প্রতিবাদ আন্দোলন হিসাবে উঠে আসে পাকিস্তান গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

এটা গেল ইতিহাসের কথা। বিখ্যাত ফরাসী ইতিহাসবিদ্ ফুসতেল দ্য কুঁলাজ বলেছিলেন—"ইতিহাস আমোদ প্রমোদের বিষয় নয়, ইতিহাস, বিজ্ঞান, এবং আমাদের পছন্দসই বিশেষ বিশেষ যুগের সঙ্গে পরিচয়ও এর উদ্দেশ্য নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হল মানুষের অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে তাকে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত করা।" এবং অস্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েই বোধহয় ৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। ব্রিটিশ আমলে মুসলিমরা দেখেছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুরা তাদের থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি সর্বোপরি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল এবং মুসলিমরা হয়েছিল বিপর্যস্ত। ফলত এই ইতিহাসের শিক্ষাও আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা জোগায়। তারা বুঝেছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষরা রাতারাতি 'নিরক্ষর' ও সরকারি ক্ষেত্রে অন্তত 'অযোগ্য' বলে প্রমাণিত হবে। ফলে সেটিও একরকমের অধিগ্রহণ-সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারিতা। গণতন্ত্রের বিপরীতে এ তো পরাধীনতার গ্লানিবোধই তৈরি করে।

অতএব, এ কথা বোঝা যায় আন্দোলন ছিল অনিবার্য এবং শহীদ হওয়াটাও (হয়ত বা) অমোঘ।

১৯৯৯ সালে ইউনেসকোতে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালনের জন্য যে প্রস্তাব পাঠানো হয় তার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষাপ্রেমী শহীদদের উদ্দেশে সম্মাননা

প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজ নিজ মাতৃভাষার প্রতি দরদ ও শ্রদ্ধা অর্পণ। কারণ মাতৃভাষাই তো আমাদের প্রকাশ করে এরকম ভাবে। সুতরাং আজকের অনুষ্ঠান আয়োজনের পিছনেও এই ইতিহাসটিই কার্যকর।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি ভারতীয় বাংলা ভাষা-ভাষীদের মধ্যে একটা হীনমন্যতার বোধ তৈরি হচ্ছে। এর কারণ হয়ত কেন্দ্রিয় স্তরে হিন্দি ও আন্তর্জাতিক স্তরে ইংরেজি-অন্তত এই দুটি ভাষার অধিগ্রহণ। উত্তর-ঔপনিবেশিকতা দিয়ে এর হয়ত একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খাড়া করা যেতে পারে। বাংলা সংস্কৃতিই বিপন্ন বলা যেতে পারে এবং তা ঘটছে অত্যন্ত নিস্তব্ধ ভাবে।

ভারতে মোট ২২টি ভাষা অঞ্চল বিশেষে official language হিসাবে স্বীকৃত এবং জনসংখ্যার বিচারে বাংলাভাষা সেখানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে—এ তো বাঙালি জাতির গর্ব করার মতোই সত্যি; কিন্তু তবুও হিন্দি ভাষার প্রতি পক্ষপাত কেন্দ্রিয় স্তরে কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করতে চাওয়ার কারণেই হয়ত—কারণ কেন্দ্রীয় স্তরে হিন্দি ও ইংরাজিই সরকারি কাজকর্মের ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। এখানেই মাতৃভাষা কেন্দ্রিক একটা সমস্যা তৈরি হয়।

ইংরাজির ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা আরো জটিল। বাংলা মিডিয়াম ছেড়ে ইংরাজি মিডিয়ামে পড়াশোনা করানোর ঝোঁক বাবা-মাদের মধ্যে ক্রমশই বাড়ছে। কিন্তু যে শিশু অভিজ্ঞতা অর্জন করছে বাংলায়, তার পুঁথিগত বিদ্যা ইংরাজিতে হলে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে কি বিপুল শূন্যতার সৃষ্টি হয় না?

আবার এই সত্যিটাও মানতে হবে যে বাংলা ভাষার সীমাবদ্ধতা আছে। 'সর্ববিদ্যা শিক্ষা দান' বাংলা ভাষায় সম্ভব নয়, বেশ কিছুর ক্ষেত্রে ইংরাজির সাহায্য নিতেই হয়। সেক্ষেত্রে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষার হওয়াটাই বিধেয়। রবীন্দ্রনাথের সমর্থন নিয়ে বলা যায়, শিশুর শারীরিক পুষ্টির জন্য যেমন মাতৃদুগ্ধ চাই তেমনই তার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চাই মাতৃভাষা। সঙ্গে এটাও বলা যায় যে দ্বিতীয় ভাষাশিক্ষা মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে হওয়াটাই সহজ। সে কারণেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

যদিও এ কথা বলে মানুষের মন থেকে বিভাষার প্রতি মোহভঙ্গ সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রেই ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয়। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আজকের ভাষা সংকটের থেকে উত্তরণের কথা ভাবা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অধ্যায় যা আজকের দিনের ভাষা সমস্যার সমাধানের পথ দেখাতে পারে।

যদিও এটাও সত্যি যে আজকের সংকট খুব ব্যাপক নয়। বাংলাভাষাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে—এমন কোনো সম্ভাবনা নেই এখনও, কারণ পৃথিবীতে প্রায় ২০০ মিলিয়ন মানুষ বাংলা ভাষার কথা বলে। শুধু পশ্চিমবঙ্গকে ধরলেও সংখ্যাটা ৮৫ মিলিয়নের মতো। সেক্ষেত্রে হিন্দি বা ইংরাজিমুখাপেক্ষিতা সামান্য কিছু শিক্ষিত নাগরিক শ্রেণির মানুষের মধ্যেই সীমায়িত। এবং বাস্তব সত্যি এটাই যে বহু মানুষ উপভাষার স্তর থেকে চলিত ভাষার স্তরেই এখনও আসতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কোনো ভাষাকে শক্ত করার জন্য, উন্নত করার জন্য উপভাষা বা ভাষার বিভিন্ন স্তরগুলিকে রক্ষা করা প্রয়োজন। উড়িয়া গদ্যের জনক নামে অভিহিত ফকিরমোহন সেনাপতি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছিলেন—উড়িয়া গদ্য সৃষ্টিতে আরবি-ফারসির অন্তরায়কে পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল অন্তঃপুরের মা-লক্ষ্মীদের ভাষার দ্বারাই।

আবার নিজ ভাষাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে অপর ভাষাকে হেয় করা ঠিক নয়। সহমর্মিতার বোধ থাকা প্রয়োজন। যেমন পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান বাংলা ও ইংরেজি ছাড়াও আরো ছ'টি ভাষাকে official language হিসাবে রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলাভাষাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যান্য ভাষাকে কোণঠাসা করা অনুচিত। এ ব্যাপারে আসামে 'বঙ্গাল খেদাও আন্দোলন' যে লজ্জাজনক ইতিহাসের সাক্ষী তা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটাবো না—আশা করা যায়। সুতরাং আজকে আমরা একটা ঐতিহাসিক দিনকে স্মরণ করছি।

কুঁলাজ বলেই গেছেন ইতিহাস বিলাসের জন্য নয়। ইতিহাসকে অনুধাবন করে আমরা আজকের সত্তা সংকটকে পেরিয়ে যেতে পারি। এই আলোচনা সভার গুরুত্ব এখানেই। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে স্মরণের গুরুত্ব এখানেই। সুতরাং এখানে উপস্থিত আমরা ক'জনও মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝতে পেরে বৃহৎ জনসাধারণের কাছে মাতৃভাষাকে ভালোবাসার আবেদন পৌঁছে দিতে পারি, তবেই আজকের অনুষ্ঠানের মূল্য থাকবে। তাই বন্ধ দরজার পেছনে নয়, খোলা আকাশের নিচেই এ ধরণের অনুষ্ঠান করা উচিত। কিন্তু যে কোনো বড়ো কাজের পিছনেই দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন, এ শিক্ষা ইতিহাসই আমাদের দেয়। সেই প্রস্তুতিই চলছে এখানে আশা করা যায়। এ বিষয়ে বিশেষত ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, পারতপক্ষে বাংলাভাষা-সাহিত্যের ছাত্রদের সমাধানের পথ ভাবতেই হবে—এ বোধই তো গড়ে দেয় ২১ ফেব্রুয়ারি এবং ইতিহাস।

"আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে, তারই হবে। হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বৈ আর কিছু চায় না। তারই হবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

"যেমন চিন্তা তেমন কর্ম হয়ে থাকে। প্রেমপূর্ণ চিন্তা যেমন আত্মবিকাশের সহায়ক, তেমনি রাগদ্বেষপূর্ণ চিন্তা আত্ম-সংকোচনের কারণ।"

—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

কবিতায়’ ২১

সুদীপ্ত দে
স্নাতক বাংলা, তৃতীয় বর্ষ

মাগো
ওরা বলে
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না
বলো, মা
তাই কি হয়?

—(কোনও এক মা-কে)
আবু জাফর ওয়ায়েদুল্লাহ

‘তাই’ হতে না দেওয়ার জন্যই, মাতৃদুগ্ধসম মাতৃভাষার এহেন লাঞ্ছনা হতে না দেওয়ার জন্যই সেদিন রক্ত ঝরেছিল জব্বার রফিক সালাম বরকতের মত শত শত বঙ্গসন্তানের, আজ যা ইতিহাস। অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশীদের মতে, ‘ভাষার প্রশ্নে রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে পূর্ববাংলার জনগণের যে দ্বন্দ্ব তারই প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি’।

কি ছিল এর পূর্ব ইতিহাস, কেনই বা রক্ত ঝরেছিল? ১৯৪৭ এর ক্ষত বুকে নিয়েই পৃথক হয়ে গেল ভারত পাকিস্তান আলাদা দুটি রাষ্ট্রে। পাকিস্তানের একাংশ হয়ে পড়ল সুবে বাংলা যার নাম হল পূর্ব পাকিস্তান। ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে যাওয়া পূর্ব পাকিস্তানে হাজার হাজার মাইল দূরত্বের রাষ্ট্র ভাষা উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন পাকিস্তান প্রধান জিন্না। ১৯৪৮ এর ২১শে মার্চ রেসকোর্সে জিন্নার যে ভাষণ তাতে প্রকাশ পেল বাংলা ভাষার প্রতি তার অপরিসীম অবহেলা ও গভীর অনীহা। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন ‘উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’। এমনকি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ঢাকায় পাকিস্তানী প্রধান মন্ত্রী জনাব নাজিমউদ্দীন ঘোষণা করেন পাকিস্তানের “একমাত্র ভাষা হবে উর্দু” আরো বলা হয় “উর্দু মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা যে এই ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলবে সে কাফের” এমন উদ্ধত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভে ফেটে পড়ল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা। গঠন করা হল এক “সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ” অনড় সরকারকে আঘাত দেবার জন্য সর্বদলের রাজনৈতিক কর্মী, জনগণ, ছাত্রেরা, শিক্ষক-অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী সম্মিলিত হয়ে প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ ডাক দিলেন সাধারণ ধর্মঘটের। শ্লোগান উঠলো ‘রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।’ সরকার জারি করল ১৪৪ ধারা, ছাত্রেরা তা অমান্য করে এগিয়ে গেল—শুরু হল শাসকশক্তির সাথে ছাত্র সমাজের প্রবল সংঘর্ষ। পুলিশের হিংস্র আক্রমণ, কাঁদুনে গ্যাস, গুলিতে আহত হল বহুজন। শহিদ হলেন জব্বার, রফিক, বরকত, সালাম। এই আত্মদানের ফলে পাকিস্থান সরকার বাধ্য হলেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে। বাংলা পেল আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা।

কবিতায় কি প্রভাব ফেলল একুশের আন্দোলন তা দেখা যাক। ওপার বাংলার ভাষা আন্দোলন বাংলা কবিতা কে যে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছিল, তার বাঁক বদল ঘটিয়েছিল সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি কবিদের কাছে সমার্থক হয়ে গেছে। তাই বাংলা ভাষাকে ঘিরে যে আবেগ, অনুরাগ, অভিমান-উচ্ছ্বাস উদ্ভাসিত হয়েছে তা প্রকাশ পেয়েছে কবি সাহিত্যিকদের রচিত গান, কবিতা, নাটক প্রভৃতি রচনায়। অধ্যাপক সাঈদ-উর-রহমান তাঁর 'পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা' গ্রন্থে পূর্ব বাংলার কবিতাকে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করেছেন—

ক) ১৯৪৭-৫৪ খ্রিঃ

খ) ১৯৫৪-৫৮ খ্রিঃ

গ) ১৯৫৮-৬৫ খ্রিঃ

ঘ) ১৯৬৫-৬৯ খ্রিঃ

ঙ) ১৯৬৯-৭১ খ্রিঃ

১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় যে দেশপ্রেমের জাগরণী গীতি গীত হয় সে উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়ে যায় সমগ্র বাঙালিকে। এই সময়কার আন্দোলনের চরিত্রটা অনেকটা ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের মতো। ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত শহীদ দিবস আরো গাঢ় ও জোরদার করে তোলে কবিতার অবয়ব। এসময়ে রচিত কবিতায় কালিপ্রসন্ন, সরলাদেবী চৌধুরাণী, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতার ভাব ও ভাষা এমনকি উচ্চারণ ভঙ্গিতেও নিকট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ভাষার প্রশ্নে কবিরা অনুভব করেছেন তাদের দেশীয় স্বরূপ, সাহিত্য কী হবে। বাংলা দেশের জনজীবন সংস্কৃতি ইতিহাস সমাজ সংসার তুলে ধরেছেন তাঁদের কবিতায় ও লেখায় ভাষা শহীদদের স্মরণে ও শ্রদ্ধায় নির্মিত ভাষাপ্রীতির অন্যতম স্মারক শহিদমিনার, যা কী না বর্বর সরকারের রোষ দৃষ্টির কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তার এহেন মর্মান্তিক পরিণতিতে বেদনার্ত হয়ে কবি আল-আজাদ **'স্মৃতিস্তম্ভ'** কবিতায় লেখেন—

"স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু?
আমরা এখনো চারকোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো।
যে ভীত কখনো কোনো রাজন্য পারেনি ভাঙতে"

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হারুন-উর-রশিদ যথার্থই বলেছেন—'শহীদ মিনার, বাংলা ভাষা, মা, একুশে ফেব্রুয়ারি এই চারটি শব্দ ভাষা আন্দোলনের কবিতায় প্রতীক হয়ে উঠেছে।'

৫২'র ভাষা আন্দোলনের প্রধান দাবিই ছিল মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার, স্বাধীন উচ্চারণ। তাই পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার জোরপূর্বক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে সাধারণ মানুষের মতো কবিদের কলমও প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। তার ছাপ লক্ষ করি কবি সৈয়দ শামসুল হকের লেখনীতে—

'এসো ছিনিয়ে নি আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা,
কথা বলবার স্বাধীনতা, অক্ষরের
ডানপাশে অক্ষর বসিয়ে শব্দগুলো
তৈরি করবার স্বাধীনতা...'

কবি মাহমুদ আল জামান লেখেন—

'ফের পাবো
স্বর
উচ্চারণ
নিবিড় ছায়াময় পাতা'

শামসুর রহমান তাঁর '**বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা**' কবিতায় লেখেন—

'হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে,
তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কি থাকে আমার?
উনিশশো বাহান্নোর, কতিপয় তরুণের খুনের পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।
সে-ফুলের একটি পাপড়িও আজ ছিঁড়ে নিতে দেবো না কাউকে।...
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।'

কবি দাউদ হায়দার কখনই অন্য ভাষাকে মেনে নেননি, তাই 'যা আমার নয়, যা আমি বুঝি না' কবিতায় বলেন—

'যা আমার কোন কালের ভাষা নয়,
যা আমি কক্‌খনো বুঝি না।'

ভাষা মা'কে ভালোবেসে, ভাষাপ্রেমে যাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন সেই রফিক, বরকত, সালাম সহ নাম-না-জানা আরও অনেকেই যাঁদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল সেদিনের রাজপথ, সেই সব বীর শহীদের স্মরণে কবিদের কলম-রক্ত-চোখের জলে ভিজে উঠেছিল। কবি হাসান হাফিজুর রাহমান '**চোখের জলে ধোয়া**' কবিতায় লেখেন—

'বরকতের রক্তাক্ত শার্টের জ্বলজ্বলে রঙ
অবিনাশী সূর্য।'

শামসুর রহমান লেখেন—

'জ্বলন্ত মেঘের মতো
আসাদের শার্ট উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়'

অথবা,

'দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা।'

কবি আল মাহমুদ লেখেন—

'ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলায় অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?
বরকতের রক্ত।'

'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতায় কবি মাহবুব-উল আলম চৌধুরী অন্যায় অত্যাচারী শাসকের প্রতি সরাসরি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছেন—

'এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার উর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়
যেখানে আগুন ফুলকির মতো
এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ
সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি।...
আমি তাদের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি
যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনেদের
নির্বিচারে হত্যা করেছে।'...
ভাষার জন্য মাতৃভাষার জন্য বাংলার জন্য
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে...'

'একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতায় স্মৃতি বেদনায় ভারাক্রান্ত আবদুল মান্নান সৈয়দ লেখেন—

'অজস্র দিনের মধ্যে জ্বলছে একুশে ফেব্রুয়ারির সালাম-বরকত-শফি-
রফিক-জব্বার-আত্মায় আহত হয়ে তুলেছে উদ্দীপ্ত তরবারি।'

আসলে একুশে ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহের প্রতীক। অন্যায় অত্যাচারের এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, বহ্নিত প্রেরণা। তাই কি কবিতা, কি গান সব কিছুতেই ঘুরে ফিরে এসেছে একুশ। শামসুর রহমান তাঁর **'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে'** কবিতায় ভাষা মায়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করে লিখেছেন—

'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে ঝরে
রোদ, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন।...
বাঙলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত
চেনা ছবি; মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন
ঘুম-পাড়ানিয়া ছড়া কোন সে সুদূরে;....'

আর এভাবেই ওপার বাংলার কবিদের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে ওঠে **'একুশের প্রথম প্রভাত ফেরি—অলৌকিক ভোর'।**

তথ্যসূত্র ঃ

১। 'ভাষা আন্দোলনের ইতিকথা' - ডঃ মিজান রহমান সম্পাদিত (কথা প্রকাশ)।
২। 'ওপার বাংলার কবি ও কবিতা'-তরুণ মুখোপাধ্যায় (বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ)।
৩। 'বাঙলা দেশের কবিতা' - দাউদ হায়দার সম্পাদিত (এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড)।
৪। 'একুশের সঙ্কলন' ৭৭'-ডক্টর আশরফ সিদ্দিকী সম্পাদিত (বাঙলা একাডেমি ঃ ঢাকা)
৫। 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা'-ডঃ অশোক কুমার মিশ্র (দে'জ পাবলিশিং)

বহুভাষিক রাষ্ট্রে মাতৃভাষা চর্চা

শঙ্কর মণ্ডল

স্নাতকোত্তর বাংলা, প্রথম বর্ষ

প্রতিটা মানুষের কাছে তার মাতৃভাষা প্রাণের সম্পদ। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমাদের এই মাতৃভাষা বাংলাকে কেন্দ্র করে ওপার বাংলা ও এপার বাংলা আজ সর্বত্রই ভাষা দিবস পালিত হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দুই দেশের মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য কোথাও আলাদা হয়ে যায়।

পূর্ববঙ্গের মানুষেরা কেবল মাতৃভাষাকে ভালোবেসে ১৯৫২'র সেই রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলো। এই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করেই ১৯৭১ এর বাংলাদেশের মুক্তির দাবী, মুক্তিযুদ্ধ, অবশেষে স্বাধীনতা প্রাপ্তি। এবং এই মাতৃভাষা বাংলাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। আবার ইউনেস্কো প্রবর্তিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের নেপথ্যেও আছে ১৯৫২'র সেই রক্তাক্ত স্মৃতি যা বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরম গৌরবের।

বাঙালি হিসেবে সেই গৌরবের অংশীদার আমরাও বটে। মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে আমরাও গর্বিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। বাংলাদেশ এক ভাষা, এক জাতি, এক রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতবর্ষ নানা ভাষা, নানা জাতির দেশ। সেখানে দাঁড়িয়ে কেবল ভাষাগত ক্ষেত্রেই আমরা বাঙালি নই, বাঙালি সংস্কৃতি আমাদের মর্মে ও মজ্জায়। কিন্তু এর বাইরেও আমাদের আরো এক বৃহত্তর পরিচয় আছে, আমরা ভারতবাসী।

ভারতে স্বীকৃত জাতীয় ভাষার সংখ্যা আঠারোটি। ছোট-বড় মিলিয়ে মাতৃভাষা ২৬০ এরও বেশি। তাই ভারতের মত বহুভাষিক রাষ্ট্রে অতিরিক্ত মাতৃভাষাপ্রীতি এক মারাত্মক খেলা। তার সাক্ষী আমাদের অতীত ইতিহাস ও বর্তমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে আসামের বঙ্গাল খেদা আন্দোলন। আবার আঠারোটি ভাষা যেখানে জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃত, সেখানে হিন্দিকে উন্নত করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। অহিন্দিভাষীদের হিন্দি শিখলে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরীগুলিতে তাদের আগাম বেতন বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

আমাদের মাতৃভাষা প্রেমীরা মাতৃভাষার প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে এতটাই অন্ধ হয়ে যাই যে, আমাদের মাতৃভাষা যে সংখ্যালঘু মানুষের মাতৃভাষাগুলিকে ধ্বংস করছে সেটা একেবারেই খেয়াল রাখি না। বিহারে হিন্দিকে একচ্ছত্র করে তোলার ফলে মৈথিলির মত এক সমৃদ্ধিশালী ভাষা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। আবার যদি বাংলাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়, দেখা যাবে সে একই সঙ্গে শিকার ও শিকারী। ইংরাজি ও হিন্দির ক্রমবর্ধমান প্রসারের ফলে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের বুকেই যে বাংলা ভাষার নাভিশ্বাস উঠবে না, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এর মূলে যেমন আছে বিশ্বায়ন,

তেমনি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। যেখানে এত মানুষ বাংলায় কথা বলে, সেখানে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাংলার গুরুত্ব কোথায়?

আবার এই বাংলা ভাষার কারণেই সাঁওতালি ভাষা আজ অনেকটাই বিপন্ন। পড়াশুনা বা কর্মসূত্রে যেসব সাঁওতালরা নগরমুখী হচ্ছে তারা ধীরে ধীরে ভুলতে বসেছে তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। তবে তাদের মধ্যে এখনো যতটুকু টিকে আছে কয়েক প্রজন্ম পরে তা কতোটা টিকে থাকবে তা নিয়ে সংশয় আছে। সাংবিধানিক ক্ষেত্রে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির যে অধিকার ও সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি কতোটা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।

ভাষার এই আগ্রাসন কেবল তুলনামূলক কম শক্তিশালী ভাষাকেই বিপন্ন করছে না, ডেকে আনছে রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় দার্জিলিং সন্নিহিত নেপালি উপজাতি গুর্খাদের গুর্খালি নামক উপভাষা ভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে প্রশ্রয় দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সত্তায় স্থায়ী আঘাত হেনেছেন। সেখান থেকে লেপচারা আজ উৎখাত। অধুনা উত্তরবঙ্গে কামতাপুরী নামক উপভাষাভাষীরা স্বতন্ত্র রাজ্য চাইছেন। হিন্দিভাষী ঝাড়খণ্ডীরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এলাকা কেড়ে নিতে চাইছেন। মোট কথা মাতৃভাষাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে এই বিচ্ছিন্নতাবাদ কি জাতীয় সংহতির অন্তরায় নয়? তবে একথাও ঠিক যে, রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি যদি প্রত্যেকটা ভাষাভাষী মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সহায়ক না হয়, তাহলে তাদের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখানো মুশকিল হয়ে পড়ে।

মনে প্রশ্ন জাগে আমরা কি আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে সত্যি ভালোবাসতে পেরেছি! আমরা যারা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র তাদের অনেকের কাছে এই ভাষাটি কামধেনুর মত। দুধ দিতে পারলে ভাল, না দিতে পারলে খারাপ। গ্রাম বা শহরে এরকম অনেক মানুষকেই দেখছি, যারা হয়ত বাংলা ভাষার বাইরে আর অন্য কোনো ভাষা জানেই না, অথচ বাংলা সাহিত্য আমাদের চর্চার বিষয় শুনলে তাদের ঠোঁটের কোণে খেলে যায় বিদ্রূপের হাসি। তারা বাংলাকে বিষয় কেন্দ্রিক ভাবে দেখে, ভুলে যায় বাংলা তাদেরও মাতৃভাষা। আবার একই মাতৃভাষার সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় বাঙাল-ঘটির দ্বন্দ্ব স্মরণ করার মতো। ভাষাই যদি একতার বাণী হবে তাহলে আমরা এ বঙ্গে নজরুলকে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারিনি কেন? ইতিহাসের পরিহাস এই যে, যে বঙ্গ তাঁর মাতৃভূমি নয়, রাষ্ট্রের ঘোষিত ধর্ম যেখানে ইসলাম, সেখানেই তিনি জাতীয় কবি।

এটাও চর্চার বিষয় হতে পারে, আমরা যে মাতৃভাষার উত্তরাধিকার বহন করছি, তা কি সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা! নাকি কোনো শীলিত মার্জিত কৃত্রিম ভাষা। সাধারণ মানুষের ভাষা সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই অসহিষ্ণু ছিলেন। সেইসময় ঠাকুর বাড়ীকে কেন্দ্র করে চলছে ভাষার ভদ্রায়ন প্রক্রিয়া। হুতোমের নকশাকে বঙ্কিম অপছন্দ করছেন। মধুসূদন আলালের ভাষাকে বলছেন "জেলেদের ভাষা।" প্রমথ চৌধুরী 'কলকেত্তাই' ভাষার কথা বললেও, সে বাবু বাংলা, কৃত্রিম কলাকৌশল ও বুদ্ধিদীপ্তির মারপ্যাঁচে ঘেরা। এঁদের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বামীজি। তিনি ভাষার পরিশীলিত রূপের বিরোধী ছিলেন। তিনি কলকাতার মানুষের আটপৌরে মুখের ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে তিনি লিখছেন—

যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর। তবে লেখবার সময় একটা কিম্ভুতকিমাকার উপস্থিত কর। যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন, বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশ জনে বিচার কর সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়?

কিন্তু সেদিন সেই অভিজাত মণ্ডলীর কাছে স্বামীজির এই গভীর মননশীল যুক্তি ধোপে টেকেনি।

এত কিছু সত্ত্বেও বলব, আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে ভালোবাসি। এই ভাষা তো কেবল আমাদের ভাব বিনিময়ের মাধ্যম নয়, আমাদের প্রাত্যহিক দিনযাপনের সঙ্গী। আমাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ তথা অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। তাই কবি শামসুর রহমান যখন বলেন—

হে তোমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।
তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো, তবে কী থাকে আমার।

এই উচ্চারণ তো কেবল নির্দিষ্ট যুগপ্রেক্ষাপটে কিংবা ব্যক্তিক সীমানায় আবদ্ধ থাকে না। তা হয়ে ওঠে সর্বকালের, সর্বজনের। কারণ এই মাতৃভাষাই জাতির অস্তিত্ব থেকে ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস থেকে ঐতিহ্য নির্মাণে সহায়ক।

“জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় ‘আমি অকর্তা’ এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।”

—শ্রীরামকৃষ্ণ

“আমি সতেরও মা, অসতেরও মা, সব সময় ভাববে আর কেউ না থাক, তোমাদের একজন মা আছে।”

—শ্রীমা সারদাদেবী

কান্টের ভাবনায় পরার্থ-দর্শন

সৌমেন পাল
অতিথি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

সমাজকে টিকিয়ে রাখতে গেলে সমাজে বসবাসকারী মানুষদের আচরণ কোন পথে চালিত হওয়া উচিত তা নির্ধারণের একটি শাস্ত্র থাকা দরকার। নীতিবিদ্যা হল সেই শাস্ত্র। এখানে প্রধানত নানা নৈতিক মানদণ্ডের গুণাগুণ বিচার করে কোনটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে তা খতিয়ে দেখা হয়। এই নীতিবিদ্যা যে সমস্ত মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা করে সেগুলির মধ্যে যেমন পরবাদী মানদণ্ড আছে তেমনি আত্মবাদী মানদণ্ডও আছে। যদিও মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি অনুসারে মানুষ সর্বদাই নিজের সুখ বা কল্যাণ কামনা করে। তথাপি শুধুমাত্র আত্মসুখের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকলে পরের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বার্থও বিঘ্নিত হবে সে কথা বুঝেছিলেন নীতিবিদ্‌দের অনেকে। তাই অহংবাদের গণ্ডি অতিক্রম করে সকলের কল্যাণ বা মঙ্গলের জন্য সার্বিকভাবে সমাজের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে বেশ কিছু নৈতিক মতবাদ গড়ে তোলেন তারা। এই মতবাদগুলির মধ্যে যেমন কর্তব্যবাদী কিছু মতবাদ আছে তেমনি আছে কিছু উদ্দেশ্যবাদী মতবাদও। কাজের ফলের উপর গুরুত্ব না দিয়ে নৈতিক গুণাগুণ বিচার করে কর্তব্য নির্ধারণের কথা বলেছেন কর্তব্যবাদীরা। তাদের মধ্যে ইমানুয়েল কান্ট অন্যতম।

জার্মান সাহিত্য থেকে সংস্কৃতি সর্বত্রই যেমন কান্টের প্রভাব লক্ষ করা যায় তেমনি অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব থেকে নীতিতত্ত্ব দর্শনের প্রায় সব অঙ্গনেই কান্টের নিজস্ব অবদান লক্ষণীয়। কান্টের মতে নৈতিক আদর্শ অবশ্যই শর্তহীন, ব্যক্তিনিরপেক্ষ এবং সর্বজনীন হবে। শর্তহীনতা, ব্যক্তিনিরপেক্ষতা, সর্বজনীন এই সকল বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিয়ম গঠিত হবে।[১] কান্টের দর্শনে আমরা যে নৈতিকতার ধারণা পাই সেখানে মানুষকে কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করতে বলা হয়েছে। এই কর্তব্যের ধারণা থেকেই মানুষ তার সমাজের প্রতি, অন্যান্য মানুষদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে থাকে। কান্টের নৈতিক মতবাদকে অবলম্বন করে একজন মানুষ অন্যের হিতার্থে কেন কাজ করবে সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

কান্ট আমাদের নৈতিক জীবনে তিনটি মূল ভিত্তির কথা বলেছেন। কান্টের মতে মানুষের নিজের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে তাই সে যখন স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে থাকে তখন সেই কাজের পূর্ণ নৈতিক দায়িত্ব তার নিজের। কান্ট আত্মার অমরতার কথা স্বীকার করে বলেছেন নৈতিক আদর্শকে পরিপূর্ণ রূপে গড়ে তুলতে গেলে এক জীবনে তা সম্ভব নয়। জন্মান্তরের মাধ্যমেই আমরা নৈতিক আদর্শকে সত্য করে তুলতে পারি। কান্ট আরও বলেছেন ভগবানের অস্তিত্বে আস্থাবান না হলে আমরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে সুখ, আনন্দের সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি না। কান্টের বিশ্বাস নৈতিক শক্তির চূড়ান্ত জয় অনিবার্য।[২]

কান্টের মতে মানুষ বিচার-বুদ্ধিশীল জীব। তিনি মানুষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—Man is a creature who is half sensual, half rational.[৩] মানুষ একটি প্রাণী যে অংশত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসম্পন্ন এবং অংশত বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন। এই মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি মানুষের মধ্যে দুই প্রকার বৃত্তি আছে—জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি। সুখ, দুঃখ, আবেগ, অনুভূতির মধ্যে দিয়ে তার জীববৃত্তি

প্রকাশ পায়। মানুষের জীববৃত্তি বা ইন্দ্রিয়বৃত্তির কাজ মানুষকে সুখ দেওয়া। এই সুখ হল ইন্দ্রিয়জ সুখ। ইন্দ্রিয়ের স্বভাব হল বিষয়ের মধ্যে সুখের অন্বেষণ করা। তাই বিষয়ের মতো ইন্দ্রিয়সুখও পরিবর্তনশীল। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশ পায় জ্ঞান, বিচার, যুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি হল তার উচ্চতর বৃত্তি। বুদ্ধি বলতে কান্ট বুঝিয়েছেন—Man really finds in himself a faculty by which he distinguishes himself from every thing else, even form himself as affected by objects, and that is Reason.[৪] অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে এক ক্ষমতা আবিষ্কার করে যার সাহায্যে সে নিজেকে প্রত্যেক বস্তু থেকে পৃথক করতে পারে, এমন কি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত নিজের থেকেও পৃথক করতে পারে এবং এই ক্ষমতাটি বুদ্ধি। মানুষ তার বিচার শক্তির জন্যই অন্যান্য জীব থেকে পৃথক। এই বিচার শক্তির সাহায্যেই মানুষের কর্তব্য কর্ম নির্ধারিত হয়। এই বিচার শক্তিকে কান্ট আবার দুই ভাগে ভাগ করেছেন — বিশুদ্ধ বিচার শক্তি এবং ব্যবহারিক বিচার শক্তি। মানুষের বিবেক হল তার ব্যবহারিক বিচার শক্তি। বিবেক যে নৈতিক নিয়মকে আমাদের কাছে ব্যক্ত করে কান্ট তাকে বলেছে শর্তহীন অনুজ্ঞা বা আদেশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সাধারণ উক্তি এবং আদেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। তুমি করতে পার এবং তোমার করা উচিত এই দুটি বাক্য এক নয়। এদের মধ্যে প্রভেদ আছে। দ্বিতীয়টির মধ্যে একপ্রকার বাধ্যতাবোধ আছে। কান্ট যে নৈতিক নিয়মের কথা বলেছেন সেটি হল একধরনের শর্তহীন আদেশ (Categorical imperative)। শর্তাধীন (Hypothetical imperative) আদেশের ক্ষেত্রে আদেশ শর্তের উপর নির্ভরশীল। শর্তহীন আদেশ কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। কান্টের মতে শুধু কর্তব্য পালন করার জন্যই কিন্তু আমরা নৈতিক নিয়ম পালন করব। কান্ট যে নৈতিক নিয়মের কথা বলেছেন সেই নিয়মের মধ্যে নিঃশর্ত ব্যক্তিনিরপেক্ষ আবশ্যিকতার ধারণাটি নিহিত থাকে। সেই জন্য এই নিয়মটা সর্বজনীন। এই শর্তহীন নৈতিক অনুজ্ঞাকে অনুসরণ করেই একজন মানুষ অন্যের জন্য করবে। এক্ষেত্রে বিবেকের আদেশকে সে মান্যতা দিয়ে অন্যের মঙ্গল বা কল্যাণ সাধনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে।

মানুষের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সে কর্তব্যবোধ সম্পন্ন প্রাণী। কান্টের অভিমত হল মানুষের কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করা উচিত। অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। এই কর্তব্য অনুভূতি বা আবেগের উপর নির্ভর করে না। কান্টের ভাষায়—...Duty, does not rest at all on feelings, impulse, or inclinations...[৫] কিন্তু বাসনা এবং ইন্দ্রিয় প্রবণতাগুলি দেহ নির্ভর হওয়ায় প্রাণী রূপে সে এগুলি থেকে কখনই সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হতে পারে না। কান্টের ভাষায়—...being a creature ...he can never be quite free from desires, inclinations, as these rest on physical cause...[৬] অর্থাৎ সৃষ্ট হিসাবে মানুষ ইচ্ছা, প্রবণতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হতে পারে না, কেননা দৈহিকতার মধ্যেই এদের মূল নিহিত। আবার মানুষ কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর মতো ইন্দ্রিয় সর্বস্ব নয়। মানুষের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আর একটি বৃত্তি আছে, সেটি হল বুদ্ধিবৃত্তি। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না। কান্ট মনে করেছেন এই বুদ্ধিবৃত্তির জন্যই মানুষ অন্যান্য পশু থেকে উচ্চ আসনে আসীন। তাই এই বুদ্ধির কাজ শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন নয়। এই বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত একটি কাজ হল সঙ্কল্প গঠন করা যা নিজে নিজেই সৎ। কান্টের মতে নৈতিক জীবনে বিচার বুদ্ধির স্থান অপরিসীম। একমাত্র বিচার বুদ্ধি বা ব্যবহারিক বুদ্ধি আমাদের কর্তব্য নির্ণয় করে দিতে পারে অর্থাৎ

মানুষের নৈতিক জীবন একমাত্র বিচারশক্তি বা ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। অনুভূতিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে বিশুদ্ধ চিন্তার অনুশীলন করা মানুষের কর্তব্য।[৭] নৈতিক নিয়ম হল শর্তহীন আদেশ। বিনা শর্তে কেবল মাত্র কর্তব্যবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই মানুষকে নৈতিক কাজ করতে হবে। কান্ট কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করতে বলেছেন। তাই এখানে বিবেকের মধ্যে কোন প্রকার কামনা বা প্রেরণা বা অনুশোচনা থাকাটা সমীচীন নয়। কান্ট কর্তব্যের ক্ষেত্রে বিবেকের মধ্যে অনুভূতিকে কোন গুরুত্ব দিতে চাননি। তিনি বলেছেন আমরা যেমন বিনা প্রচেষ্টায় আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি, তেমনি বিনা প্রচেষ্টাতেই কাজের সৎ বা অসৎ গুণ বিচার করতে পারি।[৮] কান্টের কাছে কর্তব্যবোধ হল বাধ্যতাবোধ। কান্ট কর্তব্যের মহত্তম আদর্শের কথা বলেছেন। ব্রাডলি তার My *station and its duty* গ্রন্থে বলেছেন আমার সামাজিক অবস্থা আমার কর্তব্যের নির্ণায়ক।[৯] শাসনের ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে যে কাজ করা হয় সেই কাজকে নৈতিক কাজ বলা যায় না। কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করতে হবে। কান্টের বক্তব্য হল নৈতিক আদেশের জন্যই মানুষকে অন্যের জন্য করতে হবে। নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে কোন বিকল্প বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। এই কর্তব্যবোধ অন্তরের জিনিস। কর্তব্যের প্রেরণা ভেতর থেকে আসে। কান্ট নৈতিক কাজের ক্ষেত্রে বিবেকের দায়বদ্ধতার কথা বা বিবেকের অনুশাসনের কথা বলেছেন। এই বিবেক হল স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান, এটি হল ঐশ্বরিক অবদান।[১০] মানুষের জীবনে এক চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্তমান — একদিকে আছে বিবেকের আকর্ষণ আর অন্যদিকে আছে কামনার প্রলোভন। কামনার যখন জয় হয় তখন সে মুক্ত হয়ে উচ্চ জীবনের সন্ধান করে।[১১] কৃচ্ছতাবাদ হল একধরনের জীবন দর্শন যেখানে নৈতিক জীবনের আদর্শ হিসাবে আত্ম অবদমনের কথা বলা হয়। এই মতবাদের মুখ্য বক্তব্য হল প্রবৃত্তিপ্রেরিত হয়ে কাজ করলে হবে না। আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কাজ করলে সেই কাজ ন্যায্য কাজ।

কান্টের মতে সৎ ইচ্ছাবশত কাজ করলে সেই কর্ম নৈতিক কর্ম বলে বিবেচিত হয়। এমন অনেক কাজ আছে যেগুলোকে আমরা ভালো বলে মনে করি কিন্তু সেইগুলো ভালো নাও হতে পারে। তিনি বলেন ভালো প্রধানত দুই প্রকার — কিছু ভালো শর্ত সাপেক্ষ ভালো আর কিছু ভালো হল নিঃশর্ত ভালো। সৎ ইচ্ছাকে কান্ট নিঃশর্ত ভালো বলেছেন। সৎ ইচ্ছা বলতে মানুষের বৌদ্ধিক ইচ্ছাকে বুঝিয়েছেন। এই বৌদ্ধিক ইচ্ছা নৈতিক ভালোত্বকে নিরূপণ করে। এই সৎ ইচ্ছা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ফসল। কান্টের মতে বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত কাজ হল একটি সঙ্কল্প গঠন করা। এই সঙ্কল্প হল সৎ সঙ্কল্প। কান্টের ভাষায়— "...its true destination must to be produce a will not merely good as means to something else. But good in itself... ।"[১২] অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি এমন সঙ্কল্প গঠন করে যা নিজে সৎ কিন্তু কোন কিছুর উপায় রূপে যা সৎ নয়।

কান্ট তার নীতি তত্ত্বে কোনরূপ উদ্দেশ্যবাদকে সমর্থন করেননি। তার নৈতিক মতবাদ হল কর্তব্য ভিত্তিক। কান্ট মনে করেন কোনরূপ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে কেবল কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করতে হবে। কর্তব্যের জন্য কর্তব্যই হল সৎ ইচ্ছা। এই সৎ ইচ্ছা কোন লক্ষ্য বা লক্ষ্যের অধীন নয়। সৎ ইচ্ছা হল সক্রিয় নৈতিক নির্দেশ। এই নৈতিক নির্দেশ অনুসারে নৈতিক কাজ করা হয়। সৎ ইচ্ছার সাথে কর্তব্যের একটা সম্পর্ক আছে। সৎ ইচ্ছা প্রসূত আচরণই হল নৈতিক কর্তব্য। কান্টের মতে

বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাবৃত্তি নামে মানুষের মনে দুটি বৃত্তি আছে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রকৃতি এগুলো আমাদের দান করেছে। কেবলমাত্র কামনায় পরিতৃপ্ত বুদ্ধির কাজ হতে পারে না। কেননা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এই কাজের জন্য যথেষ্ট সক্ষম। তাই বুদ্ধিবৃত্তির কাজ হল মানুষের কর্তব্য কর্মের সাথে। কান্টের ভাষায় — বুদ্ধিবৃত্তি হল সেই পরম অবস্থা গঠনকারী ক্ষমতা যার কাছে মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থসমূহ অত্যন্ত তুচ্ছরূপে গণ্য হয়। কান্টের মতে এই চরম অবস্থা মানুষের জীবনের মহত্তর লক্ষ্য।

বিবেকবান ব্যক্তি তার কর্তব্যের নির্দেশ মেনে চলে স্বেচ্ছায়। কান্টের মতে একমাত্র কর্তব্য—এর জন্যই আমরা কোন কাজ করব। যে ইচ্ছা কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আমাদের কর্তব্যবোধে উৎসাহিত করে তাই হল সৎ ইচ্ছা। আর এক্ষেত্রে আমার ইচ্ছাকে পরিচালিত করতে হবে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী। কান্ট মনে করেছেন যে ইচ্ছাটা আমাদের কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই আমাদের কোন কিছু করতে প্রেরণা যোগায় তাই হল সদিচ্ছা। এই সৎ ইচ্ছাই হল একমাত্র কল্যাণকর। এই সৎ ইচ্ছাই নৈতিক নিয়মগুলিকে নিজের উপর প্রয়োগ করে। এখানে কান্ট ইচ্ছার স্বাধীনতার ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন মানুষের ইচ্ছা যখন বিচার বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই ইচ্ছা হল স্বাধীন। অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা না ভেবে কেবল মাত্র কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করা হল স্বাধীন ইচ্ছার ধর্ম। অন্যদিকে আবেগের বশে কামনা বাসনার দ্বারা চালিত হয়ে সুখ দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির দ্বারা অভিভূত হয়ে যখন কোন কাজ করা হয় তখন সেই ইচ্ছা হল পরাধীন। সৎ ইচ্ছা সবসময় স্বাধীন। ইচ্ছা তখনই সৎ হয় যখন বিচার বুদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী ইচ্ছা করা হয়। মানুষ যখন বিচার ও বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করে তখন সে প্রকৃত মানুষ। অনুভূতির বশীভূত হয়ে যখন সে কাজ করে তখন সে পশুতুল্য।[১৩] তাই অনুভূতির বশীভূত না হয়ে বিচার বিবেচনা করে সবসময় কাজ করতে হবে। বিচার বিবেচনার সাহায্যেই মানুষ অন্যের জন্য কিছু করার কথা ভেবে থাকে এবং সেই ভাবনার বশীভূত হয়েই একজন মানুষ অন্যের মঙ্গল বা কল্যাণ সাধনার কথা ভেবে থাকে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সরকার, প্রহ্লাদ কুমার, (সম্পা.), কান্টের দর্শন, দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, বালি, হাওড়া, ১৯৯৭, পৃ.১৩৭

২। নন্দী, সুধীর চন্দ্র, নীতিবিদ্যা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ.-১৬৪

৩। The Encyclopidia of philosophy, reprint edition, 1972, vol-4, p-317

৪। Abott T.K, Kants critique of practical reason and other works on the theory of ethics, Longmans Gteen and co, Bombay, 1898 p-71

৫। Ibid, p-52

৬। Ibid, p-166

৭। মুন্সি, রমেশ চন্দ্র, নীতি বিজ্ঞান, বৈকুণ্ঠ বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮০ পৃ-৯৫

৮। মজুমদার, ইন্দ্রভূষণ, নীতিবিজ্ঞান, সাউথ ক্যালকাটা এডুকেশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃঃ ১০৬

৯। নন্দী, সুধীর চন্দ্র, নীতিবিদ্যা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ১৭৫

১০। মজুমদার, ইন্দ্রভূষণ, নীতিবিজ্ঞান, সাউথ ক্যালকাটা এডুকেশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৬৪ পৃঃ১০৭

১১। তদেব, পৃ-৭৮

১২। Abott T.K., kants critique of practical reason and other works on the theory of ethics, Longmans Gteen and co, Bombay, 1898, p-12

১৩। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু মুখোপাধ্যায়, মতিলাল, নীতিবিজ্ঞান, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ-১৬৩

গল্প

সম্মান-অসম্মান

শুভঙ্কর ঘোড়ুই

স্নাতকোত্তর বাংলা, প্রথমবর্ষ

(১)

বাস থেকে নামবার সময়েই হারান খুড়োর সঙ্গে বোকার চোখাচোখি হয়ে গেলো। 'কি হে বোকা, বলি খবরখানা কি?'—প্রশ্নটা হারান খুড়োই করল।

'এই আজই পড়াশুনো শেষ করে গ্রামে ফিরে এলাম।'

'তাহলে শহরের কাজ শেষ?'

'হ্যাঁ। আপাতত আর পড়াশুনোর জন্য শহরে না গেলেও চলবে।'

বাসস্ট্যান্ড থেকে বোকাদের বাড়ি চার মিনিটের হাঁটা পথ। মরামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক প্রতিবেশিদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তাই চার মিনিটের পথ অতিক্রম করতে তার সময় লেগে গেলো প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট।

চিঠি মারফত আগেই সে আসবার কথা জানিয়ে দিয়েছিল।

বোকা বাড়িতে ঢুকে হাতের ভারি জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে রেখে ঘাম মুছতে থাকে। বড্ড বেশি গরম পড়েছে।

বোকার মা ছেলের জন্য পছন্দের খাবার রান্না করছিল। বোকাকে দেখে তিনি রান্না ঘর থেকে ছুটে এসে এক গ্লাস জল হাতে দিয়ে বললেন, 'গরমে চোখ মুখ একদম লাল হয়ে গেছে। রাস্তায় আসতে তোর কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

বোকা জলের খালি গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বলে, 'না'।

'বোকা, তুই আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছিস। খাওয়া-দাওয়া করিস না নাকি?'

'করি', তারপর একটু থেমে কি জেনো একটা চিন্তা করে সে বলে, 'মা, তোমাকে একটা কথা বলবো?'

'কথা বলার জন্য আবার অনুমতি নিতে হবে নাকি? তুই তো এরকম ছিলিস না—কি বলবি তাড়াতাড়ি বল।'

বোকা ধীরে-সুস্থে বলে, 'মা, তোমরা আমাকে আর 'বোকা' বলে ডেকো না। হাজার হোক আমি শহর থেকে এমএ ডিগ্রি নিয়ে এসেছি। তাই আমাকে আজ থেকে বিকাশ বলেই ডেকো—আজ আমি দেখলাম পাড়ার সবাই আমাকে বোকা বলেই ডাকছে, ওদেরও আমি কাল বারণ করে দেবো।'

ছেলের মুখে এই কথা শুনে বোকার মা বলে, "কোথা থেকে লাটসাহেব এলেন রে। উনি শহর থেকে পড়াশুনো করে ফিরেছেন বলে ওনাকে 'বিকাশবাবু' বলে ডাকতে হবে—সেটি চলবে না। তুই আমার কাছে আজও সেই ছোটোটিই আছিস।"—এই বলে তিনি পুনরায় রান্নাঘরে চলে গেলেন।

বোকা আর কোনো কথা বলল না। পোশাক পরিবর্তন করে সে এসে দাঁড়ালো আলমারির বড়ো আয়নাটার সামনে।

পরদিন বোকার সঙ্গে যার যার দেখা হলো, সে সবাইকে আলাদা আলাদা করে বলে দেয়, তাকে যেনো সবাই বোকা না বলে বিকাশ বলে ডাকে। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

এমন কর্মটি করতে গিয়ে সে সবার কাছে আরও হাসির পাত্র হয়ে উঠলো। আর তাকে খ্যাপাবার জন্য আরও বেশি করে 'বোকা', 'বোকাদা', 'বোকাভাইপো' ছাড়াও 'লাটসাহেব', 'ফুলবাবু' ইত্যাদি সম্বোধনগুলোও বাড়তিভাবে তার কপালে এসে জুটে গেলো।

২

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বোকা ভাবতে লাগলো, এর কি প্রতিকার করা যায়। চট করে তার মাথায় একটা প্ল্যান চলে এলো। সে ঠিক করলো আগামীকাল থেকে তার পাণ্ডিত্য সকলের কাছে উজার করে দেখাবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বোকা দেখলো তার খাটিয়ার মাথার দিকে একটা ঝাঁটা রাখা আছে। তার মা সেই সময় তাকে চা দিতে এসেছিল। বোকা চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে বলল, 'মাতৃদেবী, আমার পালঙ্কের শিয়রে সম্মার্জনীটি রাখিয়াছো কেনো, তাহা কি জানিতে পারি? ইহা যে অত্যন্ত অমঙ্গলের সূচকবাহী।'

ছেলের মুখে এই উদ্ভট, কিম্ভূত কথাগুলো শুনে তার মার প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা। তিনি বললেন, 'ও বোকা, তুই আবার এ সমস্ত কথাবার্তা কোথা থেকে শিখিছিস? এর মানে কি? তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেলো না তো?'

বোকা নিশ্চিন্তে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'না মাতা। আমার কিছুই হয় নাই। আমি এতদিন যাবৎ শহরে থাকিয়া যে উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছি, ইহা যে তাহারই ফসল। এখন নিশ্চই বুঝিতে পারিতেছ, আমার জ্ঞানের পরিধি কত বৃহৎ। অতএব, আমার সহিত এরপর কোনো কথা বলিলে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে কথা বলিবে।'

ছেলের মুখে এই কথা গুলোর অর্ধেক অর্থ বুঝতে পেরে এবং না পেরে তার মা কপালে হাত দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়লো।

ঐ দিন সকালে বোকার সঙ্গে তার নিবারণ কাকার দেখা হয়ে গেলো। নিবারণ কাকা তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে বোকা, এখন কি করবি ভাবছিস?' বোকা একটুও রাগ দেখালো না। সে সহজ ভাবেই উত্তর দেয়, 'এখনও কি করিব ভাবি নাই, তবে কিছু একটা করিব ইহা নিশ্চিত—আর খুল্লতাত, আপনার মস্তকের কেশগুলি যে সব পাকিয়া গেলো। আপনি বৃদ্ধ হইয়া যাইতেছেন—আর আমার কথাবার্তা শুনিয়া নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন আমি কি রূপ সম্মানীয় ব্যক্তি। অতঃপর, আমার সহিত কোনো কথা বলিলে সম্মানের সহিত বলিবেন।'

বোকার মুখে এই রকম কথা শুনে নিবারণের চোখ গোল গোল হয়ে গেলো। সে বললো, আমি না হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তুই শহর থেকে আসার পর যে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছিস তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।' কথাটা বলেই নিবারণ হনহন করে নিজের কাজে চলে গেলো।

ইতিমধ্যে এই খবরটা গোটা গ্রাম রাষ্ট্র হয়ে গেলো। আর তার ফলে বোকার লজ্জায়, অপমানে গ্রামের আর কারোর কাছে মুখ দেখাবার অবকাশটুকুও রইলো না।

বোকার এই কীর্তির কথা ক্রমে ক্রমেই তার মায়ের কানেও পৌঁছেছিল। শুধু তাই নয়, বোকার এই মূর্খামির জন্য তার মাকেও ভালো মন্দ অনেক কিছু পাড়া প্রতিবেশিদের কাছ থেকে শুনতে হয়েছে। তাই তিনিও বোকার উপর প্রচন্ড রেগে গেলেন, 'ঢের হয়েছে। আপনার আর গ্রামে থেকে কোনো কাজ নেই। বাবু সম্মান পাবার জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। আপনি রুজি-রোজগারের জন্য বরং আবার শহরেই ফিরে যান। সেখান থেকেই আপনি টাকা পাঠাবেন। গ্রামে আর লোক হাসাতে আসবেন না।'

লজ্জায় ও অপমানে, দুঃখে ও কষ্টে বোকা পুনরায় ফিরে গেলো শহরে—কাজের খোঁজে।

৩

বোকা শহরে গিয়ে একটা বেসরকারি কোম্পানিতে কাজের জন্য ইন্টারভিউ দিতে গেলো—

'আপনার নাম কি?'

'বোকা! থুড়ি, বিকাশ মজুমদার।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডীপুর গ্রামে।'

'ও, গ্রামে বাড়ি। তা অবশ্য দেখেই বোঝা যাচ্ছে।—তা পড়াশুনো কতদূর?'

'এমএ পাশ।'

'এমএ পাশ' কথাটা ইন্টারভিউ কর্তা বিড়বিড় করে দু'বার উচ্চারণ করলো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিল বোকাকে। তারপর বললো, আপনি এতদূর পড়াশুনো করে শেষ পর্যন্ত টাইপিং আর ফাইল বইবার কাজ করতে আসছেন—এতে আপনার সম্মানে লাগবে না?

বোকা মনে মনে চিন্তা করে, "গ্রামে এর আগে তার সঙ্গে কেউ 'আপনি' বলে কথা বলেনি। মা যদিওবা একবার 'আপনি' বলেছিল—তাও আবার তার উপর রাগ করে—হোক না ছোটো কাজ, এখানে তবুও তো আত্মসম্মানের সঙ্গে কাজ করতে পারবে।"—এই ভেবে সে বললো, 'না। ছোটো কাজে আমার কোনো অসুবিধা নেই।'

'ঠিক আছে। আপনি গতকাল থেকেই কাজে লেগে যান। মাইনে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা পাবেন। এখন মাসের আধাআধি। তাই এই মাসে অর্ধেক মাইনেই পাবেন...চলবে?'

'দৌড়োবে।'

বোকা কাজে লেগে গেলো। তবে স্বল্প চেষ্টাতেই বোকার ভাগ্যে যে কাজটি জুটেছিলো, তাতে সে মোটেই দক্ষ নয়। কম্পিউটার সে আগে কলেজে দেখেছে, কিন্তু এর আগে সে এই যন্ত্রটির সামনে কোনোদিনই বসেনি, আর টাইপিংয়ের কাজ তো তার কাছে দূরস্থ। আবার একদিন শিবনাথ বাবুর টেবিলে কিছু ফাইল রাখতে গিয়ে জলভর্তি কাচের গ্লাসটা তার কনুইয়ে লেগে মেঝেতে পড়ে চুরমারা হয়ে যায়। এরজন্য 'গাঁইয়া', 'গেঁয়োভূত', 'অকম্মার ঢেঁকি', 'হাঁদারাম'—ইত্যাদি হরেক রকম নতুন নতুন বিশেষণ তার ভাগ্যে জুটেছিল।

প্রথম প্রথম তাকে সবাই 'বিকাশ' বলেই ডাকত, কিন্তু তার কাজে বিস্তর গলদের জন্য কখন সে যে কবে বিকাশ থেকে পরবর্তী বিশেষণগুলির দ্বারা চিহ্নিত হয়ে গেছে তা বুঝতেই পারেনি।

যখন তার হুঁশ হলো তখন সে ভাবলো পুনরায় গ্রামে ফিরে যাওয়াই ভালো, কিন্তু শহরে আসবার সময় শহরে তার মায়ের কথাগুলো বারবার মনে পড়তে লাগলো। তবুও সে ভাবলো, ঘরের লোকের চেয়ে বাইরের লোকের কাছে অপমানিত হওয়া আরোও বেশি অপমানজনক।

অগত্যা সে সবদিক ভেবে শেষ পর্যন্ত গ্রামে ফিরে যাওয়াই স্থির করে ফেললো।

৪

হাজার হোক মায়ের মন। তাই বোকাকে দেখে তার মা প্রথমেই বলে উঠলেন, 'বাবা তুই এসেছিস। শহরে মন টিকছিলো না বুঝি, আমাদের জন্য মন কেমন করছিল?' বোকা কি বলবে ভেবে পেলো না। কিছুক্ষণ পর ধরা গলায় বললো, 'হ্যাঁ মা। তাই ফিরে এলাম।' তার মা বললো, 'তা ভালোই করেছিস।'

মধুর সম্ভাষণে কথাবার্তা শুরু হলেও তা আর বেশিক্ষণ মধুর থাকলো না।

বাড়িতে অর্থাভাব। বোকার বাবার পক্ষে আর বাইরে বাইরে কাজ করে উপার্জন করা প্রায় সম্ভবই হচ্ছে না। তাই যোগ্য ছেলে হয়ে তাকেই কিছু একটা করতে হবে।

গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুল আছে। বোকা ভাবলো সেখানে যদি আংশিক সময়ের জন্যও শিক্ষকতার কাজ করা যায় তাতে অন্তত কিছু উপার্জন হতে পারে।

পরদিন বোকা স্কুলের হেডমাস্টার মাধব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বললো।

সচরাচর, বিশেষত গ্রামে এমএ পাশ ছেলে দেখা যায় না। তাও আবার সে যখন নিজে থেকে এসেই পড়াতে চাইছে তখন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না ভেবে বোকাকে তিনি আংশিক সময়ের জন্য বাংলা শিক্ষকের পদে নিয়োগ করে দিলেন। তাতে বোকা মাইনে যা পাবে সেই টাকাতে অন্তত নিজের হাতখরচা বাদ দিয়ে গ্রামে একটা ছোটো সংসার অনায়াসেই চলে যাবে।

কিছুদিন পর বোকাকে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হিসেবে দেখা গেলো। এতে অবশ্য বোকার কিছুটা পদোন্নতি হয়েছে। সে 'বোকাদা', 'বোকাভাইপো' ছাড়াও 'বোকা মাস্টার' হতে পেরেছে। এমনকি ছাত্র ও শিক্ষকরাও তাকে আড়ালে ঐ নামেই ডাকে। বোকা একবার বলেছিল, 'আমি তো এই স্কুলের একজন শিক্ষক, অন্তত সেই সূত্রে আমাকে আমার প্রাপ্য সম্মানটুকু দাও।' বিশেষ করে ছাত্ররা তো তার কথা শোনেইনি, বরং তাকে নিয়ে আরোও বেশি হাসি-মসকরা করেছে।

৫

বোকা আজ স্কুলে ছাত্রদের কাজ দিয়ে চোখ বুজিয়ে এই সমস্ত কথাগুলোই ভাবছিল। সত্যিই তার কোনো পরিবর্তন হলো না। হাজার চেষ্টা করে এখন সে ক্লান্ত। বরং একটা সহজ উপায় আছে, নিজেকে কি পরিবর্তন করে নেওয়া যায় না?

হঠাৎ একজন ছাত্র এসে বললো, 'স্যার, কাজ হয়ে গেছে'—এই বলে সে নিজের খাতাটা বোকার টেবিলের উপর রাখলো। বোকা নেতানো শরীরটাকে কোনো রকমে চেয়ার থেকে তুলে চোখ দুটি রাখলো ছাত্রটির খাতায়। আজ তার মন ভালো নেই। শেষ পর্যন্ত সে নিজের পকেট থেকে কলমটি তুলে নিয়ে ছাত্রটির খাতাটি ভালোভাবে দেখে তার নীচে স্বাক্ষর করে দেয়। স্বাক্ষরটি কতকটা এইরকম—'বোকা মজুমদার', তার তলায় আজকের তারিখ—২৭/বৈশাখ/১৪২৩।

ছাত্রটি 'বিকাশ বাবু'-র দিকে তাকিয়ে দেখলো স্যারের শরীরটা পরাজিত সৈনিকের মতো আবার চেয়ারে নেতিয়ে পড়েছে। ডান হাতের কনুইটা ভাঁজ করে কপালের উপর রাখা। বাঁ-হাতটি কোলের উপর। আধবোজা দুই চোখ দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা।

আজ 'বিকাশবাবুর' এই অবস্থা দেখে ছাত্রটিরও খুব কষ্ট হলো।

"টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধা-বিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে পারে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

'বর্ণপরিচয়'

সুরজিৎ দাস
স্নাতকোত্তর বাংলা, প্রথমবর্ষ

'কে রে? কী করছিস?' বাড়ির ভিতর থেকে আওয়াজ এলো।

'আমি।'

'আমিটা কে?' বলতে বলতে বেঁটেখাটো, মোটাসোটা গোছের এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এল। তাকে অনেকটা জালার মতোন দেখতে। নাকের কাছে মাছিগোঁফ, আর মাথায় ফুটবল খেলার গ্রাউণ্ডের মতো বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে টাক। গম্ভীর গলায় অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বললো—'কী করছিস এখানে?'

নীল সাদা চেককাটা ময়লা জামা আর একটি হাফ-প্যান্ট পরা বছর আটেকের ছেলে অর্ণব। তার হাতে একটা মাঝারি গোছের বস্তা। অর্ণব বলল—'এই তো প্ল্যাস্টিক কুড়ুচ্ছি।'

'প্ল্যাস্টিক কুড়ুচ্ছি!' দাঁত খিঁচিয়ে উঠল বেঁটে লোকটা 'যা যা এখান থেকে চলে যা। এরা সব বেটা এক-একটা চোর, প্ল্যাস্টিকের নাম করে যা পারে তাই বস্তায় ঢুকুবে।'

'না কাকু তা নয়।'

'তা নয়, বললেই হলো। দেখা দেখি বস্তার ভিতর কী আছে।'

অর্ণব বস্তার মুখটা খুলে ধরে। সেখানে কিছু পলিথিনের ব্যাগ ও কিছু প্ল্যাস্টিকের গ্লাস দেখা যাচ্ছে, তাছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণ ভেবে মাথা খাটিয়ে বললো, 'এতো উপরে প্ল্যাস্টিক ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তুই বস্তার ভিতর লুকিয়ে নিশ্চয়ই কিছু রেখেছিস। কী ভেবেছিস, আমি কিছুই বুঝি না?'

অর্ণব বললো—'না, কাকু, আমি চুরি করিনি, আমি এগুলো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করি।'

'পয়সা রোজগার করি, 'এতে কত টাকা হয় রে?' কৌতূহল ঝরে পড়ে গলায়। 'বস্তার ভিতর যে চোরাই জিনিসপত্রগুলো আছে তাই বিক্রি করিস, ওতেই তোদের চলে। বেটা একটা চোর।'

'না...না কাকু', বলে অর্ণব রাগে সব জিনিসপত্র ঢালতে যায়।

'আরে আরে করিস কী, করিস কী? যতসব ময়লা কাগজ কুড়িয়ে এনে জায়গাটাকে নোংরা করবি নাকি। যা-যা এখান থেকে, মানে মানে কেটে পড় দেখি।' এই বলে ভদ্রলোকটি চলে যায়।

অর্ণব মাথা নিচু করে বস্তা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গলির রাস্তা ছেড়ে মেন রাস্তায় ওঠে। রাস্তার ধারে বড়ো বড়ো বাড়ি। কোনো কোনো বাড়ি থেকে বই পড়ার শব্দ আসছে—

"রাখাল গরুর পাল নিয়ে যায় মাঠে।।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।"

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে অর্ণব। তারপর আবার কাগজ কুড়নোর কাজে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। রাস্তার ধারে একটা ডাস্টবিনের পাশে কিছু কাগজ পড়ে থাকতে দেখে সে। কুড়োতে গিয়ে দেখতে

পায় একটা বই। মুখ থেকে আশ্চর্যরকম ভাবে বেরিয়ে এল 'বই'। কয়েকটা পাতা উল্টোতেই অর্ণবের চোখে পড়ল কীসব আঁকা, আর কী সব হিজিবিজি লেখা। সবই অস্পষ্ট।

অর্ণব কোনো দিনই বই পড়েনি। পাঠশালার দরজায় সে পৌঁছাতে পারেনি। তার মনে পড়ে দু-একবার বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছিল, 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে। 'আ'-এ আমটি খাব পেড়ে।' এসবই তার কাছে এখন অতীত, অস্পষ্ট। বাবা মারা যাবার পর আর হয়ে ওঠেনি, গালের উপর গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা জল।

হঠাৎই কাঁধে বস্তা আর হাতে বইটা নিয়ে ছুটতে থাকে অর্ণব বাড়ির দিকে। ছুটতে ছুটতে তিরপল দিয়ে ছাওয়া জায়গায় এসে চিৎকার করে, 'মা, ও-মা বাড়িতে আছো।'

'কিরে, এত ডাকছিস কেন?' বাইরে বেরিয়ে এসে মা জিজ্ঞাসা করে, 'কী হয়েছে?'

অর্ণব হাঁফাতে থাকে। মায়ের হাতে বইটা দিয়ে বললো, 'মা দেখতো, এটা কীসের বই?' সুপর্ণা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে বললো, 'বাবা, আমি তো পড়াশোনা কোনোদিন শিখিনি। আর বুঝতেও পারছি না।' বইটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে ছেলের হাতে ফিরিয়ে দেয়। কাঁপা কাঁপা হাতে অর্ণব বইটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর হঠাৎই সে বস্তা রেখে আবার ছুটতে থাকে।

সুপর্ণা পিছন থেকে ডাকে, 'এই শোন, কোথায় যাচ্ছিস।' মায়ের কথা অর্ণবের কানে পৌঁছায় না।

পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে মোটরগাড়ি, অর্ণব যেন তাদের থেকেও জোরে ছুটতে থাকে। যত এগোয় ততই ভিড় বাড়ে। অর্ণব একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বললো, 'দাদু, দেখতো এটা কীসের বই।'

'এটা তো বর্ণপরিচয়!'—বইটার মলাট দেখে বললো।

'তুমি এটা পড়তে পারবে?'

'কেন রে, আমার পড়ার সঙ্গে তোর সম্পর্ক কী?'

'না দাদু, আমাকে একটু পড়িয়ে দেবে?'

'ওঃ, আমার দোকানের খদ্দের কে সামলাবে। তোর বাবা কী আমায় তোর মাস্টার রেখেছে?'

'দাও না দাদু, একটু পড়িয়ে দাও না।'

'যা বলছি—যা। যেটা করলে হবে করগে যা। কাগজ কুডুলে খেতে পাবি। পড়াশোনা করে কিছু হবে না। ও সব বড়োলোকের জন্য বুঝলি?'

দোকানে কোনো কোনো লোক হাসতে থাকে। 'যা বলেছেন, এখন যা দিনকাল পড়েছে—'

অর্ণব চলে আসে। আজ তার যেন কোনো কিছুতেই মন নেই। সে আপন মনে হাঁটতে থাকে। তখন বেলা এগারোটা। রোদে খাঁ-খাঁ করছে। ক্লান্ত অর্ণব বসে পড়ে এক বটগাছের তলায়। কতক্ষণ কেটে গেছে সে জানে না। সে তার সর্বশক্তি দিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত—'না হল না!'

তখন রোদ কমে এসেছে। বাড়ি ফিরতেই সুপর্ণা বললো, 'কীরে সেই বেরিয়ে গেলি, আর ফিরলি না, কাগজও কুড়ুতে গেলি না। চলবে কী করে?'

অর্ণব কোনো কথা না বলে ভাঙা তক্তাপোশের উপর বসে পড়ে; অনেকক্ষণ পরে বললো 'কাল যাব, মা। আজ ভালো লাগছিল না, তাই আর যাইনি।'

'ঠিক আছে।' বলে সুপর্ণা চলে গেল।

পরের দিন সকাল হতে না হতেই অর্ণব বেরিয়ে পড়ল কাগজ কুড়োতে। আজ তার সঙ্গে শুধু বস্তা নয়, বইটাও রয়েছে। জামার ভিতরে তা লুকানো।

আজ সকাল থেকে সে কাগজ কুড়িয়ে প্রায় এক বস্তা করে ফেলেছে। তখন বেলা দশটা বাজছে। এমন সময় সামনের স্কুলের ঘন্টা বেজে উঠল। দাস পাড়া প্রাইমারি স্কুল। ভিতর থেকে গলার শব্দ আসছে। স্কুলের চারপাশটা ঘুরতে ঘুরতে একটা নিচু জানালা অর্ণবের চোখে পড়ল। সেখানে যেতেই দেখতে পেল বেশ কয়েকজন তারই সমবয়সি ছেলে বসে বসে পড়ছে, কেউবা হাসছে, কেউ মজা করছে।

তা দেখে অর্ণবের মুখও হাসিতে ভরে গেল। সে হাত নাড়িয়ে একজনকে ডাকল। ছেলেটি এগিয়ে এসে বললো—'কী হয়েছে, ডাকছ কেন?'

ছেলেদের মধ্যে কেউ একজন বলে উঠল, 'এই কৃষ্ণ, ওর কাছে যাস্ না। ও রাস্তার ছেলে।'

কৃষ্ণ দূরে দাঁড়িয়ে বলল—'কী হয়েছে?' অর্ণব কাঁপা কাঁপা হাতে বইটা জামার ভিতর থেকে বের করে বললো, 'এটা একটু পড়িয়ে দেবে?' কাছে এসে কৃষ্ণ দেখে বললো, 'এটা এখনও তুমি পড়তে পার না? আমাদের তো পড়া হয়ে গেছে।'

অর্ণবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে বললো, 'না; আমাকে একটু পড়িয়ে দেবে।'

আবার কেউ একজন বললো, 'কৃষ্ণ, তুই বললে কথা শুনিস না তো। আমার মা বলেছে এখন প্রচুর ছেলে ধরা বেরিয়েছে, কেউ ডাকলে, যেতে আমার মা নিষেধ করেছে। যাস্ না। ও-নিশ্চয় ছেলেধরার চর। বন্ধু করে আমাদের নিয়ে যাবে ওদের ডেরায়। যাস না কৃষ্ণ।'

কৃষ্ণ আর এগুতে পারল না। ফিরে গেল নিজের জায়গায়। একজন জানলা বন্ধ করে দেয়। ভিতর থেকে পড়ার শব্দ ভেসে আসে। অর্ণব কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে আসে।

'কী হল রে, অর্ণব আজ চুপচাপ যে।'

'না মা। কিছু নয়।'

'হ্যাঁ রে আজও এত কম প্ল্যাস্টিক কেন?'

'এই করে কদিন চলবে। আমিও আজ বেরুতে পারিনি।'

'ঠিক আছে মা, কাল আরো দূরে গিয়ে নিয়ে আসব।'

অর্ণব ঘরে একা বসে। বারবার পড়তে চেষ্টা করে, পারে না। একসময় ঘুমিয়ে যায়। যখন সে উঠল তখন আবার নতুন সূর্য উঠেছে। পাখিরা ডেকে উঠেছে। অর্ণবও আবার চলেছে বস্তা ও বই নিয়ে। কীসের নেশায় দশটার ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে এসে হাজির হয় 'দাস পাড়া প্রাইমারি স্কুলে।'

আজও ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে। অর্ণব দাঁড়াতেই কৃষ্ণ বলে ছেলেটি যেন আর একটু কাছে আসে। অন্যরা ততক্ষণ চ্যাঁচামেচি করতে ব্যস্ত।

'কী হয়েছে, আবার আজকে কী দরকার?'

'এইটা একটু পড়িয়ে দেবে?' অর্ণব বইটা দেখায়।

'ঠিক আছে দেব? কিন্তু তোমার নাম কী? থাকো কোথায়?'

'আমার নাম অর্ণব। আমি ঐ সামনের বস্তিতেই থাকি।'

আমাকে একটু পড়িয়ে দেবে তো?'

'হ্যাঁ দেব, ছুটির পর তুমি দেখা কর—আমি তোমায় পড়িয়ে দেব।'

এমন সময় অর্ণবের কাঁধে কে যেন চেপে ধরল। সে তাকিয়ে দেখল সাদা জামা-প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক। অর্ণব পালাবার চেষ্টা করল কিন্তু ছেলেরা ধরে ফেলল। সকালে হৈ-হৈ করে উঠল। ভদ্রলোক বললেন—'ওকে তোরা সকলে মিলে রুমে নিয়ে আয়। তারপর ওকে শাস্তি দেওয়া যাবে।'

সকলে মিলে ধরে নিয়ে এল। অর্ণব বলতে লাগল, 'আমাকে ছেড়ে দাও? আমি কিছু করিনি। আমি শুধু পড়তে চেয়েছিলাম।'

ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন বললো—'পড়তে চেয়েছিলাম, পড়তে চল এবার মাস্টার মশায়ের কাছে বেতের মার খা...'

কৃষ্ণ তখন ভয় পেয়ে গেল, ছুটে গেল সেকেণ্ড মাস্টারের কাছে। 'মাস্টার মশাই আমি সত্যি বলছি। ও শুধু আমার কাছে বর্ণপরিচয় পড়তে চেয়েছিল।'

সেকেণ্ড মাস্টার গম্ভীর স্বরে বললে, 'ক্লাসে যাও আমরা দেখছি।'

ক্লাসের ছেলেরা হৈ-হৈ করতে করতে অর্ণবকে ধরে নিয়ে আসে।

ফার্স্ট মাস্টার গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এই তোমার নাম কী?'

'অর্ণব'।

'বাড়ি কোথায়?'

'ওই বস্তিতে।'

'এখানে কী করছিলে?'

'আমি কাগজ, প্ল্যাস্টিক কুড়িয়ে বিক্রি করি। এই বইটা কুড়িয়ে পাই। কিন্তু পড়তে না পারায় এখানে পড়তে এসেছি।'

অর্ণবের চোখ জলে ভরে গেল। আবার মাস্টার মশাই বললেন, 'কেন, বাবা-মা পড়িয়ে দেয়নি?'

'না, বাবা ছোটোবেলায় মারা গেছে। আমার মা, লেখাপড়া শেখেনি, আমারও শেখা হয়নি।'

সেকেন্ড মাস্টার বললেন—'এখানে পড়বি?'

অর্ণব একটু অবাক হয়ে গিয়ে বললো—'হ্যাঁ পড়বো।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের এখানে পড়া না পারলে আমরা প্রচুর পেটাই। তা এই পেটানি খেয়ে পালাবি না তো?'

'না-না পালাব না, আমাকে পড়াবেন?'

অর্ণবের দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

'আচ্ছা, তোর কিছু খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

'না।'

'সেকেণ্ড মাস্টার ডাকলেন—'মালিনী—মালিনী'।

'কী স্যার।'

'একে কিছু ভাত-তরকারি দেতো। এ খাবে;' অর্ণবকে দেখিয়ে বললেন।

বেশ কয়েকঘন্টা কেটে গেল। ছাত্ররা অবাক। কৃষ্ণের মুখে-চোখে হাসি ফুটে উঠেছে।

এদিকে সুপর্ণা অস্থির হয়ে যাচ্ছে। সে মনে মনে ভাবছে, 'একি এখনো ছেলেটা বাড়ি এলো না কেন? কতদূরে গেছে যে এত বেলা হয়ে গেল অর্ণব এখনও ফিরল না।'

হঠাৎ বাইরে মোটর বাইক থামবার শব্দ শোনা গেল। সুপর্ণা অবাক, অর্ণব দাঁড়িয়ে, তার দুপাশে দুই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

'নমস্কার, আমরা দাসপাড়ার প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার।'

সুপর্ণা নমস্কারের ভঙ্গিতে ভয়ে ভয়ে বললো, 'কী হয়েছে অর্ণবের?'

অর্ণব মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়।

'আমরা অর্ণবকে লেখাপড়া শেখাতে চাই। আপনি কি রাজি আছেন?'

সুপর্ণার মুখ কালো হয়ে যায়। সে বললো, 'লেখাপড়া! লেখাপড়ার খরচ এত টাকা কোথায়?'

'সে কথা আপনাকে ভাবতে হবে না।'

সুপর্ণা কিছুই বুঝতে পারছে না। কোথা থেকে কী হয়ে গেল। বোঝাই যাচ্ছে না।

সুপর্ণা অনেক ভেবে বলে—'আচ্ছা আমাদের খাবার দাবার কী করে চলবে? আমরা দুজনে যা রোজগার করি তা দিয়ে কোনো ক্রমে সংসার চলে আমাদের।'

অর্ণবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে বলে ওঠে, 'মা আমি লেখাপড়া শিখব।'

সুপর্ণার এ ভারি বিপদ, কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ফার্স্ট মাস্টার বলে উঠলেন 'ঠিক আছে আপনি আমাদের বাড়িতে কাজ করে যা পাবেন তা দিয়ে সংসার চালাবেন। আর অর্ণব আমাদের কাছে থেকেই লেখাপড়া করবে।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় অর্ণবের মা সুপর্ণা। মায়ের পাশে জলে ভেজা হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে অর্ণব।

"পবিত্র আর নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা কর—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম, চরিত্রই প্রকৃত শক্তি। আধ্যাত্মিকতার অর্থ সেই চরিত্র শক্তি অর্জন করা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

গাঁইতি

শুভম সরেন

স্নাতক গণিত, প্রথমবর্ষ

অনেকদিন পর বেশ কাজ জুটলো যাইহোক। রাম কিছুদিন আগেই এই মফস্বল শহরে এসে খবর পেয়েছিল, একজন ব্যবসায়ী তার বিল্ডিং কমপ্লেক্স বানাবার জন্য কয়েকজন মজুর চায়। ঠিকানায় গিয়েই কাজ পেয়ে গেল সে।

উঠতি বয়সের কিশোর। কিছু বেশিই কাজ করতে পারে। তাছাড়া এই বয়সে কাজ করার স্বাভাবিক ইচ্ছেটা মারা যায় না। বেশ পোক্ত কাজ করতে পারে রাম। মূলত সিমেন্টের বস্তা বওয়া, ইট বওয়ার কাজ। দিনমজুরি চলনসই।

রাম যখন কাজে যোগ দেয়, তখন বাড়ির একতলা ছাদটা ঢালাই হয়ে গেছে। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে বাড়ির মালিকের সাথে কথা হল।

'কোথায় বাড়ি তোমার?'

একবার চোখ তুলে আবার ব্লুপ্রিন্টার দিকে মনোযোগ দিলেন মোটাসোটা চেহারার, চোখে চশমা আঁটা ব্যবসায়ী মৃদঙ্গবাবু।

'আজ্ঞে হরিণঘাটা, মানিকতলার পাশে।'

বিবর্ণ জামাপ্যান্ট পরনে রাম আস্তে আস্তে বলে।

'ঠিক আছে', মৃদঙ্গবাবু বললেন, 'তবে রাতের কাজ, পারবে তো?...আচ্ছা, শ্রীকুমারের কাছে নাম ঠিকানা দিয়ে যাও। কাল থেকে আসবে।'

দিন পনের কুড়ি বেশ চলছে কাজ। দোতলা ছাদ ঢালাই হবে, তার তড়িঘড়ি চলছে। রাত্রে কাজ, দিনে বিশ্রাম। রাত্রে সোডিয়াম লাইটের আলোয় চারিদিক দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ। রামের এখন বাড়তি কাজ ঢালাই মেশিনে পিচ ও সিমেন্ট ঢালা। অন্য মজুরেরা তার থেকে বয়সে বড়ো। সকলে যে যার মতো কাজ করে। সেদিন হঠাৎ তার গাঁইতিটা চোখে পড়ে গেল।

ঘরবাড়ি তৈরির জায়গায় গাঁইতি থাকা অস্বাভাবিক নয়, তবু গাঁইতিটা দেখে রামের কিছুটা যেন অস্বস্তিবোধ হল। কাজের পরে সেই গাঁইতিটার কথা ভুলে গেল ঠিকই, কিন্তু পরের দিন আবার সে গাঁইতিটা দেখতে পেল।

সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো।

'কীরে দাঁড়িয়ে পড়লি যে!'

শ্রীকুমার চেঁচিয়ে উঠলে রাম সম্বিৎ ফিরে পায়। সে কাজ শুরু করে।

দোতলা ঢালাই প্রায় শেষ। রাম ভোর ভোর বসতিতে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হরিণঘাটাতে তার নিজের বলে কেউ নেই।

একদিন ছিল। মা ওর যখন দশ বছর, কুয়োয় পড়ে মারা যায়। তারপর সে ভবঘুরে, স্কুল পালিয়ে খিদের তাড়নায় মজুরের কাজ করে।

বেলা দশটায় উঠে রাম পাচন নিয়ে দাঁত মাজে। কাছের চায়ের দোকানে চপ-মুড়ি খায়। তারপর এখানে সেখানে বেড়াতে থাকে। যেখানে মফস্বলের নতুন বাড়িগুলো তৈরি হচ্ছে, সেই দিকটাতেই একটা ফাঁকা মাঠ আছে। রাম সেদিকটায় বেড়াতে যায়। আজ তার আবার সেই বাড়িটার ছাদে পড়ে থাকা গাঁইতিটার কথা হঠাৎ মনে পড়ল।

আচ্ছা, সে এতদিন কাজ করছে। কই, একদিনও তো কেউ গাঁইতিটা নিয়ে কাজ করেনি? রাম অন্তত দেখেনি কাউকে। তাহলে ওখানে ওটা পড়ে আছে কেন? কেউ কি দেখেনি?

অন্যকিছু ভাবতে গিয়ে তার মনে হল, আজ ঢালাই-এর কাজ শেষ। সঙ্গে মজুরের কাজও। মৃদঙ্গবাবু বলে দিয়েছেন যে, ঢালাই-এর পর আর মজুর লাগবে না।

ঢালাই-এর শেষ কাজ। পুরোদমে কাজ চলছে। মাঝে মাঝে চা বিরতি। প্লাস্টিকের কাপে চা খেতে খেতে রাম আবার গাঁইতিটা লক্ষ করলো। এবারে সে পাশের একজন লোককে ডেকে না জিজ্ঞাসা করে পারলো না।

'আচ্ছা, ওই গাঁইতিটা কি মালিকের?'

'কোনটা বলো দেখি?' লোকটা অন্যমনস্ক।

রাম আঙুল তুলে দেখালো।

কাজ শুরু হয়ে গেছে। লোকটা তাকে পাত্তাই দিল না। হাতের প্লাস্টিক কাপটা ফেলে কাজ করতে চলে গেল।

ভোরের দিকে ঢালাই-এর কাজ শেষ। অন্যান্য মজুরদের মতো রামেরও আজ গায়ে সিমেন্টের ধুলো একটু বেশি। শ্রীকুমার সবাইকে তাদের শেষ পারিশ্রমিক দিতে থাকে। রাম পারিশ্রমিক পেলে, শ্রীকুমারকে বলে, 'আচ্ছা, একতলায় যে গাঁইতিটা রাখা আছে, ওটা কার?'

'কোন গাঁইতিটা বলো দেখি?' শ্রীকুমার ঈষৎ অবাক হয়।

তখন অন্যান্য মজুররা যে যার চলে যাচ্ছে।

রাম বলল, 'আরে, একতলায় ছাদে আছে, দেখেননি?'

'নিয়ে এসো তো।'

রাম গাঁইতিটা নিয়ে আনার জন্য একতলার ছাদে যায়। শ্রীকুমারের ব্যবহারে সে অবাক হয়। যে মজুরদের 'তুই' ছাড়া কিছু বলতো না, সেই কিনা রামকে 'তুমি' দিয়ে কথা বলছে। আর এভাবে ভাবতে গিয়ে সে কখন যে একতলার ছাদে পৌঁছে যায়, বুঝতে পারে না। সামনে সে গাঁইতিটা দেখতে পায়।

ছাদে সে একা! ভোরের আলো এখনও ততটা স্পষ্ট হয়নি। গাঁইতিটার কাছে সে যত যেতে থাকে, তার কেন জানি হৃৎস্পন্দন বাড়তে থাকে। কোনো কারণ নেই, একটা সামান্য গাঁইতি—অথচ কেমন যেন তার একটা অজানা ভয়। সে গাঁইতিটার একেবারে কাছে এসে পড়েছে। গাঁইতিটা মেঝেতে শুয়ে। সে সেটাকে হাত বাড়িয়ে তুললো। তুলতেই সে শিহরিত হয়ে উঠলো! দেখলো গাঁইতিটার ঠিক মাঝখানে স্পষ্ট খোদাই করা আছে দুটি অক্ষর—'রাম'! সে খোদাই করা অক্ষর দুটির উপর হাত বোলালো আস্তে আস্তে। আশ্চর্য, তার নাম গাঁইতিতে লেখা কেন?

সে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল বোধ হয়। শ্রীকুমারের হাঁকে সম্বিৎ ফিরে পেল রাম। সে গাঁইতিটা নিয়ে নিচে নেমে এল। শ্রীকুমারকে সেটা সে দিল। শ্রীকুমার দেখে বলল, 'দেখি মৃদঙ্গবাবুকে দেখাবো।'

রাম কিছুটা যেন অস্বাভাবিক ভাবে হেঁটে রাস্তায় উঠে চলে গেল, শ্রীকুমারকে কিছু না বলে।

সে সময় হঠাৎ অন্ধকার ছিঁড়ে শ্রীকুমারের পাশে মৃদঙ্গবাবু এসে দাঁড়ালো। শ্রীকুমার মৃদঙ্গবাবুর দিকে তাকালো, মৃদঙ্গবাবু শ্রীকুমারের দিকে। শ্রীকুমার নীরবে গাঁইতিটা মৃদঙ্গবাবুকে দেখালো। আজ তাদের কেমন যেন যান্ত্রিক দৃষ্টি, যান্ত্রিক ভঙ্গী। ভোরের আলো এসে পড়েছে প্রায়। সেই আবছায়ার নৈঃশব্দে শ্রীকুমার ও মৃদঙ্গবাবু দুজনেই কেমন যেন পিশাচের মতো হেসে উঠল। মৃদঙ্গবাবু বললেন, 'কিহে? তা ভালোই তো বাইপাসে মোড় নিলে। একেবারে ট্রাফিক জ্যাম ছাড়িয়ে ভোঁ ভোঁ...'

পরের দিন মফস্বলে শোনা গেল দুটো অদ্ভুত খবর। দুটো নয়, তিনটে। মফস্বলের এক প্রবীণ ব্যবসায়ী ও তার সহকারীর গাঁইতির আঘাতে মৃত্যু। ফাঁকা মাঠে সদ্যখোদাই করা এক কুয়োয় পড়ে এক কিশোরের মৃত্যু। সকালবেলা হঠাৎ ধসে যাওয়া এক বৃহৎ বিল্ডিং কমপ্লেক্সের একতলা ছাদের অংশটিতে একটি অজ্ঞাত সিমেন্টজমা মৃতদেহ আবিষ্কার।

সবচেয়ে অবাক কথা, সে গাঁইতির আঘাতে ওই প্রবীণ ব্যবসায়ীও তার সহকারীর মৃত্যু হয়েছে, সম্ভবত তারই আঘাতে দেওয়ালের একাংশে খোদাই অক্ষরে লেখা আছে ঃ 'আমাকে ফাঁসাবার জন্য তোমরা উঠে পড়ে লেগেছিলে। কিন্তু পারোনি, পারবে না। কারণ আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি।'

গাঁইতিটাতে তেমনই খোদাই করে লেখা ঃ 'রাম'।

"সত্যিকারের কিছু শিক্ষা চাই, খালি বই পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না। যাহাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

নাটক

সম্ভবামি যুগে যুগে

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
সৌম্যদীপ দাস
স্নাতক বাংলা, তৃতীয় বর্ষ

আজ থেকে বহুদিন আগে ভারতবর্ষের উত্তরাপথ ব্যাপ্ত করে সংঘটিত হয়েছিল এক মহাযুদ্ধ। মহাভারতের পাতায় সেই যুদ্ধের ইতিহাস ও পরিণাম লেখা আছে। সেই মহাযুদ্ধেরই সূচনার ঠিক আগে পাণ্ডবদের সেরা বীর অর্জুনের মধ্যে দেখা যায় বিচিত্র এক অবসাদ। অর্জুনকে তাঁর আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনার জন্যে তাঁরই রথসারথী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ সময় ধরে উপদেশ প্রদান করেন। তারই অপূর্ব পরিণাম শ্রীমৎ-ভগবৎ-গীতা। আমাদের আজকের নাটক-কাহিনিটি মুখ্যত গীতা ও মহাভারত থেকে নেওয়া। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বারবার তাঁর স্বধর্মে নিষ্ঠ থাকার কথা বলেছিলেন। আর মহাভারতে একাধিকবার ভ্রাতৃঘাতী এই দ্বন্দ্বকে বলা হয়েছে অধর্ম ও অন্যায়ের বিপক্ষের ধর্ম ও ন্যায়ের সংগ্রাম। আমাদের কাহিনিতে এই দুটি দিকই গুরুত্ব পেয়েছে। নাটকের স্বার্থে আমরা একটু স্বাধীনতা নিয়েছি কাহিনিটিকে রূপান্তরিত করার। গীতার সূচনার অংশটিকে ধরতে গিয়ে আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে দর্শককে পৌঁছে দিতে চেয়েছি মহাভারতের তিনটি বিখ্যাত ঘটনায় যেখানে কৌরবদের অন্যায় আকাশ ছুঁয়েছিল। ভগবান কৃষ্ণ যেন অর্জুনকে এই জন্যেই স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে আহ্বান করে বললেন, 'যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়'। দর্শকমণ্ডলীর কাছে নিবেদন নাটকের প্রয়োজনে কাহিনিতে গৃহীত এই স্বাধীনতাটুকু অনুগ্রহ করে আপনারা আশা করি মেনে নেবেন। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন পার্থসারথীর পূজা। অর্জুনকে স্বধর্মে নিযুক্ত করতে পার্থসারথীর দৃপ্ত আহ্বান আমাদের সেই পূজায় নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করবে। (আবহ সঙ্গীত)

নেপথ্যে ঃ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে।
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।
এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োমর্ধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্।।

(আবহ)

প্রথম দৃশ্য

কৃষ্ণ ঃ এসো অর্জুন, এবার আরো ভালো করে দেখো চারদিকে চেয়ে। দেখতে পাচ্ছ সব?

অর্জুন ঃ হ্যাঁ সে তো দেখতে পাচ্ছি। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে আজ সমবেত হয়েছে কৌরব ও পাণ্ডবরা যুদ্ধের জন্যে।

কৃষ্ণ ঃ ঠিক কথা। সুতরাং আর দেরী করা দরকার বলে তো মনে হচ্ছে না। ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে তোমার প্রতিপক্ষ যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তুমিও তাহলে তৈরী হও।

অর্জুন ঃ আমিও তৈরী। কেবল—

কৃষ্ণ ঃ দ্বিধা? কিজন্যে অর্জুন?

অর্জুন ঃ না দ্বিধার কথা নয়। আমি আসলে যুদ্ধ শুরুর আগে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত বিপক্ষের যোদ্ধাদের ভালো করে চিনে নিতে চাই।

কৃষ্ণ ঃ আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি। ওইতো দেখো, দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী সকল রাজারা তোমার বিপক্ষে আজ যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত। তাদের প্রত্যেককে তুমি স্পষ্ট করে দেখে নাও অর্জুন। এরা অবশ্য তোমারই ভাই—দুর্যোধন, দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ...

অর্জুন ঃ আরো আছেন দেখছি অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম, মামা শকুনি...

কৃষ্ণ ঃ কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য, সোমদত্তের পুত্র ভুরিশ্রবা। এঁরা সবাই যুদ্ধে কৃতবিদ্য।

অর্জুন ঃ ঠিক কথা। এদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে আমাকে।

কৃষ্ণ ঃ নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এঁরা সকলেই তোমার শক্তির কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হবেন। গাণ্ডীবীর সঙ্গে যুদ্ধে...

অর্জুন ঃ প্রশংসার দরকার নেই সখা। আমি কিন্তু ভাবছি অন্য কথা।

কৃষ্ণ ঃ অন্য কথা? কিরকম শুনি।

অর্জুন ঃ আমার চিনতে কোথাও ভুল হচ্ছে না তো?

কৃষ্ণ ঃ না না, চিনতে তোমার কোনো ভুল হচ্ছে না অর্জুন।

অর্জুন ঃ কিন্তু ওরা যে আমার পরমাত্মীয়।

কৃষ্ণ ঃ সংসারে পরমাত্মীয় তো সবাই অর্জুন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে একটাই তাদের পরিচয়—তারা তোমার প্রতিপক্ষের যোদ্ধা।

অর্জুন ঃ কিন্তু তারাই যে আবার আমার পিতামহ, আমার আচার্য, আমার মামা, আমার সন্তানের মত, আমার বন্ধু! বলতে পারো কৃষ্ণ, এদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোন্ পরম সিদ্ধি লাভ হতে পারে আমার—স্বজনের রক্তে নিজের হাতকে কলুষিত করা ছাড়া? বলতে পারো কৃষ্ণ কী হবে আমার সেই রাজ্যের অধিকার পেয়ে, যে রাজ্য নির্মিত হবে আমারই পরিজনদের শ্মশানশয্যার উপরে? বল তুমি সখা, কোন মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে এই জয়ে? কোন আনন্দ পাব আমরা এই নিধনযজ্ঞে আহুতি দিয়ে?

কৃষ্ণ ঃ আশ্চর্য? পার্থ। এই যুদ্ধক্ষেত্রে সমাসন্ন মহারণের প্রাক্‌লগ্নে দাঁড়িয়ে তোমার এই কথার কোন স্বাভাবিক অর্থ তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না। হঠাৎ করে এমন সব কথা কেন বলছ তুমি? কোনো মানসিক অবসাদে আজ কি অবসন্ন বোধ করছ?

অর্জুন ঃ তা আমি জানি না সখা। কিন্তু এই যুদ্ধার্থী স্বজনদের সামনে দেখে আমার সারা শরীর কেমন জানি করছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, শরীরের শিরায় শিরায় এক জ্বালা অনুভব করছি। মন যেন এই মুহূর্তে...

কৃষ্ণ ঃ অর্জুন! এমন সঙ্কটকালে তোমার এই বিচলিত হওয়া সাজে না। এসো, ওঠো তোমার রথে, আকর্ষণ করো গাণ্ডীব। তার ঝঙ্কারে কেঁপে উঠুক তোমার শত্রুরা। তীর বর্ষণ করো তোমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

অর্জুন ঃ না-না আমি তা পারব না কেশব। তুমি বুঝতে পারছ না...।

কৃষ্ণ ঃ আ-আ-আঃ, আমি যথার্থই বুঝতে পারছি...

অর্জুন ঃ না কেশব, যাদের জন্য লোকে রাজ্য ও সুখ কামনা করে তারাই আজ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করতে এসেছে। তাই আমি এই যুদ্ধ চাই না। এই রাজ্যলাভ, এই সুখভোগ আমার কিচ্ছু চাই না।

কৃষ্ণ ঃ অর্জুন। তুমি কাদের আত্মীয় বলে যুদ্ধ থেকে বিরত হচ্ছ? যারা তোমাকে, পঞ্চ পাণ্ডবকে বিনাশ করতে সদা প্রস্তুত। তুমি কি জানো না যে তারা...

অর্জুন ঃ জানি, লোভের বশে তারা নিজের বংশের বিনাশ করতে, মিত্রদের সঙ্গে বিরোধ করার মধ্যে কোনো পাপ দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু সখা, আমরাও কি সেই পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি না?

কৃষ্ণ ঃ অর্জুন তোমার ভুল হচ্ছে।

অর্জুন ঃ হোক্ ভুল। তারা যদি আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করতেও আসে তাহলে আমি আমার মৃত্যু স্বীকার করে নেব। কিন্তু নিজের স্বজনদের বিনাশ করতে এই যুদ্ধাস্ত্র আমি গ্রহণ করতে পারব না।

কৃষ্ণ ঃ তোমার এই শোক জ্ঞাপন বৃথা অর্জুন। তোমার মত পণ্ডিতের মৃত বা জীবিত কারোর জন্যই শোক সাজে না।

অর্জুন ঃ কিন্তু এ তো মানুষের স্বধর্ম?

কৃষ্ণ ঃ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ ছাড়া আর কোনো বড় স্বধর্ম আছে কী? তুমি যদি সেই ধর্মযুদ্ধ থেকে বিরত থাক তাহলে স্বধর্মচ্যুত হয়ে তুমি পাপের অংশদারী হবে। তোমার অনুগত মহারথীগণ মনে করবেন তুমি ভয়বশত যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছ।

অর্জুন ঃ যুদ্ধ ভয়? (আবহ হঠাৎ জোরালো হয়)

কৃষ্ণ ঃ তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না অর্জুন? রণবাদ্যের শব্দ ক্রমশই আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এমন সংকটের মুহূর্তে তোমার মত এমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির এ মোহ কেন?

অর্জুন ঃ কিন্তু আমি যে দ্বিধাগ্রস্ত। আমি যে বুঝতে পারছি না...

কৃষ্ণ ঃ ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।
হৃদয়ের তুচ্ছ দুর্বলতা পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য মাথা তুলে উঠে দাঁড়াও। ভুলে যেও না তোমার স্বধর্মকে। ন্যায় আর ধর্ম প্রতিষ্ঠাই যে আমাদের সভ্যতার লক্ষ্য। যেখানে অধর্ম, সেখানে অন্ধকার। মনে রেখো, সেই অধর্মের বশেই মোহাবিষ্ট হয়ে একদিন কৌরবরা চক্রান্ত করে ঘটিয়েছিল জতুগৃহ দাহের ঘটনা?

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মঞ্চে আলো জ্বলে উঠল। পাণ্ডববিনাশের কুমতলবে শলা পরামর্শ করছেন মামা শকুনি ও কর্ণ)

কর্ণ ঃ অনেক সময় তো কেটে গেলো মামা। কি ব্যাপার বলুন তো। এখনো তো বন্ধু আমার এলো না?

শকুনি ঃ ঠিক, আমারও একই চিন্তা হচ্ছে বাবা। আচ্ছা তোমার কি মনে হয় বলো তো কর্ণ? বাবার সম্মতি আদায়ে ভাগ্নে কি আমার সফল হবে?
(দুর্যোধনের প্রবেশ)

দুর্যোধন ঃ ভাগ্নে তোমার সফল হয়েছে মামা।

শকুনি ঃ হয়েছে। তাই নাকি। তাহলে তো দারুণ ব্যাপার। সুতরাং আর বিলম্ব কেন? শুভস্য শীঘ্রম। ঠিক যেমন যেমন পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই মতো তোমার কাজ শুরু করে দাও। শত্রুর বিনাশে দেরি করতে নেই।

কর্ণ ঃ কিন্তু আমার একটা সংশয় আছে।
(বিরোচকের প্রবেশ)

বিরোচক ঃ আজ্ঞে আমার কিন্তু একশত-একটি সংশয় আছে।

শকুনি ঃ এই রে যষ্টিধারী নির্বোধটি আবার এসে উপস্থিত হয়েছে।

দুর্যোধন ঃ (হেসে) রাগ করবেন না মাতুল...

বিরোচক ঃ যথার্থ বললেন না যুবরাজ। আপনি যতই বলুন মাতুল আপনার রাগ করবেনই। ভগবানকে দেখলে যেমন ভক্তের জন্ম-জন্মান্তরের ভক্তি উথলে ওঠে, আমাকে দেখলেই আপনার মাতুলের জন্ম-জন্মান্তরের ক্রোধ উথলে ওঠে।

শকুনি ঃ দুর্যোধন, তুমি ওকে থামাবে।

দুর্যোধন ঃ বিরোচক, তুমি একটু সংযত হও।
(বিরোচক মুখে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে)

দুর্যোধন ঃ হ্যাঁ, কর্ণ কোন্ সংশয়ের কথা তুমি যেন বলছিলে?

কর্ণ ঃ হ্যাঁ সংশয়। তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্র এই পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্য জেনেও তোমায় সম্মতি দিলেন? কোনো আপত্তি করলেন না?

দুর্যোধন ঃ না বাবার কোনো আপত্তি নেই।

কর্ণ ঃ কিন্তু কি উপায়ে এই অসাধ্যসাধন করলেন?

দুর্যোধন ঃ মামা শকুনির পরামর্শে।

বিরোচক ঃ (মুখে আঙ্গুল রেখেই) ওরেব্বা,

দুর্যোধন ঃ বিরোচক...

বিরোচক ঃ ঐ নামটা শুনলেই...

দুর্যোধন ঃ আঃ বিরোচক।

আসলে বাবা জানেন যে কেবল অন্ধ হওয়ার কারণে তিনি এই রাজ্য পাননি। পেয়েছিলেন পাণ্ডু। এমনকি নগরবাসীও তাঁকে এবং আমার পিতামহ ভীষ্মকে অনাদর করে যুধিষ্ঠিরকে রাজা করতে চান। কিন্তু পাণ্ডব পুত্ররাই যদি বংশানুক্রমে রাজ্য পায় তবে আমাদের বংশ অজ্ঞাত হয়ে থাকবে।

কর্ণ ঃ তাই রাজি হলেন?

দুর্যোধন ঃ না হয়ে উপায়? আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছি যে সমুদয় সাম্রাজ্য পেয়ে গেলে কুন্তী ও তাঁর সন্তানগণ পুনরায় এই হস্তিনানগরে ফিরে আসবেন।

শকুনি ঃ অসাধারণ, চমৎকার। আমার সুবুদ্ধির যথার্থ প্রয়োগে তোমার সাফল্য দেখে আমার বড়ো আনন্দ বোধ হচ্ছে ভাগ্নে। কিন্তু তোমার প্রজারা?

বিরোচক ঃ যুবরাজ, আমি কি এবার একটা কথা বলতে পারি?

দুর্যোধন ঃ (হেসে) নিশ্চয়ই, কতক্ষণ আর কথা বন্ধ করে তুমি থাকবে বিরোচক?

কর্ণ ঃ পেটটা ফেটেও যেতে পারে।

বিরোচক ঃ হেঃ হেঃ, না আমি মানে বলছিলাম কি, মামার আমাদের এত সুবুদ্ধি কোথা থেকে এলো যুবরাজ? আমি তো চিরকালই ওনাকে দুর্বুদ্ধির মাথা বলেই জানি।

শকুনি ঃ দুর্যোধন, তুমি যদি এই অর্বাচীনটিকে এক্ষুণি বিদায় না করো, তাহলে আমি কিন্তু...

দুর্যোধন ঃ আঃ মামা...

বিরোচক ঃ কোন চিন্তা করবেন না যুবরাজ। প্রথমত, উনি কিছুই করতে পারবেন না, কারণ ওনার যত শক্তি সব বাক্যে, শরীরে কিছুই নেই। দ্বিতীয়ত, আমি সত্যিই চলে যাবো, কারণ, যেখানে মাতুল শকুনি, সেখানে সর্বনাশ—আমি বাপু বেঁচে থাকতেই ভালোবাসি, যত বুড়োই হই কেন? ঠিক না, মাতুল? প্রণাম হই গো যুবরাজ, হেঃ হেঃ হেঃ (প্রস্থান)

দুর্যোধন ঃ বিরোচক আর যাই বলুক, কথাগুলি কিন্তু বেশ মজা করেই বলে।

কর্ণ ঃ কেন জানি মনে হয়, অনেক সময় ভবিষ্যদ্‌বাণীর মত করে কিছু কথা বলে চলে যায়।

দুর্যোধন ঃ যাই হোক। হ্যাঁ যা, বলছিলাম, আমার প্রজারাও তোমার কৌশলেই অর্থ আর সম্মানের লোভে এখন আমার অনুগত।

শকুনি ঃ বাঃ বেশ বেশ।

কর্ণ ঃ তাছাড়া অমাত্যগণ ও সকল ধনদারও তো এখন আপনারই অধীন।

দুর্যোধন ঃ দুশ্চিন্তা কেবল একজনকে নিয়ে...।

শকুনি ঃ কে পিতামহ ভীষ্ম?

দুর্যোধন ঃ না তিনি কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষেই সমপক্ষপাতী।

কর্ণ ঃ অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য?

দুর্যোধন ঃ না তিনিও নন। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার অনুগত। সুতরাং তিনিও পুত্রের বিপক্ষ না হয়ে আমারই পক্ষ নিতে বাধ্য হয়েছেন।

শকুনি ঃ তাহলে কে ভাগ্নে?

দুর্যোধন ঃ কাকা বিদুর।

শকুনি ঃ হা হা হা (বিদ্রূপের হাসি)

দুর্যোধন ঃ হাসবেন না মামা? তিনি আমাদের অর্থে পুষ্ট হয়েও গোপনে পাণ্ডবদেরই পক্ষপাতী।

শকুনি ঃ কিন্তু ভাগ্নে, তিনি একলা কি আর আমাদের সুবৃহৎ কৌরব বংশকে বাধা দিতে সক্ষম হবেন? (বিদ্রূপের সঙ্গে)

কর্ণ ঃ সত্যই। তাঁর একার পক্ষে এই বিশাল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ অসম্ভব।

দুর্যোধন ঃ তা বলতে পারব না।

শকুনি ঃ দুশ্চিন্তা কোরো না ভাগ্নে। যাও অতি দ্রুত কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবকে সাদরে বারণাবতে পাঠানোর সুব্যবস্থা করো। আর দেখো, বারণাবতের রাত পার হলেই, ভাগ্নে, হাঃ হাঃ হাঃ...

তৃতীয় দৃশ্য

(মঞ্চে আলো জ্বলে উঠল। বারণাবতের দৃশ্য। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও অর্জুনের প্রবেশ। আবহে বাঁশীর সুরমূর্চ্ছনা। দূর থেকে ভেসে আসছে শিববন্দনার সুর।)

ভীম ঃ সত্যি কি রমণীয় এই বারণাবত নগর। আকাশে বাতাসে সব কিছুর মধ্যে কি এক মনোরম সৌন্দর্যের আবেশ।

নকুল ঃ সত্যি। ঐ দেখ দাদা। ঐদিকে দেবাদিদেব মহাদেবের উৎসব উপলক্ষ্যে এক মহোৎসবের আয়োজন শুরু হয়েছে। শুনতে পাচ্ছ গায়কের দল কি অসাধারণ সুরে মহাদেবের বন্দনা সঙ্গীত গাইছে।

অর্জুন ঃ আর কাতারে কাতারে মানুষ এসে হাজির হয়েছে ঐ উৎসবের প্রাঙ্গণে। আলোর ঝলকানিতে উৎসবের মঞ্চ যেন মায়াময় হয়ে উঠেছে।

নকুল ঃ তবে চলো আমরাও সেই উৎসব মঞ্চে হাজির হই। আগত ব্রাহ্মণ ও গায়কদের ধন দান করে কিছুটা সময় আনন্দ উপভোগ করি। (প্রস্থানোদ্যত হলে সহদেবের প্রবেশ, সঙ্গে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি। সকলেই তার আগমনে হতবাক)

যুধিষ্ঠির ঃ এ কি সহদেব তোমায় এত বিচলিত দেখাচ্ছে কেন?

অর্জুন ঃ ইনি কে ভাই? পূর্ব পরিচিত বলে তো মনে করতে পারছি না।

দূত ঃ আমি বিদুরের দূত।

নকুল ঃ দূত?

ভীম ঃ কিন্তু এখানে কি প্রয়োজনে?

দূত ঃ বিদুরের আজ্ঞায়।

যুধিষ্ঠির ঃ কেন তিনি কি কোনো ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন?

দূত ঃ না, তাঁর বিষয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

অর্জুন ঃ তবে?

দূত ঃ তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হলেন কৌরব বংশ।

ভীম ঃ কৌরব বংশ!

দূত ঃ হ্যাঁ কৌরব বংশ। দুর্যোধন, শকুনি ও কর্ণের কুকৌশলেই ধৃতরাষ্ট্র আপনাদের এই নগরে পাঠিয়েছেন।

সহদেব ঃ কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য?

দূত ঃ উদ্দেশ্য একটাই। যেন তেন প্রকারেণ এই পঞ্চপাণ্ডবকে বিনাশ করা।

নকুল ঃ কিন্তু কি উপায়ে?

দূত ঃ পুরোচন নামে এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী দুর্যোধনের আদেশে আপনাদের এই গৃহ নির্মাণ করেছেন।

ভীম ঃ এই মনোরম শিব গৃহ?

দূত ঃ হ্যাঁ, শিবগৃহই বটে। মাটিতে প্রচুর পরিমাণে ঘি, তেল, ধুনো, বসা, লাক্ষা প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ মিশিয়ে এই গৃহের দেওয়াল তৈরি হয়েছে। যাতে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে এই যতুগৃহে আগুন লাগিয়ে আপনাদের প্রাণে বিনাশ করতে পারা যায়। আর তাহলেই কৌরব বংশের স্বপ্নপূরণ হবে।

অর্জুন ঃ স্বপ্নপূরণ!

ভীম ঃ চলো দাদা, এই মুহূর্তে মাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই নগর থেকে অন্যত্র পালিয়ে যাই।

যুধিষ্ঠির ঃ এই মুহূর্তে তা আর সম্ভব নয়।

নকুল ঃ কিন্তু কেন?

যুধিষ্ঠির ঃ কারণ আমরা সন্দেহ করছি বুঝতে পারলেই দুর্যোধনের চরেরা আমাদের হত্যা করবে।

দূত ঃ তাছাড়া দুর্যোধনের আদেশে মন্ত্রী পুরোচন নানা ভয়াবহ অস্ত্র গোপন করে রেখেছে এই গৃহের মধ্যেই।

অর্জুন ঃ তাহলে আমাদের পরিত্রাণের পথ কি কিছুই নেই?

যুধিষ্ঠির ঃ অবশ্যই আছে। আমরা মৃগয়ার ছলে নগরের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে নগর থেকে বেরানোর পথ সন্ধান করব, তারপর...

সহদেব ঃ কিন্তু দাদা, তাতে লাভ কী?

নকুল ঃ না না সহদেব, লাভ আছে। এতে করে দুর্যোধনেরা ভাববে, আমরা নিশ্চিন্তেই আছি।

অর্জুন ঃ সুতরাং, এবার যতুগৃহে আগুন লাগানোর বন্দোবস্ত করা যাক।

যুধিষ্ঠির ঃ ইতোমধ্যে আমরা এই যতুগৃহের মাটিতে সবার গোপনে সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করব। আর একসময় সঠিক সুযোগ বুঝে সুড়ঙ্গ পথ ধরে এই নগর থেকে বেরিয়ে আমরা অন্য পথে চলে যাব। দূত, আপনার কাছে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ আছে।

দূত ঃ বলুন ধর্মরাজ, আপনাদের কল্যাণের জন্যে আমি সবসময় প্রস্তুত।

যুধিষ্ঠির ঃ আপনাকে এই সুড়ঙ্গ নির্মাণে আমাদের সাহায্য করতে হবে।

দূত ঃ যথা আজ্ঞা।

অর্জুন ঃ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ধর্মরাজ, হস্তিনাপুর-ইন্দ্রপ্রস্থের ভাগ্যাকাশে এক দুর্যোগের রাত নেমে আসছে। আসন্ন ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে ধীরে ধীরে। অনেক দুঃখের মূল্যে, রক্তের স্নানে এই দেনা শোধ করতে হবে আমাদের।

চতুর্থ দৃশ্য

(কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রাঙ্গণ। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

অর্জুন ঃ এইভাবে গোপনে কেটে গেল একটা বছর। মন্ত্রী পুরোচন মনে করলেন, পাণ্ডবদের মনে নিশ্চয়ই এখন আর কোন সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণ ঃ ঠিক সেই সময়েই যুধিষ্ঠিরের আদেশে, গভীর রাত্রির অন্ধকারে ভীম মন্ত্রী পুরোচনের গৃহে, জতুগৃহের দ্বারে আগুন লাগিয়ে দিলেন। প্রবল বাতাসে সে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

অর্জুন ঃ হ্যাঁ, মুহূর্তের মধ্যে ভস্ম হয়ে গেল সারা জতুগৃহের প্রাঙ্গণ। আর তার আগেই সবার অলক্ষ্যে পঞ্চপাণ্ডব মা কুন্তীকে নিয়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে গেল বারণাবত নগর থেকে। রাতের শেষে আগুন নিভে গেলে বারণাবতবাসীরা দেখল মন্ত্রী পুরোচনের দগ্ধ-মৃত শরীর।

কৃষ্ণ ঃ এক নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রের দগ্ধ দেহ দেখে সবাই সিদ্ধান্ত করলেন এই মৃত দেহ আদতে কুন্তী ও তাঁর পাঁচ সন্তানের।

অর্জুন ঃ কিন্তু মাটি দিয়ে চাপা দেওয়া সেই গোপন সুড়ঙ্গ পথ কারও চোখে পড়ল না।

কৃষ্ণ : তাই জীবিত পঞ্চপান্ডব ও তাঁদের মাতা কুন্তীকে মৃত ভেবে তর্পণ আয়োজন করলেন ওই প্রবঞ্চক কৌরব বংশ। তোমার কাকা ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্মও তার সমর্থন করেছেন।

অর্জুন : কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম তো প্রকৃত সত্য জানতেন না।

কৃষ্ণ : জানলে?

অর্জুন : তিনি তো মেনে নিতেন না কখনোই, কারণ তিনি তো...

কৃষ্ণ : উভয় পক্ষেরই সমপক্ষপাতী।

অর্জুন : তবুও

কৃষ্ণ : তবুও?

অর্জুন : তাঁরা আমার গুরুজন, শ্রদ্ধেয়। তাঁদের আশীর্বাদে আমার যা কিছু কল্যাণ। আজ তাঁদের বিরুদ্ধেই আমি অস্ত্রধারণ করব! এই ভাবনাও যে আমার পাপ। না...না...না...

কৃষ্ণ : যারা তোমার, তোমার বংশের প্রাণাঘাতে সদা উদ্যত, তারা তোমার গুরুজন, শ্রদ্ধেয়? তারা নানান কৌশলে তোমাদের পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছে, কেবল রাজ্যসুখের উদগ্রীব বাসনা থেকে, তবুও তুমি আজ তাদের প্রতি এতো দয়াশীল? এতো মূর্খের থেকেও হীন কাজ।

অর্জুন : হীন কাজ!

কৃষ্ণ : এ তোমার দুর্বলতা।

অর্জুন : দুর্বলতা!

কৃষ্ণ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুর্বলতা। তুমি স্মৃতি ভ্রান্ত হয়েছো।

অর্জুন : না আমি স্মৃতি ভ্রান্ত হইনি। সব মনে আছে আমার।

কৃষ্ণ : মনে আছে?

অর্জুন : স্পষ্ট। ১২ বছর বনবাসে থাকার পর শেষ ১ বছর, অজ্ঞাতবাসের কালে আমরা হাজির হয়েছিলাম বিরাট রাজার মৎস্যদেশে। তবে ছদ্মবেশে—প্রকৃত পরিচয় নয়। দাদা যুধিষ্ঠির হলেন কঙ্ক নামে তাঁর সভাসদ। দাদা ভীম হলেন বল্লভ নামে রাজার পাকশালার অধ্যক্ষ। ভ্রাতা নকুলের পরিচয় হল রাজার অশ্বরক্ষক গ্রন্থিক, ভ্রাতা সহদেব হলেন রাজার গোসমূহের তত্ত্বাবধায়ক তন্ত্রিপাল।

কৃষ্ণ : আর তুমি?

অর্জুন : বৃহন্নলার পরিচয়ে রাজভবনের স্ত্রীদের নৃত্য-গীত-বাদ্যের শিক্ষক। কিন্তু...

কৃষ্ণ : কিন্তু, পার্থ, শেষ রক্ষা হল না তো পঞ্চপাণ্ডবের। অজ্ঞাতবাসের শেষ লগ্নে তোমাদের সম্মুখীন হতে বাধ্য হল কৌরবদের কাছে। মামা শকুনির এক নতুন কৌশলে পা দিলে তোমরা সবাই।

(আস্তে আস্তে মঞ্চে আলো ক্ষীণ হয়ে যায়। ঘটনা ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে যায়)

পঞ্চম দৃশ্য

(মঞ্চে আলো জ্বলে ওঠে। দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের প্রবেশ। নতুন পরিকল্পনায় তারা চিন্তিত)
(সুশর্মার প্রবেশ)

দুর্যোধন ঃ কী সংবাদ সুশর্মা? পঞ্চপাণ্ডবদের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল?

সুশর্মা ঃ মহারাজ, আমরা সমস্ত দুর্গম বনে-পর্বতে, জনাকীর্ণ দেশে-নগরে বহু সন্ধান করেও পঞ্চপাণ্ডবের এখনও কোনো সংবাদ পাইনি।

কর্ণ ঃ নাহলে নিশ্চিত পঞ্চপাণ্ডবের বিনাশ হয়েছে।

শকুনি ঃ না, ভুল করছো কর্ণ, পঞ্চপাণ্ডবদের মতো বীর এবং বুদ্ধিমান পুরুষদের এতো সহজে বিনাশ হয় না।
(বিরোচকের প্রবেশ)

বিরোচক ঃ দেখেছো কি বুদ্ধি! বয়স যত বাড়ছে, বুদ্ধিও তত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সত্যি মামা, ধন্যি তুমি।

শকুনি ঃ (হেসে) এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা। বিরোচক আজ আমার প্রশংসা করছে। আমার এমন সৌভাগ্য তো আমি কল্পনাও করতে পারছি না।

দুর্যোধন ঃ তাহলে দেখুন মামা, আপনি কেবলই ওর উপর ক্রোধ প্রকাশ করেন।

বিরোচক ঃ তাহলে বলুন যুবরাজ। আমি মামারও কতই না ভাল চাই। আর সেইজন্যেই তো সকাল থেকে খালি ভগবানকে ডাকছি আর বলছি, মামা আমার কবে মরবে, ও ভগবান—

শকুনি ঃ দেখছো ভাগ্নে, আমার ভালো চাওয়ার নমুনা দেখলে।

বিরোচক ঃ আহা রাগেন কেন? আমি আপনার ভাল চাইছি না? আপনি যত তাড়াতাড়ি মরেন, ততই আপনার ভাল, কারণ তাতে আর অন্যের ক্ষতির চিন্তা করে আপনার পাপ বাড়বে না। তাহলে অন্তত আপনি পরবর্তীকালে মুষিক হয়ে জন্মাতে পারবেন; না হলে যে আপনার কি জন্ম হবে,

শকুনি ঃ বিরোচক। ভাগ্নে, তুমি এই অপদার্থটাকে...

বিরোচক ঃ দূর করে দাও। যাতে অন্তত সে আরো ভেবে পরে এসে আবার ঠিক কথাটা বলতে পারে।

দুর্যোধন ঃ আঃ, বিরোচক, এবার তুমি এসো।

বিরোচক ঃ যথা আজ্ঞা। আমার একটা শুধু অনুরোধ যুবরাজ, আমাকে একবার খবরটা দেবেন।

দুঃশাসন ঃ কিসের খবর?

বিরোচক ঃ ওই যাতে শবযাত্রায় যেতে পারি।

দুর্যোধন ঃ বিরোচক, তুমি যাবে?

বিরোচক ঃ নিশ্চয়ই। শুধু মনে রাখবেন যুবরাজ, রাতে আর দিনে, সাদায় আর কালোয় গুলিয়ে ফেলবেন না। নাহলে শেষযাত্রার সংখ্যাটাই কেবল বাড়বে। (প্রস্থান)

শকুনি ঃ মাঝখান থেকে সব গোলমাল করে দিয়ে গেল।

কর্ণ ঃ আসলে ও একটু বেশী মজা করে ফেলে।

দুর্যোধন ঃ থাক ওসব কথা। মামা কিন্তু ঠিকই বলেছেন যে, পাণ্ডবরা এত সহজে বিনাশ হওয়ার নয়।

দুঃশাসন ঃ তাহলে?

শকুনি ঃ আমার মনে হয় তারা অতি গোপনে সঠিক সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

কর্ণ ঃ সঠিক সময়!

শকুনি ঃ হ্যাঁ, পঞ্চপাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের আর অল্পদিনই বাকি আছে, এই কয়েকটা দিন যদি তারা সাবধানে অতিক্রম করে যেতে পারে, তবে প্রকৃত সত্য প্রকাশ পেয়ে যাবে।

দুর্যোধন ঃ কিন্তু সে ফল কৌরবদের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ, যথেষ্ট দুঃখজনক।

শকুনি ঃ নিশ্চয়ই।

দুর্যোধন ঃ তাহলে এখন আমাদের করণীয়?

শকুনি ঃ (কিছুক্ষণ ভেবে) আর একদল অতি ধূর্ত গুপ্তচর পাঠাও, তারা সর্বত্র তন্ন তন্ন করে পঞ্চপাণ্ডবের সন্ধান করুক। সময় কিন্তু অতি অল্প।

দুর্যোধন ঃ উত্তম। সেনাপতি সুশর্মা তুমি একদল বিশ্বস্ত গুপ্তচর নিয়োগ করে তাদের পাঠিয়ে দাও পঞ্চপাণ্ডবের সন্ধানে।

সুশর্মা ঃ যথা আজ্ঞা মহারাজ। (সুশর্মার প্রস্থান)

দুঃশাসন ঃ আমার কিন্তু মনে হয়, পঞ্চপাণ্ডবরা সকলেই মারা গেছে।

শকুনি ঃ ভিত্তিহীন অনুমান রাজকার্যের প্রতিবন্ধক কুমার।

দুর্যোধন ঃ আর বারণাবতের জতুগৃহের কথাও ভুলে গেলে চলবে না।

কর্ণ ঃ কিংবা হয়তো এমন কোন স্থানে তারা আত্মগোপন করে আছে যা আমাদের পক্ষে বোঝা কোনদিনই সম্ভব হবে না।

শকুনি ঃ অঙ্গরাজ, রাজশাসনে এত সহজে হার মানলে চলে না। পাণ্ডবরা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান, কিন্তু শকুনির মস্তিষ্কও এখনো শুকিয়ে যায়নি। মনে রেখো, একবার যদি তাদের সন্ধান মেলে, তাহলেই...হা হা হা (উল্লাসের হাসি)

(সুশর্মার প্রবেশ)

সুশর্মা ঃ সুসংবাদ আছে মহারাজ।

দুর্যোধন ঃ কী সুসংবাদ।

সুশর্মা ঃ (কিছুটা গম্ভীর হয়ে) মৎস্যরাজ বিরাটকে আপনার মনে আছে নিশ্চয় মহারাজ।

দুর্যোধন ঃ মনে আছে, কারণ তিনি বহুবার আমার রাজ্যে অত্যাচার করেছেন।

দুঃশাসন ঃ কারণ মহাবীর কীচক ছিলেন তাঁর সেনাপতি। তাঁর বলেই মৎস্যরাজ বিরাটের এত স্পর্ধা।

সুশর্মা ঃ সুসংবাদ তো সেখানেই। ওই মহাবীর কীচককে বধ করেছে গন্ধর্বরা, ফলে মৎস্যরাজ বিরাট এখন একা, সম্পূর্ণ অসহায়।

শকুনি ঃ আচ্ছা তাই নাকি। অদ্ভুত ব্যাপার তো। দাঁড়াও তো একটু ভাবি। কীচক...গন্ধর্ব...মৃত্যু...। সব কিরকম যেন ঠেকছে ভাগ্নে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাদের সেনাদলকে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দাও।

দুঃশাসন ঃ ঠিকই বলেছেন মামা। এই মুহূর্তে বিলম্ব না করে অতিশীঘ্র মৎস্যরাজ বিরাটের বিপক্ষে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত।

কর্ণ ঃ কিন্তু রাজপুত্র উত্তর?

শকুনি ঃ উত্তর নাবালক, এই প্রবল পরাক্রমশালী শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সে একা কিছুই করতে পারবে না।

দুর্যোধন ঃ তবে আর বিলম্ব কেন? সৈন্য সামন্ত নিয়ে বিনা চিন্তায় আমরা মৎস্য রাজ্য আক্রমণ করি। বিরাট রাজার ওই বিশাল গরুর দল আর ধনরত্নে আমার বহুদিনের লোভ।

শকুনি ঃ আজ তোমার সেই স্বপ্ন পূরণ হবে ভাগ্নে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।

দুর্যোধন ঃ অন্য কথা?

দুঃশাসন ঃ কিরকম?

কর্ণ ঃ মামা কি এর মধ্যে কোন...

শকুনি ঃ দাঁড়াও, অপেক্ষা করো। রাজকার্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত অনুচিত। তার চেয়েও বেশ অনুচিত সন্দেহের বিষয়কে সন্দেহ না করা।

দুর্যোধন ঃ মানে?

শকুনি ঃ মানে, অজ্ঞাতবাস শেষ হতে তো মনে হয় এখনও কয়েকদিন বাকী আছে। ধরা যাক, যদি দেখা যায় গন্ধর্বরা রূপ পাল্টে পাণ্ডব হয়ে গেছে, কেমন হয় ভাগ্নে? (হাসতে হাসতে বিকৃত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(দুইদিক থেকে সুশর্মা ও বিরাট রাজের প্রবেশ)

সুশর্মা ঃ রাজা আর কেন যুদ্ধের শখ? এবার তো বন্দী হতে হবে?

বিরাট ঃ তুমি কি মনে করো সুশর্মা, বিরাটরাজ কোনো লুণ্ঠনকারীকে ভয় পায়?

সুশর্মা ঃ ভয়ের প্রশ্ন নেই রাজা। এবার প্রশ্ন সারাজীবন কৌরবের দাসত্ব করতে হবে কিনা।

বিরাট ঃ তার আগে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করবো, কিন্তু কখনই সেই দুরাত্মাদের বংশবদ হয়ে থাকবো না।

সুশর্মা ঃ বেশ তবে তাই হোক।

বিরাট ঃ হ্যাঁ আমি প্রস্তুত, সুশর্মা।

(যুদ্ধ চলতে থাকে) (যুদ্ধ করতে করতে পিছোতে থাকেন বিরাটরাজ)

সুশর্মা ঃ পালাচ্ছো কেন রাজা? পরাজয় তো তোমার নিশ্চিত। আমি তোমায় প্রাণে মারবো না। বন্দী করবো। (যুদ্ধ করতে করতে উভয়ের প্রস্থান)

(ছদ্মবেশে অর্জুন, ভীম ও সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব ঃ পার্থ, বিরাট রাজ নাকি পরাজিত হয়েছেন।

ভীম ঃ শুনলাম, সুশর্মা তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।

(দ্রুত যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির ঃ অর্জুন, তুমি দ্রুত যুদ্ধযাত্রা করো।

অর্জুন ঃ কিন্তু দাদা, এই ভাবে যুদ্ধে গেলে, কৌরবরা তো আমাদের চিনে ফেলবে।

ভীম ঃ তখন, আবার ১২ বছর বনবাস, ১ বছর অজ্ঞাতবাস।

সহদেব ঃ তাই তো, অজ্ঞাতবাসের সময় তো বোধহয় এখনো পূর্ণ হয়নি।

যুধিষ্ঠির ঃ আঃ তোমরা এখনো অযথা কালক্ষেপ কেন করছো? আমাদের কি হবে, তার চেয়ে বড় কথা আমাদের যিনি আশ্রয়দাতা তাঁকে রক্ষা করা। যাও পার্থ, আমার অনুরোধ এখনই যুদ্ধ যাত্রা করো। যেমন করে হোক, মুক্ত করো বিরাট রাজাকে। যাও।

অর্জুন ঃ আপনার আদেশ শিরোধার্য। আপনার সকলে উত্তরপাশে গিয়ে দ্বার রক্ষা করুন। আমি পূর্বপাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে আক্রমণ করব কৌরবদের। আর নিশ্চিত থাকুন, ফিরিয়ে আনবোই বিরাট রাজাকে। (সকলের প্রস্থান)

(যুদ্ধবাদ্য বাজছে, বাইরে মাঝে মাঝে চিৎকার হচ্ছে।)

(সুশর্মা বিরাট রাজকে বন্দী করে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে এসে উপস্থিত হয় অর্জুন। সুশর্মার সঙ্গে তার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়।)

অর্জুন ঃ রাজা, আপনি মুক্ত, আসুন আমার সঙ্গে।

বিরাট ঃ তুমি এত ভাল যুদ্ধ জানো বৃহন্নলা। অদ্ভুত ব্যাপার। সত্যি করে বল তো তোমার অন্য কোন পরিচয় আছে কিনা।

অর্জুন ঃ যুদ্ধক্ষেত্র এসব আলোচনার স্থান নয় রাজামশাই। দ্রুত চলুন। মহামতি ভীষ্ম আর আচার্য দ্রোণকে দেখতে পাচ্ছি। দ্রুত চলুন। আপনাকে অন্তরালে রেখে আমাকে এখুনি আবার আসতে হবে। (দ্রুত প্রস্থান)

(ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ)

ভীষ্ম ঃ কারা পালিয়ে গেলে, সাহস থাকে তো এক্ষুনি ফিরে এসো, যুদ্ধ করো আমাদের সঙ্গে। হস্তিনাপুরের দুই বৃদ্ধ সেনানায়ক আজ তোমাদের সামনে।

দ্রোণ ঃ ভয় নেই, আমরা কাউকে প্রাণে মারব না। কেবল বন্দী করে নিয়ে যাব।
(হঠাৎ একটি করে তীর এসে পড়ে ভীষ্মের ও দ্রোণের পায়ের কাছে।)

ভীষ্ম ঃ আচার্য, বুঝতে পারছ কি এমন নিখুঁত শরযোজনা কার পক্ষে সম্ভব?

দ্রোণ ঃ ধনঞ্জয়।

ভীষ্ম ঃ অবশ্যই, অর্জুন ছাড়া এমন শরলক্ষ্য কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

দ্রোণ ঃ আমি তাই ভাবছি, এমন করে সকলকে একা পরাজিত করার সামর্থ্য...

ভীষ্ম ঃ জানো দ্রোণ, খুব আনন্দিত, গর্বিত বোধ করছি। প্রথমত এতদিন পরে তাদের দেখা পেলাম। দ্বিতীয়ত, অর্জুনের কাছে পরাজয়। চলো আমরাও ফিরে যাই হস্তিনাপুরে।

সপ্তম দৃশ্য

(আলো জ্বলে উঠল। উদ্বিগ্ন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের প্রবেশ)

দ্রোণ ঃ বিরাট রাজার সঙ্গে যুদ্ধে কৌরবদের পরাজয় ঘটেছে।

ভীষ্ম ঃ অনিবার্য ভবিতব্য যা ছিল তাই হয়েছে আচার্য।

দ্রোণ ঃ যুদ্ধে প্রাণ গেছে অজস্র কৌরব সৈন্যের।

ভীষ্ম ঃ মূঢ়তার এই পরিণামও স্বাভাবিক।

দ্রোণ ঃ তাহলে কি এখনই আমাদের উচিত নয়, পুনরায় যুদ্ধের আগে দুর্যোধন, দুঃশাসনকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া।

ভীষ্ম ঃ সে সময় এখন অতিক্রান্ত। বহুদিন থেকে কৌরবদের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু সে কথায় তাদের কোনো কর্ণপাত নেই। যুদ্ধের নেশায় তারা উন্মত্ত।

দ্রোণ ঃ তারা কি জানে না দেবগণেরও অনেক আগে নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, এঁরা সুরাসুরের অজেয়।

ভীষ্ম ঃ তারা সবই জানে আচার্য। এও জানে পঞ্চপাণ্ডবের মত এমন বীর, বুদ্ধিমান পুরুষরাই এই নগরের মহারাজ হওয়ার যোগ্য।

দ্রোণ ঃ তাহলে কি আপনি এই যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে?

ভীষ্ম ঃ না দ্রোণাচার্য, আমি না কৌরব, না পাণ্ডব, কোনো পক্ষেরই সমর্থন করি না। এ যুদ্ধ আমার বড়ো বেদনার কারণ। কৌরব কিংবা পাণ্ডব এ যুদ্ধে পরাজয় যারই হোক, সবাই তো আমার স্বজন। তাই এ মুহূর্তে এই যুদ্ধের অবসান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নইলে...
(ক্রোধের সঙ্গে দুর্যোধন, দুশাসন, শকুনি ও কর্ণের প্রবেশ)

ভীষ্ম ঃ এ কি এত ক্ষিপ্ত কেন সকলে?

দুর্যোধন ঃ কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে বিরাট রাজা জয়লাভ করেছেন।

ভীষ্ম ঃ সেই জয়-পরাজয়ের খেলায় তো আমিও ছিলাম দুর্যোধন।

দুঃশাসন ঃ কিন্তু বিরাট রাজার এই জয়লাভের প্রকৃত কারণ কি আপনি জানেন?

ভীষ্ম ঃ জানি। এই জয়ের প্রধান হোতা ছিলেন অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব।

দুর্যোধন ঃ কিন্তু আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন, দ্যূতসভার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী পরাজিত পাণ্ডবদের ১২ বছর বনবাস ও ১ বছর অজ্ঞাতবাসের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

ভীষ্ম ঃ শাস্তি, না অন্যায়?

শকুনি ঃ না শাস্তিই। আর সেই ১৩ বৎসরের শাস্তি এখনও শেষ হয়নি, তাই প্রতিজ্ঞা মতো পঞ্চপাণ্ডবকে আবার ১২ বছর বনবাস ও ১ বছর অজ্ঞাতবাসের শাস্তি মেনে নিতে হবে। (হাসি)

ভীষ্ম ঃ মূর্খ শকুনি। জ্যোতিষ গণনায় সপ্তমীর অপরাহ্নেই পঞ্চপাণ্ডবের ১২ বছর বনবাস ও ১ বছর অজ্ঞাতবাসের শাস্তি পূর্ণ হয়েছে এবং তা নিশ্চিত জেনেই বুদ্ধিমান অর্জুন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করতে প্রকাশ্যে উপস্থিত হয়েছেন।

দুর্যোধন ঃ ভুল বলছেন পিতামহ। পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়ে এমন ভ্রান্তিতে আপনি দয়া করে আপনি আমাদের ফেলবেন না।

ভীষ্ম ঃ কোন পক্ষপাতের প্রশ্নই নেই। আমার গণনাকে ভুল বলে প্রতিপন্ন করতে চাওয়ার আগে নিজেরা ভাল করে গণনা করে এসো দুর্যোধন।

দুর্যোধন ঃ অবশ্যই তার করবো পিতামহ। কর্ণ, দুঃশাসন, তোমরা এখনই যাও, গণনাকারের কাছে। (দুঃশাসন ও করণের দ্রুত প্রস্থান)। মনে রাখবেন পিতামহ, যতই পাণ্ডবদের জন্যে আপনার হৃদয় বেদনায় উথলে উঠুক, আমার প্রাণ থাকতে কৌরব বংশ ওই পঞ্চপাণ্ডবের কাছে কোনদিন পরাজয় স্বীকার করবে না।

ভীষ্ম ঃ আর কত অসম্মান করবে আমায় দুর্যোধন। কেন বুঝতে পারছ না...

শকুনি ঃ আমরা সব কিছুই বুঝতে পারছি পিতামহ। কেন বিরাট রাজার সাথে যুদ্ধে পরাজয় ঘটল...

দ্রোণ ঃ সাবধান বাচাল। ভুলে যেও না, পিতামহ সমস্ত কটু কথা মেনে নিলেও এই বৃদ্ধ মহামতি ভীষ্মের কোন অপমান সহ্য করবে না।

দুর্যোধন ঃ আচার্য ক্রুদ্ধ হবেন না। কখনো কখনো মনের অভিমানে এই সব অনুযোগ বেরিয়ে আসে। আপনাদের উভয়ের প্রতিই আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আমরা কখনই বিশ্বাস করি না যে, যে পক্ষে ভীষ্ম আর দ্রোণ আছে সে পক্ষকে সমগ্র পৃথিবীতে কেউ পরাজিত করতে পারে।

শকুনি ঃ কিন্তু তবুও আমরা পরাজিত হই, এটাই দুর্ভাগ্য।

ভীষ্ম ঃ যদি কোন পক্ষে অর্জুন থাকে, তবে কারো সাধ্য নেই সে পক্ষকে হার মানায়।

দ্রোণ : আর তাছাড়া, কেবল রাজ্যলোভে নিজের ভাইদের সঙ্গে এই ধূর্ততা, এই প্রতারণা কেন?

ভীষ্ম : বৎস দুর্যোধন, ধর্ম ও অর্থ থেকে তোমার বুদ্ধি চ্যুত হয়েছে। তাই যদি এই মুহূর্তে আমার পরামর্শ গ্রাহ্য না কর তবে কৌরব বংশের দুর্দিন আসন্ন।

দ্রোণ : পাণ্ডবগণ ধর্মজ্ঞ, তাঁরা লোভী নন, তাঁরা রাজ্য লাভের জন্য অন্যায়ের পথ অবলম্বন করবেন না, তাই তোমাদের কর্তব্য...

শকুনি : যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা?

ভীষ্ম : হ্যাঁ, যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়া। অর্ধেক রাজ্যই তোমাদের জীবিকা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট, পাণ্ডবগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না এইভাবে।

দুর্যোধন : না না পিতামহ, এই অনুরোধ করবেন না। আবারো বলছি প্রাণ থাকতে এত সহজে আমি পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দেব না।

(কর্ণ ও দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন : হ্যাঁ দাদা, পিতামহের কথাই ঠিক। অজ্ঞাত বাসের সময় সদ্য শেষ হয়েছে।

শকুনি : আর সেটা একমাত্র জানতেন, পিতামহ।

দ্রোণ : স্তব্ধ হও শকুনি। বন্ধ করো তোমার ব্যঙ্গবাণ।

দুর্যোধন : ঠিক কথা পিতামহ, আচার্য। আমরা কথা বন্ধ করছি। কিন্তু কাজ আমরা করবই। বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবরা সামান্য ভূমিখণ্ডও নিজেদের কাছে নিতে পারবে না।

শকুনি : অতএব, যুদ্ধ...(হাসি) (সকলের প্রস্থান)

ভীষ্ম : দ্রোণাচার্য, দেখতে পাচ্ছো।

দ্রোণ : হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি পিতামহ।

ভীষ্ম : অনিবার্য এক যুদ্ধ আজ আমাদের সামনে। অসংখ্য অসহায় মানুষের রক্তে ভেসে যাবে আর্যাবর্তের মাটি।

দ্রোণ : সন্তানহারা জননী, স্বামীহারা বধূর আর্তবিলাপে মুখর হবে আকাশ-বাতাস।

ভীষ্ম : মহাপ্রাণের এ এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ।

দ্রোণ : মানববিদ্বেষের এ এক চরম পরিণাম।

ভীষ্ম : আমরা দুই অসহায় বৃদ্ধ তাতেই অংশ নিতে যাচ্ছি।

দ্রোণ : আমাদেরই রক্তে অন্তত ধুয়ে যাক এর যাবতীয় কলঙ্করেখা।

ভীষ্ম : না আচার্য। আমরা তা করতে পারব না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মহাযুদ্ধের এই রক্তাক্ত পথেই এসে দাঁড়াবেন এক যুগন্ধর পুরুষ। তিনিই মহাকাল। তিনিই আমাদের দিশারী। যুগে যুগে তিনি আসেন। আমরা তাঁকে চিনতে পারি না, বুঝতে পারি না; কিন্তু তিনি আসেন যুগে যুগে যুগান্তরের সম্ভাবনাকে নিয়ে। নিশ্চিত জেনো আচার্য এবারেও তিনি আসছেন। নতুন সকালের উদয়মন্ত্র শোনাবেন তিনি মহাযুদ্ধের ধর্মক্ষেত্রে।

অষ্টম দৃশ্য

(আলো জ্বলে উঠল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপ্রাঙ্গণে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ)

অর্জুন ঃ যুদ্ধ বড়োই পাপজনক, এতে তো দুই পক্ষেরই ক্ষতি।

কৃষ্ণ ঃ আমি তো তোমাকে বারবার বলছি পার্থ, অধর্মের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কখনোই পাপ নয়। যারা রাজ্যলোভে উন্মত্ত হয়ে নিজের স্বজনবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অন্যায় নয়, অধর্ম নয়।

অর্জুন ঃ কিন্তু এই সংকটকাল থেকে মুক্তি পেতে তবে যুদ্ধ ছাড়া কি আর কোনো বিকল্প পথ নেই?

কৃষ্ণ ঃ বিকল্প পথ।

অর্জুন ঃ হ্যাঁ, বিকল্প পথ। যুদ্ধের নৃশংসতায় যেখানে মানুষের রক্তপাত হবে না। নিজের ভাইয়ের হাতে আর এক ভাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে না।

কৃষ্ণ ঃ তুমি কি ভুলে যাচ্ছো অর্জুন, যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্যই একসময় পাণ্ডবগণ সন্ধি স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিল, অথচ তা অস্বীকার করেছিল লোভী কৌরবরা?

অর্জুন ঃ হ্যাঁ ঠিক, মনে আছে। শান্তি স্থাপনের জন্য আমরা সন্ধিবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পাঠিয়েছিলাম তোমাকেই সখা।

(ফ্রিজ। আলো বন্ধ। ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে যায় আবার)

নবম দৃশ্য

(আলো জ্বলে উঠল। পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির ঃ অর্জুন, এখনো তো, সখা কৃষ্ণ এসে পৌঁছোলো না।

অর্জুন ঃ দুশ্চিন্তা করবেন না, মনে হয় এখনই তিনি এসে যাবেন।

ভীম ঃ কৌরবদের সঙ্গে এই পর্বে আমাদের আলোচনার ব্যাপারে তুমি কি তাঁকে আমাদের ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলে?

নকুল ঃ আমিই পূর্বাহ্নেই সেকথার আভাস তাঁকে দিয়েছিলাম।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ ঃ কী ব্যাপার প্রথম পাণ্ডব, এত উদ্বিগ্ন তোমরা সবাই?

নকুল ঃ উদ্বেগের কারণ তো তোমার অজানা নয় সখা।

শ্রীকৃষ্ণ ঃ জানি। দুরন্ত কৌরবরা এক দুর্যোগের বীজ বপন করতে চাইছে।

যুধিষ্ঠির ঃ কিন্তু, তুমি তো জানো বাসুদেব, আমরা সকলেই। সেই দুর্যোগ এড়িয়ে যেতে চাইছি।

অর্জুন ঃ সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের এই যে, পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়েই শান্তি কামনা করছেন। পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে তিনি নিজের স্ব-ধর্মকে বিসর্জন দিতে বসেছেন।

ভীম ঃ আসলে শকুনি, দুঃশাসন, দুর্যোধনরাই তাঁকে বিপথে পরিচালিত করছে।

যুধিষ্ঠির ঃ জনার্দন, কৌরবদের অত্যাচারে আমি আজ আমার মা ভাইদের নিরাপদে থাকার ভরসাটুকু দিতে পারছি না, এর চেয়ে বড়ো দুঃখ আর কি আছে বলুন।

কৃষ্ণ ঃ রাজ্যলোভে কৌরব বংশ এখন উন্মত্ত, তাই...

নকুল ঃ কিন্তু পাণ্ডবগণ কোনোদিনই রাজ্যলোভ করেনি। আমরা শুধু তাদের কাছে পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেছিলাম কিন্তু দুরাত্মা দুর্যোধন তাও দিতে রাজি হননি।

ভীম ঃ তবে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার তো আমরাও এতো সহজেই ছেড়ে দেব না। বরং তা উদ্ধারের চেষ্টায় যদি আমাদের সকলের মৃত্যু হয়, তবে তাও ভালো।

কৃষ্ণ ঃ শত্রুতার দ্বারা শত্রুতার নিবৃত্তি হয় না, বরং বৃদ্ধি হয়। যাঁরা সজ্জন ধীর ও দয়ালু তাঁরাই যুদ্ধে মরেন, আর বেঁচে থাকে শত নিকৃষ্টজন। তাছাড়া রাজ্যলোভে নিজ বংশ বিনাশের চেষ্টা? এতো অন্যায়।

যুধিষ্ঠির ঃ না, জনার্দন, আমরা রাজ্য ভোগ করতে চাই না, আর কুলক্ষয়ও চাই না। তাই আমরা সর্বতোভাবে সন্ধির চেষ্টা করব। আর সখা, সেই কাজের ভার তোমাকে নিতে হবে।

কৃষ্ণ ঃ আমাকে? বল কি যুধিষ্ঠির?

ভীম ঃ কিছু মনে কোরো না সখা। সখা বলেই তোমার উপর আমাদের এই দাবী।

অর্জুন ঃ আমাদের সকলের বিশ্বাস, তুমি যদি একবার হস্তিনাপুর উপস্থিত হও, তাহলে তোমাকে দেখে, পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ সকলেই দুর্যোধনদের বাধ্য করবেন, আমাদের এই ক্ষুদ্র দাবীটুকু মেনে নিতে।

নকুল ঃ হ্যাঁ সখা, শুধু আমাদের দিকে নয়, এই সমগ্র ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আসন্ন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বন্ধ করার জন্যেই, আজ তোমাকে এই ভার গ্রহণ করতে হবে।

কৃষ্ণ ঃ উত্তম। যদি তোমাদের মনে হয়, আমাকে দিয়ে এই কাজ সম্ভব হতে পারে, নিশ্চয়ই আমি যাব। যদি উভয়পক্ষের স্বার্থহানি না করে আমি শান্তি স্থাপন করতে পারি তবে আমারো মহাপুণ্য লাভ হবে।

অর্জুন ঃ কিন্তু!

কৃষ্ণ ঃ কিন্তু কি অর্জুন?

অর্জুন ঃ যদিও আমরা চাইছি, তুমিই যাও সখা এই কাজে, কিন্তু আবার এও মনে হচ্ছে যে, দুর্যোধন সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব অস্বীকার করে যদি আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করে তবে তা আমাদের কাছে অত্যন্ত কষ্টকর হবে।

কৃষ্ণ : অর্জুন, দুর্যোধন পাপী তা আমি জানি, কিন্তু আমি যদি সন্ধি স্থাপনের বার্তা নিয়ে তার কাছে যাই তবে অন্য কোন লাভ না হলেও মানুষ অন্তত আমাদের যুদ্ধপ্রিয় বলে দোষ দেবে না, আর আমাকে ক্রুদ্ধ করার দুঃসাহস নেই ওই কৌরবগণের।

যুধিষ্ঠির : তোমার যা অভিরুচি, তুমি সেই মতোই কাজ কোরো সখা। আর তুমি যে এতে কৃতকার্য হয়ে নিরাপদে ফিরে আসবে—সে আস্থা আমাদের সকলেরই আছে।

কৃষ্ণ : কিন্তু কৌরবগণ সন্ধি করবেন এমন আস্থা আমার নেই। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণাচার্যের ভরসায় তারা নিজেদের প্রবল শক্তিশালী বলে মনে করেছে। তাই পাণ্ডবগণের এই প্রস্তাব তারা মেনে নিতে রাজি হবে না কখনোই।

ভীম : তুমি এমনভাবে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করবে, যাতে উভয়পক্ষেরই ভালো হয়। দুর্যোধন অসহিষ্ণু, ক্রোধী কিসে ভাল হয় তা বোঝে না। আমরা বরং হীনতা স্বীকার করব, কিন্তু ভরতবংশ যেন বিনষ্ট না হয়। তুমি পিতামহ ভীষ্ম ও সভাসদ্‌দের বোলো যে, তাঁরা যেন দুর্যোধন দুঃশাসন, মামা, শকুনিকে শান্ত করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়।

কৃষ্ণ : আশ্চর্য ভীম! একদিন তুমিই না, ভাইদের কাছে গদা স্পর্শ করে শপথ করেছিলে, গদাঘাতে দুর্যোধনকে বধ করবে? অথচ আজ যুদ্ধের মুহূর্তে তোমার মুখে এই মধুর বচন?

ভীম : না আসলে, অযথা হত্যা-হানাহানি, রক্তক্ষয় থামাতে আর সৌহার্দ্য ও ভরতবংশের রক্ষার জন্যই আমার এই শান্তিকামনা।

অর্জুন : আমার বোধ হয় যে, দুর্যোধন ও শকুনির লোভ এবং আমাদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য শান্তিস্থাপন সুসাধ্য হবে না, তবে সম্যক যত্ন করলে যে কোনো কাজই তো সফলতা লাভ করতে পারে।

কৃষ্ণ : পুরুষকার ছাড়া কাজে সফলতা লাভ হয় না। তাই কথা ও কাজে যেটুকু সাধ্য, আমি তাই করব।

নকুল : সখা যা কালো চিত মনে করবে, তাই কোরো।

যুধিষ্ঠির : জনার্দন, তুমি কৌরব সভায় গিয়ে প্রথমে মৃদুবাক্যে বোঝাবে, প্রয়োজনে ভয় দেখাবে। আশা করি, সব দেখে শুনে কৌরববংশ অবশ্যই বুঝবে কিসে তাদের শ্রেয় হবে। (সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব : আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন আপনারা।

যুধিষ্ঠির : আরে এসো এসো কনিষ্ঠ পাণ্ডব। আমার তো মনেই ছিল না যে তুমি পাঞ্চালীর কাছে গিয়েছিলে। পাঞ্চালী এখন কুশল তো।

সহদেব : তিনি শারীরিক কুশলেই আছেন। কেবল সমস্ত পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে এবং সখা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তিনি কিছু নিবেদন পাঠিয়েছেন; আমাকেই তা জানাতে বলেছেন আপনাদের।

অর্জুন : নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, তুমি তো প্রতিনিবেদন করো সহদেব।

সহদেব ঃ সখা পাঞ্চালী জানেন, আপনি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছেন আজ কৌরব রাজসভায়। তিনি শুধু তোমাকে জানাতে বলেছেন যে আশা করি জনার্দন ভুলে যান নি, কেমন করে কৌরবরা তাঁর সম্মানহানি ঘটিয়েছিল রাজসভার সকলের সামনে।

কৃষ্ণ ঃ আমার তা খেয়াল আছে সহদেব?

সহদেব ঃ পাঞ্চালী জানিয়েছেন, তাই যখন আপনি দূত হয়ে তাঁদের আবেদন জানালেন পাঁচটি গ্রামের জন্যে অবশ্যই মনে করবেন দুরাত্মা দুঃশাসনের কথা, যে এক দাসীর মত কেশপাশ আকর্ষণ করে সেদিন পাঞ্চালীকে নিগ্রহ করেছিল।

ভীম ঃ তুমি কি বলছ সহদেব?

সহদেব ঃ আমায় ক্ষমা করবেন মধ্যম পাণ্ডব। একদিকে ক্রোধাগ্নিতে উজ্জ্বল আঁখি, আর একদিকে নিজের অতীত দুর্দশার চিন্তায় অশ্রুসজল পাঞ্চালী অবাক হয়ে গেছেন শুনে যে মহাবলশালী ভীমসেনও নাকি চাইছেন যুদ্ধ বন্ধ হোক, এই ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর গাণ্ডীবীও নাকি চাইছেন শান্তি আসুক। তাঁরা কি সকলেই ভুলে গেলেন, তাঁদেরই চোখের সামনে একদিন ঘটে যাওয়া সেই মহা ভয়ানক দৃশ্যটিকে? পঞ্চপাণ্ডবের মত স্বামী তাঁর, তিনিই আজ কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না, তাঁর এ দুর্ভাগ্যের শেষ কোথায়? তিনি প্রস্তুত আছেন, নিজের পঞ্চপুত্র আর বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে পাপিষ্ঠ দুর্যোধন-দুঃশাসনদের শাস্তিবিধানের জন্যে। সখা শান্তির কথা বলার সময়ে সেই হতভাগিনী মহীয়সী নারীর কথা ভুলে যেও না কিন্তু। যুধিষ্ঠির ভুলতে পারেন, ভীমসেন ভুলতে পারেন, অর্জুন ভুলতে পারেন, কিন্তু পাঞ্চালীর গভীর বিশ্বাস, এই জগতের যিনি শঙ্কাহরণ, পতিতপাবন, যিনি যজ্ঞবেদী থেকে উত্থিতা দ্রুপদনন্দিনীর শেষ আশ্রয়, তিনি অন্তত এই নাথবতী অনাথবৎ সীমন্তিনীকে ভুলবেন না।

কৃষ্ণ ঃ বেশ তাই হবে সহদেব। পাঞ্চালীকে তুমি জানিয়ে দিও, মানবের কর্মের ধারা অজ্ঞাত, কর্মতত্ত্বও অজ্ঞাত। নরদেহে প্রারব্ধ স্বাভাবিক, সেই প্রারব্ধবশেই আমাকে যেতে হবে কৌরবসভায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু আমি কখনই ভুলে যাব না, সেই দুর্দিনের দৃশ্যটিকে আমি কখনোই ভুলে যাবো না, ভারত-ইতিহাসের এই মহীয়সী দ্রৌপদীকে, জানিয়ে দিও তাকে, তার সখা কৃষ্ণ বলছে তাকে বিনতি করে, কৃষ্ণা তুমি অশ্রুসংবরণ করো, নিশ্চিত জেনো অধর্মের বিনাশ অনিবার্য, শীঘ্রই তুমি দেখতে পাবে রাজ্যশ্রী তোমারই করতলগত।

দশম দৃশ্য

(কোনো একটি বিষয় আলোচনা করতে করতে মঞ্চে দ্রুত প্রবেশ করল শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ)

দুঃশাসন ঃ আপনি ঠিক জানেন মামা, যে আজকেই তিনি আসছেন?

শকুনি ঃ অবশ্যই ঠিক জানি।

দুর্যোধন ঃ হ্যাঁ, আমিও গুপ্তচরের মাধ্যমে খবরটা পেয়েছি।

কর্ণ ঃ কিন্তু বুঝতে পারছি না, খবরটা সোজাসুজি আমাদের কাছে কেন এসে পৌঁছুল না।

দুঃশাসন ঃ এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে।

কর্ণ ঃ অথবা ইচ্ছে করে অপমানের বাসনা।

দুর্যোধন ঃ জানে না যে, দুর্যোধন কোন ধাতুতে গড়া।

শকুনি ঃ বাছা, এইবার একটু বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। ওদের সমস্ত অহঙ্কারের মূলে তো এই লোকটাই।

কর্ণ ঃ কিন্তু মনে রাখবেন মামা, ও কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

দুঃশাসন ঃ নানারকম দুর্বুদ্ধিও আছে ওর।

শকুনি ঃ শকুনির কাছে কিন্তু শিশু। যাক্ আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তোমাদের যা বললাম মনে রইল তো?

দুর্যোধন ঃ হ্যাঁ, কর্ণ আর দুঃশাসন, তোমরা তাহলে প্রস্তুত থাকবে, আমি ডাকলেই যাতে কাজ হাসিল করা যায়।

শকুনি ঃ আমরাও কিন্তু এখন বাইরেই থাকব ভাগ্নে, যথাসময়ে প্রবেশ।

দুর্যোধন ঃ নিশ্চয়ই মামা। চল সবাই (সকলের দ্রুত প্রস্থান)

(অপরদিক দিয়ে ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ)

দ্রোণ ঃ পিতামহ আপনি ঠিক জানেন যে কৃষ্ণ এখনই আসবেন?

ভীষ্ম ঃ অবশ্যই। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তো আমাকে সেই কথাই জানিয়েছেন।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ ঃ আমার অভিবাদন গ্রহণ করবেন পিতামহ, আচার্য দ্রোণ।

ভীষ্ম ঃ স্বস্তি।

দ্রোণ ঃ স্বস্তি।

কৃষ্ণ ঃ আপনাদের সব কুশল তো। হস্তিনাপুরের সকলে ভাল আছেন তো?

ভীষ্ম ঃ সব যে কুশল তা বলতে পারি না জনার্দন, তবে চলে যাচ্ছে।

দ্রোণ ঃ বাণপ্রস্থের সময় হল, তাই এখন রাজপ্রাসাদের চেয়ে অরণ্যই আকর্ষণ করে বেশী বাসুদেব।

কৃষ্ণ ঃ আপনারা যতদিন সুস্থ শরীরে কর্মক্ষম থাকবেন, ততদিনই জগতের কল্যাণ। কিন্তু কই, আমার কৌরব ভাইদের তো দেখছি না।

ভীষ্ম ঃ তারা নিশ্চয়ই এসে যাবে। আশা করি সকলেই তোমার আগমনের কথা জানে কেশব।

(দুর্যোধন ও শকুনির প্রবেশ)

দুর্যোধন ঃ না পিতামহ, এই আগমনের কথা আমাকে কেউ জানায়নি। তবে আমি জেনেছি।

শকুনি ঃ কিন্তু জানতে পারিনি, হঠাৎ করে এই আভীরসন্তান রাজপুরীতে কেন?

দ্রোণ ঃ শকুনি, আশা করি তোমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়নি। অন্তত কীভাবে অতিথির সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, তা তুমি ভুলে যাওনি।

কৃষ্ণ ঃ দুশ্চিন্তা করবেন না আচার্য। আমি এতে কিছু মনে করিনি।

দুর্যোধন ঃ কিন্তু আমাদের প্রশ্নের উত্তর তো দিলে না কেশব।

ভীষ্ম ঃ আগে অতিথির সৎকারের আয়োজন করো দুর্যোধন।

শকুনি ঃ তাহলে তার আগে জানা দরকার উনি অতিথি কিনা।

দ্রোণ ঃ স্তব্ধ হও শকুনি। পিতামহের আদেশ লঙ্ঘন কোরো না।

শকুনি ঃ আমি তো জানি, পিতামহ এবং আচার্য—দুজনেই ভাগ্নে দুর্যোধনের অন্নে পুষ্ট।

ভীষ্ম ঃ সেটাই আমাদের একমাত্র পাপ।

দুর্যোধন ঃ বাজে কথায় আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও কেশব।

কৃষ্ণ ঃ ক্রুদ্ধ হোয়ো না ভাই। তোমার পাণ্ডব ভাইরা আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন একটি ক্ষুদ্র অনুরোধ নিয়ে।

শকুনি ঃ ক্ষুদ্র অনুরোধ নিয়ে এমন একজন বড় লোককে পাঠালেন তাঁরা, বিচিত্র!

দ্রোণ ঃ পিতামহ, আমার আর সহ্য হয় না। কেশব তুমি চলে যাও এখান থেকে। কেন দাঁড়িয়ে আছ এই অসম্মান সহ্য করে?

কৃষ্ণ ঃ আপনি বিচলিত হবেন না আচার্য। আমি কিছুই মনে করছি না। পাণ্ডবরা প্রায় সকলেই আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে যে আমি যেন কৌরবদের শান্ত ও মৃদুভাবে বোঝাবার চেষ্টা করি।

ভীষ্ম ঃ শুনছ দুর্যোধন, শুনছ শকুনি, এত অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করেও পাণ্ডবরা তোমাদের প্রতি কত ক্ষমাশীল।

দুর্যোধন ঃ পিতামহ, আচার্য, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে আপনারা এতটা পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত করছেন কেন?

কৃষ্ণ ঃ ভাই রাগ করো না। শান্ত হও।

শকুনি ঃ তোমার উপদেশ শোনার ইচ্ছা ও সময় কোনোটাই আমাদের নেই। তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কী, সেটা জানাতে পারবে কী?

কৃষ্ণ ঃ মাতুল, আমাদের সবিনয় নিবেদন ভ্রাতা দুর্যোধনের প্রতি। ভাই দুর্যোধন, প্রথমপাণ্ডব যুধিষ্ঠির আন্তরিক ভালোবাসা নিবেদন করে এই অনুরোধ জানিয়েছেন যে, সমগ্র ইন্দ্রপ্রস্থ তাঁদের চাই না, তাঁরা তাঁদের পাঁচ ভাইয়ের জন্যে পাঁচটি গ্রামমাত্র পেলেই সন্তুষ্ট থাকবেন।

দুর্যোধন ও শকুনি ঃ (হাস্য)

ভীষ্ম ঃ এতটুকুতেই সন্তুষ্ট পাণ্ডবরা?

দ্রোণ ঃ দুর্যোধন, মনে হয়, এই প্রস্তাবে আমাদের সম্মতি জানানোই উচিত।

শকুনি ঃ অসম্ভব।

দুর্যোধন ঃ আমাদের অধিকার আমরা কোনমতেই ছাড়তে পারব না।

কৃষ্ণ ঃ ভাই, তারা তো মাত্র পাঁচটি গ্রাম চেয়েছে।

দুর্যোধন ঃ মনে রেখো কেশব, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও পাণ্ডবরা পাবে না।

ভীষ্ম ঃ মূর্খ বালক, বুঝতে পারছ না কোন্ সর্বনাশ তুমি ডেকে আনছ।

দ্রোণ ঃ সাবধান হও দুর্যোধন, দুষ্ট লোকের দ্বারা ভুলপথে পরিচালিত হোয়ো না।

শকুনি ঃ আচার্য, পিতামহ, ভুলে যাবেন না, আপনারা কেবল পরান্নভোজী।

ভীষ্ম ঃ হতে পারি পরান্নভোজী, কিন্তু, কৌরববংশের আসন্ন বিনাশের দিকে তাকিয়েই আমরা সদুপদেশ দিতে চাই সন্তানতুল্য দুর্যোধনকে।

কৃষ্ণ ঃ আর একটিবার ভেবে দেখো সখা। আমাকে এভাবে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিও না।

দুর্যোধন ঃ ভাবা আমাদের হয়ে গিয়েছে কেশব।

শকুনি ঃ তবে তোমাকে শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার কষ্ট করতে হবে না।

দ্রোণ ঃ এর অর্থ?

শকুনি ঃ ভাগ্নে, ভুলে গেলে নাকি?

দুর্যোধন ঃ না ভুলিনি। কেশব, মনে রেখো, পাণ্ডবরা কোনোদিন যুদ্ধ ছাড়া সামান্য মাটিও পাবে না আর তুমিও কোনোদিন ফিরে যেতে পারবে না তোমাদের প্রিয় পাণ্ডবদের কাছে?

ভীষ্ম ঃ কী বলছ তুমি মূর্খ?

দ্রোণ ঃ আবারো বলছি, সাবধান হও দুর্যোধন, নিজের অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন কোরো না।

কৃষ্ণ ঃ আমাকে নিয়ে তুমি কী করতে চাও সখা?

শকুনি ঃ ভাগ্নে, তুমি অযথা বিলম্ব করছ কেন? আমাদের তো অন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।

দুর্যোধন ঃ দুঃশাসন, কর্ণ, কোথায় তোমরা? (দুঃশাসন ও কর্ণের দ্রুত প্রবেশ)

দুঃশাসন ঃ আমরা প্রস্তুত যুবরাজ।

দুর্যোধন ঃ তাহলে, বন্দী করো এই দুরাত্মাকে।

ভীষ্ম ও দ্রোণ ঃ উন্মাদ, স্তব্ধ হও।

কৃষ্ণ ঃ কাকে বন্দী করতে চাও তোমরা, আমাকে?

শকুনি ঃ কর্ণ, দুঃশাসন তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আদেশ পালন করো।

কৃষ্ণ ঃ কী আমাকে বন্দী করবে তোমরা? এত তোমাদের দুঃসাহস? সামান্য পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিল পাণ্ডবরা, তাও তোমরা দিতে পারলে না। আবার তোমরা পরিকল্পনা করছ আমাকে বন্দী করার। বেশ বন্দী করো আমাকে। কোথায় তোমাদের শৃঙ্খল? নিয়ে এসো। কোথায় তোমাদের কারাগার? নিয়ে চলো আমাকে। মনে রেখো, কংস কারাগারে আমার জন্ম। তবুও কারগারে আমাকে ধরে রাখতে পারেনি। দেখি কোন্ শিকল বাঁধতে পারে আমাকে। তোমাদের কোন্ কারাগার ধরে রাখতে পারে আমাকে? কত তোমাদের সাধ্য? কত তোমাদের শক্তি? বন্দী করো, বন্দী করো আমাকে। হাঃ হাঃ হাঃ।

ভীষ্ম ঃ শান্ত হও কেশব, তোমার এই ক্রুদ্ধ রূপ আমরা সহ্য করতে পারছি না।

দ্রোণ ঃ হে জনার্দন, দয়া করো। শান্ত হও।

কৃষ্ণ ঃ পিতামহ, আচার্য, আমি শান্তই আছি। আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু, মনে রেখো দুর্যোধন, মনে রেখো শকুনি, যে আগুনের শিখা তোমরা আজ জ্বালিয়ে দিলে, একদিন পতঙ্গের মত তাতে দগ্ধ হবে তোমরাই। যে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের কোন প্রয়োজন ছিল না, তাকে তোমরাই করে তুললে অনিবার্য। ধ্বংস তোমাদের অনিবার্য। প্রস্তুত হও দুর্যোধন, প্রস্তুত হও শকুনি ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ধর্মাধর্মের এই অপরিহার্য লড়াইয়ের জন্যে। আর জেনে রাখো, যেদিকে ধর্ম সেদিকে জনার্দন। আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যেদিকে ধর্ম, সেদিকে জয়শ্রী। প্রস্তুত হও দুর্যোধন, প্রস্তুত হও।

একাদশ দৃশ্য

মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় কৃষ্ণ। নত হয়ে বসে অর্জুন।

নেপথ্যে ঃ ভারতের উদয়াচলে আবির্ভূত হলেন শ্রীকৃষ্ণ।
আহ্বান করলেন পার্থকে ঃ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

অর্জুন সাড়া দিলেন সেই আহ্বানে। বুঝতে পারলেন অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা আসলে যুগাবতার ভগবান কৃষ্ণেরই ইচ্ছাপ্রসূত। মেনে নিলেন সেই অনিবার্য ভবিতব্যকে।

নষ্টমোহঃ স্মৃতির্লব্ধঃ তৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত।
স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচং তব।।

যুদ্ধার্থে উঠে দাঁড়ালেন অর্জুন। নিশ্চিত হল ভারতের তৃণাস্তীর্ণ ভূমিতলে ধর্মের জয়।

যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।

কল্পশব্দদ্রুম!

একাঙ্ক নাটক

অর্করূপ গঙ্গোপাধ্যায়
স্নাতক বাংলা, দ্বিতীয়বর্ষ

চরিত্র ঃ
(কবিতা) 'আবোলতাবোল ঃ ভীষ্মলোচন শর্মা
'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম'-এর কুশীলবরা
'বিজ্ঞান শিক্ষা'-র বিজ্ঞানী
'আহ্লাদী'রা
হুঁকোমুখো হ্যাংলা
রামগরুড়ের ছানা
কাঁদুনে ও তার মা
'খুড়োর কল'-এর চন্ডীদাসের খুড়ো
'চোর ধরা'-র পাহারাদার
'গোঁফ চুরি'-র বড়োবাবু
কুমড়োপটাশ
কাতুকুতু বুড়ো
'ন্যাড়া বেলতলায় যায় কবার'-এর রাজা
'নোটবই'-এর লোকটি
(গল্প) 'হযবরল'-ব্যাকরণ শিং
হিজিবিজ্‌বিজ্
ন্যাড়া
কাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে
বেড়াল
পাগলা দাশু
সবজান্তা
'পেটুক'-এর হরিপদ
'ডিটেকটিভ'-এর জলধর
'ভোলানাথের সর্দারি'-র ভোলানাথ
প্রোফেসর হেঁশোরাম হুঁশিয়ার
'আশ্চর্য কবিতা'-র শ্যামলাল
(নাটক) 'ঝালাপালা'-র কেবলচাঁদ ওস্তাদ
পণ্ডিতমশাই
'অবাক জলপান'-এর পথিক
এবং
যাবতীয় গল্প ও কবিতার 'আমি'

দৃশ্যপট

(মঞ্চের ওপর সতরঞ্চি পাতা, সেখানে বসে ভীষ্মলোচন শর্মা আর কেবলচাঁদ ওস্তাদ গান গাইছে। তাদের গানে আকাশ ফাটার দশা। সারা মঞ্চে উজ্জ্বল নীল আলো, কালো পর্দা পিছনে একটা বিরাট বইয়ের প্রতিকৃতি। ভীষ্মলোচন হঠাৎ থেমে গেলো।)

কেবল ঃ আবার কি হলো?

ভীষ্ম ঃ (ঢোক গিলে) না মানে ইয়ে...ওই ছাগলটা নেই তো?

কেবল ঃ কে ছাগল? হচ্ছিলো মালকোষ, কোত্থেকে ছাগল ধরে আনলো! ধ্যুৎ!

ভীষ্ম ঃ (কোমরে হাত মুখে যন্ত্রণার ছাপ) ওফ্‌ফ্‌! যা জোর গুঁতিয়েছিলো! কখন এসে কি করে বসবে...তাই...

কেবল ঃ আরে যা যা!! কিস্যু হবে না। সে ব্যাটা বোধহয় ঘাস খাচ্ছে, নে নে গান ধর্‌!

(তুমুল শব্দদূষণসহ গান শুরু হলো। এমন সময় 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম'-এর কুশীলবরা এসে হাজির।)

১ম ঃ দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম!

২য় ঃ দেড়ে দেড়ে দেড়ে!!

৩য় ঃ হাজির!!

৪র্থ ঃ (হাতের বাজনা দেখিয়ে) এই দ্যাখোনা তবলা-ডুগি ধিন্ তাক ধিন্ ধেরে...

সবাই ঃ দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!

(ভীষ্মরা খুব খুশি হয়ে ওদের বসায়, সবাই মিলে প্রচণ্ড জলসা শুরু করে। হঠাৎ একটা গর্জনের শব্দ, সবাই চুপ। দুম দুম করে হাতে একটা বিকট যন্ত্র নিয়ে 'বিজ্ঞান শিক্ষা'র বিজ্ঞানী ঢোকে।)

বিজ্ঞানী ঃ আমি তখন থেকে এই কিম্ভূতোগ্রাফ যন্ত্রটা নিয়ে পাথরের সাথে নুড়ির অ্যাক্সিলারেশন মাপার চেষ্টা করছি, তোমাদের এই মারাত্মক জলসাটা দয়া করে বন্ধ করো...নইলে ছাগল লেলিয়ে দেবো। যত্তো সব ইন্টেপারশন!

(এক কোণে গিয়ে সে আবার কাজে মগ্ন হলো, গাইয়েরা চুপ। ওদিকে ভীষ্ম ছাগল শুনে আঁতকে উঠলো। কেবল মুখ বেঁকালো।)

কেবল ঃ ইঃ! লেলিয়ে দেবো! কই দে দেখি...একটু গানবাজনা করছি তাও দেবে না! আপদ! মারবো একটা সপাট তান সব ঠিক হয়ে যাবে! পাগল কোথাকার!

১ম ঃ (দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম) হোক না পাগল হোক না ছাগল হোক না বৈজ্ঞানিক,
থাক না ওর ঐ লম্ফঝম্প ম্যানেজ করবো ঠিক।
এই দ্যাখো না গলার ভেতর গানটি ওঠে তেড়ে...

সবাই ঃ (চেঁচিয়ে) ইয়াঃ! দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!

(আবার গান শুরু হলো। বিজ্ঞানী দাঁত খিঁচিয়ে যন্ত্র বাগিয়ে ওদের দিকে তেড়ে গেলো, গাইয়ের দল গাইতে গাইতে পিছু হটলো। মারতে যাবে হঠাৎ হো হো করে হাসির শব্দ। সবাই উইংসের দিকে এসে উঁকি মারতে লাগলো, 'আহ্লাদী'রা ঢুকলো হাসতে হাসতে।)

সবাই ঃ আবার এতো হাসির কী হলো?

আহ্লাদীরা ঃ হাসছি দেখে তবলা-ডুগি হাসছি দেখে সঙের দল,
নাই বা বুঝি হাসছি কেন হাসবো তবু খলর খল! হো হো!!!

বাকিরা ঃ (প্রচণ্ড ক্ষেপে) আমরা সঙ! মেরে ঠিক করে দেবো। এই বিজ্ঞানী তোমার যন্ত্রটা কোথায় হে? দাও তো দেখি!

(আহ্লাদীদের হাসির চোটে ওদের রাগারাগি চাপা পড়ে যায়, বেজায় খুশি হয়ে কাতুকুতু বুড়ো ঢোকে, একহাতে পালক আরেক হাতে বই। সঙ্গে সঙ্গে সব স্থির শুধু আহ্লাদীরাই হাসতে থাকে ফিক ফিক করে।)

ভীষ্ম ঃ (কেবলের গা টিপে) ওরে! হাত পা কাঁপছে যে রে, এর থেকে তো ছাগলটাও ভালো ছিলো!

কেবল ঃ (ফিসফিসিয়ে) তবলাগুলো তুলে নে। ওদের বল্ এক্ষুণি না পালালে বিপদ...

ভীষ্ম ঃ হুঁ, পালক দিয়ে খোঁচা দেবে!! (কুশীলবদের) এ্যাই তবলটা তুলে নে...পালাবো...!!

(কুশীলবরা তাড়াহুড়ো করে তবলা তুলতে গিয়ে পড়ে গিয়ে কেলেঙ্কারি করে বসে, আহ্লাদীরা আরো হাসতে থাকে আর কাতুকুতু বুড়ো হাসতে দেখে খুব খুশি হয়। কিন্তু ভীষ্মদের মুখে হাসি না দেখে যেই না হাতে পালক নেওয়া অমনি গাইয়েরা পড়িমড়ি করে পালালো। আহ্লাদীদের অট্টহাসি সমানে চলছে, কাতুকুতু বুড়ো বেশ মৌজ করে দাঁড়িয়ে হাসিটা উপভোগ করতে লাগলো। হঠাৎ হাসির শব্দ ছাপিয়ে গগনভেদী কান্নার শব্দ উঠলো। বুড়ো কান চাপা দিলো।)

বুড়ো ঃ ওরে বাবা! 'কাঁদুনে' যাচ্ছে, কান ফাটিয়ে ছাড়বে...(আহ্লাদীদের) ওই তোরা ওর মাকে বল্ ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে...ওফ্ এ্যাতো জোর গলা কোনো বাচ্চার হয়! উনি যে কাদের তৈরি করে গেলেন, এদের সঙ্গে থাকতে হয়!!

(আহ্লাদীরা উইংসের কাছে গিয়ে হাত নেড়ে কিছু বললো, কান্নার শব্দে কিছুই শোনা গেলো না কিন্তু শব্দটা কমে এসে মিলিয়ে গেলো। বুড়ো পালকটা দিয়ে কান পরিষ্কার করতে শুরু করলো, আহ্লাদীরা ফিক ফিক করেই চলেছে। হাতে 'হাসি নিষেধ' বোর্ড নিয়ে রামগরুড়ের ছানা ঢুকলো।)

রা.ছা. ঃ 'রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায় নিষেধ সেথায় হাসা।'
কথাটা পরিষ্কার হলো? (মুখ বেঁকিয়ে) সব হাসির লোকগুলো এসে জুটেছে। এখনো মুখে হাসি?

বুড়ো ঃ যাই বলো না কেন তোমার চেহারাটা দেখে হাসি পাবেই, কিছু মনে করো না ভাই আর আমাদের তো জানোই!

আহ্লাদীরা ঃ হ্যাঁ!! হিঁ হিঁ হিঁ!!

রা.ছা ঃ (চোখ পাকিয়ে) বলছি না হাসি নিষেধ, বুকে খামচে ধরে...ওরে বাবা...(বুক চেপে ধরে)...তবেরে...(হাতের বোর্ডটা নিয়ে তেড়ে যেতেই সবাই হাসতে হাসতে পালায়।) কি জ্বালা! একটু নিরিবিলি পাবার যো আছে? (নেপথ্যে ভেসে আসে 'নেইই তো') কে? কে বললো কথাটা?

(ভীষ্মরা আবার সদলে আসে।)

কেবল ঃ দ্যাখো দিকি! একটু গান-বাজনা করার উপায়ও নেই!

ভীষ্ম ঃ যা বলেছিস, বইয়ের থেকে বেরিয়েও যদি এই অবস্থা হয়! সব ব্যাটা পেছনে লেগেছে।

বাকিরা ঃ ঠিক ঠিক!

১ম জন ঃ (দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্) ওই কাতুকুতু বুড়ো, আহ্লাদী ওরাও তো বেরিয়ে এসেছে না।

২য় জন ঃ এই যে আরেকজন (রা.ছা. কে দেখিয়ে) ওনারা ভিসুভিয়াস হলে ইনি হলেন...কি বলে...নর্থ পোল! আর কাঁদুনে তো আছেই!

৩য় ও ৪র্থ ঃ আসলে কারোরই পাতায় থাকতে ভালো লাগছে না! সবাই বেরিয়ে এসেছে মনে হয়।

রা.ছা. ঃ সেই হলো কথা!

ভীষ্ম ঃ তোকে বলা হয়নি!

(হঠাৎ ছাগলের ডাক ভেসে এলো, ভীষ্ম ভয়ে পালালো। ব্যাকরণ শিং এলো।)

ব্যা.শি ঃ আমরাও বেরিয়ে এসেছি!

কেবল ঃ তুমি তো একা!

ব্যা.শি ঃ বাকিরা আসছে, কিন্তু ও পালালো কেন?

কেবল ঃ বলছি...(জোরে) ওরে আয়রে! এ কিছু বলবে না। (ভীষ্ম ভয়ে ভয়ে ঢোকে)। কি বলছে শোন্!

ব্যা.শি ঃ আমায় দেখে পালালে কেন?

ভীষ্ম ঃ (ঢোক গিলে) আজ্ঞে, জানেন তো একবার এক ব্যাটা ছাগল আমাকে গান গাওয়ার জন্য এমন গুঁতিয়েছিলো...তারপর থেকে আর কাউকে বিশ্বাস করি না। তবে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলবেন না। (হাঁফ ছাড়লো)

ব্যা.শি ঃ অমন ডাকাত পালানো গান গাইলে যে কেউ কিছু বলবে। আমার মুড ভালো আছে এখন তাই...! তা তোমরা করছো টা কী?

কেবল ঃ আজ্ঞে জলসা।

ব্যা.শি. ঃ বাঃ! অন্যরা?

কুশীলবরা ঃ এই যে রামগরুড়ের ছানা...গোমড়া হয়ে আছে। কাতুকুতু বুড়ো আর আহ্লাদীরা হাসাতে গেছে, জানি না কাকে! বাকিরা জানি না।

ব্যা.শি. ঃ আচ্ছা, এই তো অন্যরাও এসে গেছে।

(পাগলা দাশু প্রমুখরা এলো।)

দাশু ঃ বাঃ! কবিতার লোকরাও উপস্থিত দেখছি!

কেবল ঃ আমি নাটকের।

দাশু ঃ ও হ্যাঁ তা ঠিক! বাকিরা কবিতার আর আমরা গল্পের।

ভীষ্ম ঃ বলছি যে এসব আমরা-ওরা বাদ দিলেও চলে তো!

সবাই ঃ ঠিক ঠিক!

(হঠাৎ 'চোর চোর' শব্দে 'গোঁফচুরি'র বড়োবাবু আর 'চোরধরা'-র পাহারাদার উপস্থিত হলো। পাহারাদারের হাতে ছবির মতোই ঢাল-তরোয়াল।)

ব্যা.শি. ঃ (ভীষ্মকে) এই বড়োবাবুর মাথাটি বোধহয় আবার বিগড়োলো নাকি?

ভীষ্ম ঃ যা বলেছেন মশাই! দেখি তো একেকবার বিগড়োয় আবার ঠিক হয়!

বড়োবাবু ঃ (খুব ব্যস্ত) আমার গোঁফটা আবার চুরি গেছে গো!

পাহারাদার ঃ আরে আমার সব খাবার চুরি গেছে আপনার এক গোঁফ! ওই তো দিব্যি রয়েছে...!!

বড়োবাবু ঃ চোপ্! আপিসের বড়োবাবুর সাথে কীভাবে কথা বলে জানো না? আর গোঁফ আমার চুরি গেছে বলছি না...উল্টে তোমার গোঁফ আছে! ইঃ...আবার গালপাট্টা দিয়েছে। যাক্‌গে তোমার সাথে বক্‌বক্ করার সময় নেই গোঁফটা খুঁজতে হবে...(হঠাৎ সবাইকে দেখে) আরে তোমরা সব দাঁড়িয়ে আছো একটা কিছু করতে পারছো না?

দাশু ঃ হ্যাঁ! পারবো না কেন? আমাদের এক ডিটেকটিভ আছে না জলধর, তাকে ডাকি?
(পাহারাদার আর বড়োবাবু একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে)

দুজনে ঃ হ্যাঁ ডাকো ডাকো!

দাশু ঃ জলধর কোথায় গেলি রে? তোর কেস আছে আয়!!
(জলধর আসে। হাতে আতস কাঁচ।)

জলধর ঃ কী হয়েছে বলুন (নোটবই পেন বার করে)

পাহারাদার ঃ আমি যতোবার টিফিনের আগে ঘুমোই ভয়ানকভাবে খাবার কমে যায়, রাত জেগেও পাহারা দিই...। এই ঢাল তলোয়ার নিয়ে কিন্তু তাতেও কিচ্ছু হয় না!

জলধর ঃ এক কাজ করবেন খাবারটা লোহার বাক্সে পুরে আটকে রাখবেন আর দয়া করে সেটা সামনে রেখে পাহারা দেবেন। আর চুরির জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন পরে এখন দরকার নেই।

পাহারাদার ঃ আচ্ছা! ঠিক এটা করলেই তো হয়ে যেতো।

বড়োবাবু ঃ আর আমার গোঁফ?

জলধর ঃ যতক্ষণ না আসলটা পাচ্ছেন একটা নকল গোঁফ লাগিয়ে রাখবেন ব্যাস!

বড়োবাবু ঃ বাঃ বাঃ!! ছোকরার মাথায় বুদ্ধি আছে।

দাশু ঃ কিন্তু ওর নিজের টিফিনবাক্স থেকেই...উঁঃ...(জলধর মুখ চেপে ধরে)

ব্যা.শি. ঃ কি হয়েছিলো?

জলধর ঃ কই কিছু হয়নি তো...হেঁ হেঁ!

দাশু ঃ (মুখ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে) ওর টিফিনবাক্স থেকেই একটা হুলোবেড়াল সরভাজা চুরি করে খেয়েছিলো! আমার বন্ধুরা সাক্ষী।
(সবাই হেসে ওঠে। রামগরুড়ের ছানা একটু ঘুমোচ্ছিলো, হাসির শব্দ শুনে জেগে উঠে আবার ক্ষেপে যায়। জলধর মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকে।)

রা. ছা. ঃ হাসি বারণ কতোবার বলবো?

ব্যা.শি. ঃ অনেকক্ষণ তো ঘুমোলে, জেগেই আবার শুরু করলে? অসুবিধা হলে অন্য কোথাও যাও। এটা তোমার নয় আমাদের সবার জায়গা!

সবাই ঃ হ্যাঁ যাও তো!

(হঠাৎ একটা ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসির শব্দ। সবাই চমকে উঠলো আর রামগরুড়ের ছানা কানচাপা দিয়ে পালালো। 'হযবরল'-র বেড়াল বিখ্যাত ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে ঢুকলো। তাকে দেখে ব্যাকরণ শিং খুব খুশি হলো।)

বেড়াল ঃ ওঃ! এখানে দরকার ছিলো গেছোদাদাকে! আরো জমতো। সব দেখছিলাম!

পাহারাদার ঃ (তেড়ে গেলো বেড়ালের দিকে) অ্যাই!! এই বেড়ালটাই মনে হয় খাবার খেয়েছে, আবার হাসছে...দাঁড়া!

বেড়াল ঃ আরে বাপু চটো কেন? আমি কেন খেতে যাবো তাছাড়া আমি কি কবিতায় থাকি? আর খেয়ে থাকলে ওই গেছোদাদার ছেলে খেয়েছে হয়তো!

পাহারাদার ঃ আরে নিকুচি করেছে গেছোদাদার! সে কোথায়?

বেড়াল ঃ সে বলা খুব শক্ত! তুমি তাকে এখানে খুঁজলে জানবে তিনি ওখানে আছেন আবার যদি উলুবেড়েতে যাও শুবে যে তিনি আছেন মতিহারিতে তারপর...

পাহারাদার ঃ অনেক হয়েছে! চুপ কর্!!

(সে হতাশ মুখে মঞ্চের সামনে বসে পড়ে, বেড়াল পুরো মঞ্চটা ঘুরে চলে যায় 'পেটুক'-এর হরিপদ পেটে হাত বুলোতে বুলোতে আসে।)

হরি ঃ নাঃ! এবার খুব খিদে পেয়েছে! কিছু আছে কারো আছে?

দাশু ঃ তোর এতো কিছুর পরেও নোলা বেড়েছে?

বাকিরা ঃ মানে?

দাশু ঃ ও প্রচণ্ড চুরি করে খায়! একবার তো দই বলে ভুল করে ওর পিসিমার চুনের হাঁড়ি বার করে চুন খেয়ে ফেলেছিলো!

(সবাই আবার হেসে ওঠে! পাহারাদার আবার তেড়ে যায়।)

পাহারাদার ঃ তাহলে তুইই খেয়েছিস!

হরি ঃ না না আমি না, আমি তো গল্পে থাকি।

পাহারাদার ঃ তাও বটে!

জলধর ঃ দেখুন মশায় এভাবে বিনা প্রমাণে কাউকে চোর বলবেন না, আর আমি তো ভার নিয়েছি।

পাহারাদার ঃ আচ্ছা ভাই মাপ করো! আসলে অতোগুলো খাবার তো...

(হাতে কাঁচকলা নিয়ে গম্ভীর মুখে হুঁকোমুখো হ্যাংলা ঢুকলো, কি যেন ভাবছে।)

ভীষ্ম ঃ কি হে হ্যাংলা! এখনো ঠিক করে উঠতে পারলে না কোন ল্যাজে মাছি মারবে?

কেবল ঃ ও ও রামগরুড়ের দলে যোগ দিয়েছে বুঝলি না?

ভীষ্ম ঃ হাঃ হাঃ!

হ্যাংলা ঃ সবই তো বুঝলাম! কিন্তু আরেকটা ল্যাজ থাকলে ভালো হতো...

বড়োবাবু ঃ এটা তো সেই কিম্ভূতের মতো কথা বলছে দেখছি! আরো চাই আরো চাই...খুব খারাপ কিন্তু এইসব!

ব্যা.শি. : যা বলেছেন বড়োবাবু।

(তবু হুঁকোমুখো হ্যাংলা ভাবতে থাকে, তার হাতের কাঁচকলাটা দেখে হরিপদর জিভে জল আটকালো। প্রোফেসর হেঁশোরাম হুঁশিয়ার এসে ঢুকলো।)

প্রো : (হ্যাংলাকে) বুঝলে তোমার মুখটা আমার সেই গোমড়াথেরিয়ামের মতো! আহা বেচারা থাকলে ভালো হতো।

কেবল : আরেকজন থাকলে জমতো, রামগরুড়ের ছানা...তা সে তো ছিলো কোথায় গেলো?

সবাই : ওহে রামগরুড়ের ছানা! এদিকে এসো...। (রামগরুড়ের ছানা আবার এলো)

রা. ছা. : কী হয়েছে? (হ্যাংলাকে দেখে) আরে তুমি! বাঃ এ অন্তত হাসে না!

প্রো : ওই যে বললাম গোমড়া থাকলে আরো ভালো হতো!

(হাসতে হাসতে হিজিবিজবিজ এলো, রামগরুড়ের আবার কানে হাত ওদিকে হ্যাংলা চিন্তা করেই চলেছে। হাসির শব্দ পেয়ে আবার আহ্লাদীরা, কাতুকুতু বুড়ো এলো।)

হিজি : হাঃ হাঃ হাঃ!! সেই যে একটা লোক ছিলো সারাক্ষণ গোমড়া হয়ে থাকতো, লাফিং ক্লাবে যেতো তাও মুখোশ পরে। একদিন রাস্তা দিয়ে চলার সময়ে পায়ে ঠং করে পাথর লাগলো অমনি সে বাবাগো বলে খিঁচিয়ে উঠলো। সেই প্রথম জীবনে তার দাঁত দেখা গেলো। হোঃ হোঃ হোঃ!!!

(কাতুকুতু বুড়ো, আহ্লাদীরা তাকে খুশি হয়ে দলে টেনে নিলো। ওদিকে ভীষ্মরা মিলে মৃদুস্বরে রেওয়াজ করতে শুরু করলো। রামগরুড়ের ছানা আর হ্যাংলাও কথা বলছে। 'পেয়েছি পেয়েছি' বলে বিজ্ঞানী ঢুকলো, হাতে আরেকটা অদ্ভুত যন্ত্র! সবাই উত্তেজিত!)

বিজ্ঞানী : হয়েছে! পাথর আর নুড়ির অ্যাক্সিলারেশন সাক্সেসফুল! তার থেকে এই যন্ত্রটা পেয়ে গেলাম...আজবিস্কোপ!!

(আনন্দে নেচে ওঠে, সবাই হাততালি দিলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'ন্যাড়া বেলতলায় যায় ক'বার' এর রাজা ঢুকলো, মুখে চিন্তার ছাপ।)

রাজা : হচ্ছে না! মিলছে না!

বিজ্ঞানী : কী মিলছে না?

বিজ্ঞানী : কী মিলছে না?

রাজা : (হাতের পুঁথিটি দেখিয়ে) এই যে এতে লেখা আছে 'ন্যাড়া যায় বেলতলাতে'। কিন্তু ক'বার যায়? এটাই বুঝতে পারছি না!

বিজ্ঞানী : হুম্‌ম্‌'! জটিল অঙ্ক! আগে দেখতে হবে বেলতলা কোথায় তারপর ফুটোস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে ন্যাড়ার বাড়ি কোথায়, এরপর বাড়ির সামনের গাছের গুঁড়িকে নিউট্রালাইজ করে, পাতার ফ্যাকশন পার সেকেন্ড বের করতে হবে। ধরি এক্স বার বেলতলা যাচ্ছে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি রুটওভার গামা প্লাস কাপ্পা....

রাজা : (হাতজোড় করে) ক্ষ্যামা দাও বাপু, এর থেকে পুঁথি খোঁজা ঢের সোজা আমার কাছে!

(পুঁথি ঘাঁটতে শুরু করে আবার।)

জলধর ঃ অ্যাতো কিছুর দরকারই নেই! ন্যাড়াকে জেরা করলেই উত্তর পাওয়া যাবে। ('হযবরল'র ন্যাড়া উৎসুক হয়ে ঢুকলো।)

ন্যাড়া ঃ বলি ভাইরা কি আমার খোঁজ করছো? আমিই ন্যাড়া!

জলধর ঃ এ্যাই তো, ন্যাড়া তুমি কতবার বেলতলা গেছো?

ন্যাড়া ঃ (অবাক) বেলতলা? আমি তো কখনো ওখানে যাইনি আর গানও গাইনি।

ব্যা.শি. ঃ ওহে ছোকরার দল আমরা তো গল্পের লোক, এ আমার সঙ্গেই থাকে। এ ন্যাড়া সে ন্যাড়া নয়।

(রাজা, জলধর, বিজ্ঞানী হতাশ হয়।)

ন্যাড়া ঃ গান ধরবো? ...মিশিমাখা শিশিপাখা আকাশের কানেকানে...

(ভীষ্মরা সব ছুটে আসে।)

কেবল ঃ তুমি গান গাও?

ন্যাড়া ঃ হ্যাঁ, এই দ্যাখো পকেটভর্তি কতো আছে।

ভীষ্ম ঃ চলো আমাদের সাথে এসো! এই নিয়ে আয় ওকে!

(কুশীলবরা ওকে নিয়ে মঞ্চের এক কোণে চলে যায়। গাইয়ের দল মিলে জটলা তৈরি করে, 'নোটবই' এর সেই লোকটি ঢোকে; হাতে নোটবই আর অন্য হাতে পেনসিল, চোখে স্প্রিং লাগানো চশমা যেমন ছবিতে থাকে।)

লোক ঃ এই দ্যাখো পেনসিল নোটবুক এ হাতে /এই দ্যাখে ভরা সব কিলবিল লেখাতে

সবাই ঃ সে তো দেখতেই পাচ্ছি, আমরা সবাই জানি।

('সবজান্তা' ঢোকে, বেশ মাতব্বর চেহারা। ঢুকেই সবার দিকে একটা হামবড়িয়া দৃষ্টি দেয়। নোটবইয়ের লোকের দিকে তারপর নজর পড়ে। এদিকে সবজান্তাকে দেখে দাশু জলধর এদের সবার মুখে হালকা হাসি।)

সবজান্তা ঃ (লোককে উদ্দেশ করে) তুমি তো লিখেছো খুব! অবশ্য আমার বাবা কাগজের এডিটর কাজেই আমার থেকে বেশি এখানে কারো জানার কথা নয়।

দাশু ঃ তা তো বটেই, এমনকি রামলালবাবুর থেকেও বেশি নয়! কী তাই তো?

সবজান্তা ঃ চোপ!

লোক ঃ আচ্ছা দাঁড়াও, তুমি আর কী জানো বলো তো? (পেনসিল বাগিয়ে ধরে)

সবজান্তা ঃ কতো কী! নায়েগ্রা ফলস্ দশ মাইল উঁচু একশো মাইল চওড়া। আইফেল টাওয়ার ন'কোটি ন' লক্ষ ন'হাজার ন'শো নয় সেন্টিমিটার!

বিজ্ঞানী ঃ (মনে মনে) এতো উল্টোপাল্টা বকছে রে!

দাশু ঃ তাই করে সবসময়!

(লোক তাড়াতাড়ি লিখে চলে, হিসেব করতে করতে কাক্কেশ্বর কুচকুচে এলো।)

কাক ঃ আচ্ছা ড্রিঘাংচুকে কেউ দেখেছো? আমার জাতভাই কিনা যদিও আমার মতো ব্যবসা করতে পারে না।

সবাই ঃ হ্যাঁ তাই তো! ওকে দেখছি না তো?

ব্যা.শি ঃ হ্যাঁ ওতো রাজামশাইয়ের সামনে বসে সেই ক্কঃ করে ডেকে কি কাণ্ডটাই না করলো!

রাজা ঃ (অবাক) কই আমি তো চিনি না...বাব্বা কি বিদঘুটে নাম রে! উনি সব তৈরি করেছিলেন বটে!

ব্যা.শি. ঃ না না এ সে নয়...আপনি তো কবিতার ভুলে গেলেন নাকি?

রাজা ঃ তা ঠিক!...ওহে ন্যাড়া...বেলতলা (আবার পুঁথিমগ্ন হয়)

বিজ্ঞানী ঃ বললাম না ওটা হিসেব না করলে হবে না!

কাক ঃ কীসের হিসেব শুনি!

বিজ্ঞানী ঃ ওসব বিজ্ঞানের ব্যাপার...তুমি বুঝবে না!

কাক ঃ থাক হয়েছে! ওটা তোমার থেকে আমি বেশি জানি, তোমার ওইসব ভুলো ভোলা যন্ত্র নিয়ে কী আর সবসময় হয়?

রাজা ঃ আঃ! কাজ করছি না!

লোক ঃ নাঃ আমি দেখি আর কিছু জানা যায় কিনা!! তোমরাও কাজ করছো, বিরক্ত করবো না।

বিজ্ঞানী ঃ আমার যন্ত্র ভুলো ভোলা?
(বিজ্ঞানী মহা চটে যায়, কিন্তু রাজার ভয়ে কিছু বলতে পারে না লোকটি চলে যায় পরপর 'ভোলানাথের সর্দারি'র ভোলানাথ ঢোকে।)

ভোলা ঃ কেউ বোধহয় আমার নাম করছিলো?

কাক ঃ না ভুল ভেবেছো, কেউ ডাকেনি যাক্, যখন এসেছো ভালোই হয়েছে।...কিন্তু ড্রিঘাংচু কোথায় গেলো?

ভোলা ঃ আমি বোধহয় ওকে দেখলাম! (সবাই উৎসুক হয়)

কাক ঃ কোথায় সে? বলো বলো!!

ভোলা ঃ আমরা যে বইটায় ছিলাম সেটার ওপর বোধহয়...

সবাই ঃ চোপ আর বলবি না!!

জলধর ঃ এখনো তোর সর্দারির স্বভাব গেলো না?

দাশু ঃ এতোকিছু পরেও? ঢেঁকি ধানের ব্যাপার নাকি?

বাকিরা ঃ আচ্ছা ডেঁপো তো!

ভোলা ঃ যাব্বাবা, আমি যা মনে হয় সেটাই বলতে গেলাম...

বড়োবাবু ঃ কেন বলবে? বইয়ের ওপর...কাক...কিসব যাতা কথাবার্তা!

হরিপদ ঃ ওর আবার কলেজের ল্যাবে আটকে থাকার সময় হয়েছে! বুঝলি না?

ব্যা.শি ঃ এই যে বাছাধন দেখো যেখানে থাকো তা নিয়ে কথা বলার সাহস কী করে হয়? দেবো নাকি একটু শিং এর গুঁতো?

(ভোলানাথ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পালায়। কাক্কেশ্বর হিসেব লেখে।)

কাক ঃ ৮ জন বক্তা, নগদ মূল্য আটদুগুণে ষোলো টাকা, খুচরো দেড় দু'গুণে তিন টাকা আর পাইকারি পনেরো দু'গুণে তিরিশ টাকা। মোট হলো গিয়ে ঊনপঞ্চাশ টাকা। আর সময় ব্যয় ধরলে...

বিজ্ঞানী ঃ এই তোমার অঙ্ক রাখো তো!

কাক ঃ (মুচকি হাসি) এইবেলা উল্টো সুর কেন হে?

('অবাক জলপান' এর পথিক এলো। কাঁধে ঝুঁলি, তাকে দেখে কেবল গানের দল ছেড়ে তেড়ে এলো।)

কেবল ঃ আঃ! এইতো একজন নাটকের লোক! জল খেয়েছো তো?

পথিক ঃ হ্যাঁ ভাই! যা ঘোরালো ওরা বাপরে বাপ!

কেবল ঃ ওরে অনেকক্ষণ গান হয়েছে একটু গল্প করে নিই বরং।

ভীষ্ম ঃ হ্যাঁ ঠিক আছে।

(ওরা গল্প করতে বসলো, 'আশ্চর্য কবিতা'র শ্যামলাল কাগজের টুকরো হাতে এলো মুখে হাসি।)

শ্যাম ঃ আমি একটা দারুণ কবিতা লিখেছি!

দাশু, জলধর, হরিপদ ঃ আবার! আর পারা গেলো না রে!

সবাই ঃ আহা দাঁড়াও কবিতাটা পড়ো শুনি!

শ্যাম ঃ সুকুমার পুরুষ এক স্নিগ্ধ দুই চোখ,
সুগুণে সুতনু হে তব জয় হোক।
আমাদের পিতামাতা তুমিই প্রতিষ্ঠাতা,
বাঙালিমনের 'তাতা' জানে সব লোক।
কি জাদু কলমে ছিলো আজ বুঝি সবে,
পাতার আখরে তুমি চিরকাল রবে।
তুমি ছিলে তাই আছি ফুটিয়েছো চোখ,
মহান স্রষ্টা তুমি তব জয় হোক।।

সবাই ঃ (হাততালি) আহা আহা চমৎকার!

দাশু ঃ তোর তো উন্নতি হয়েছে রে!

পথিক ঃ ওকে কেওড়া দেওয়া জল খাইয়ে দাও!

ব্যা.শি. ঃ আমাদের মনের কথাটা বলে দিয়েছে! সত্যিই তিনি ছিলেন তাই।

রা. ছা. ঃ হাততালি দাও আর যাই করো না কেন হেসো না!

কেউ কেউ ঃ নিকুচি করেছে তোর নিষেধের!

(কেউ কেউ গিয়ে শ্যামলালের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে, শ্যামলাল ফলাও করে নিজের ঢাক পেটাতে শুরু করে। চণ্ডীদাসের খুড়ো একটা কল কাঁধে করে ঢোকেন, ছবির সেই কল নয়। তাকে দেখে আরেকবার সাড়া পড়ে যায়।)

বিজ্ঞানী ঃ খুড়ো! আবার কী আবিষ্কার করলে গো?

খুড়ো ঃ এই তো! (যন্ত্রটা দেখায়)

বিজ্ঞানী ঃ এটা কি করে? (বাকিরাও এসে ভিড় করে)

খুড়ো ঃ এ হলো রোগ সারানো যন্ত্র!!

সবাই ঃ কিরকম!!

খুড়ো ঃ এই দ্যাখো। যন্ত্রটা সেই আগের মতোই দেখতে আর খাবার ঝোলানোও আছে বটে কিন্তু এ একেবারে অন্য জিনিস। দেখতে পাচ্ছো তো খাবারের সাথে একটা বই ঝোলানো আছে? (সবাই হ্যাঁ বললো)...এই বইটা হচ্ছে একেবারে মারাত্মক কান্নার বই যে পড়বে সেই কাঁদবে! প্রথম থেকেই কাঁদতে কাঁদতে চোখে নাকে জল এসে যাবে। সেটাই লক্ষ্য! যার ধরো খুব সর্দি হয়েছে তাকে এইটা কাঁধে লাগিয়ে বইটা পড়তে হবে আর অমনি তো বুঝতেই পারছো, অর্ধেক সর্দি ওখানেই শেষ। আরো আছে, এই যে খাবারটা এটা ফিক্সড। যেমন মুখরোচক এমনি মারাত্মক ঝাল...সে লঙ্কা কোথায় লাগে? এই বই আর ওই খাবার একসাথে হলে কেল্লা ফতে...সর্দি পুরো দুড়দাড় করে পালাবে আর তারপর রুমাল দিয়ে মুছে নিলেই হলো। কেমন?

(প্রচণ্ড হাততালি পড়লো।)

সবাই ঃ অসাধারণ!! খুড়ো হচ্ছেন খুড়ো।

পথিক ঃ বলেছেন তো অপূর্ব! কিন্তু ওই নাকের জল চোখের জল শুনে আবার ওই গাঁয়ের লোকগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো। উফ্! পাষণ্ড একটা খাবার জল দিলো না।

কেবল ঃ আরে ছেড়ে দে!

ভীষ্ম ঃ সবাই মিলে বলো....

সবাই ঃ "অতুল কীর্তি রাখলো ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো"!!

কুশীলবরা ঃ এই হয়েছে সবচে' ভালো সর্দিকাশির যম,
গান গাইবো মনের সুখে শেষ হবে না দম।
আবার দেখো গানের মুডে উঠছে মাথা নেড়ে...

সবাই ঃ দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!

কেবল ঃ শুরু কর...এবার ইমন কল্যাণ! দিম দা না তেরে উদানি তাদানি দিম তা না নানা...!!

ভীষ্ম ঃ আরে মাঝরাতে ইমন কল্যাণ? দরবারি কানাড়া ধর্!

কেবল ঃ বেশ তাই হোক...

(গাইয়ের দল মহা উৎসাহে লেগে পড়ে, বাকিরা গানের সাথে তালি দিতে থাকে। বিরক্ত মুখে গজ্‌গজ্ করতে করতে 'ঝালাপালা'র পণ্ডিতমশাই ঢোকেন হাতে পুঁথি। রাজা পুঁথি দেখে কৌতূহলী হয়।)

পণ্ডিত ঃ ওফ্! একটু বিশুদ্ধ মনে শাস্ত্রপাঠ করবো তার জো আছে? চতুর্দিকে ঝালাপালা আর ঝালাপালা!

শ্যাম ঃ (ছন্দ মিলিয়ে) খট খট কানে লাগে তালা!

পণ্ডিত ঃ চোপ! ম্লেচ্ছ, বর্বর! ছন্দশাস্ত্র, কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কি জানিস রে মূঢ়?

শ্যাম ঃ কিচ্ছু না!

পণ্ডিত ঃ তাহলে কদাচ এমন বর্বরোচিত ব্যবহার করবি না! এই দণ্ডবায়স (কাক্কেশ্বরকে দেখিয়ে) কী উদ্দেশ্যে বসে আছে?

কাক ঃ দিলো হিসেব গোল পাকিয়ে! দুত্তোর মশাই, আপনার ঐ ভাষা ছেড়ে একটু ইয়ে ভাষায় কথা বলুন না! আর আমি কী করছি তাতে আপনার কি?

পণ্ডিত ঃ উদ্ধত!!

কেবল ঃ আচ্ছা পণ্ডিতমশাই আপনি এই মূঢ়দের মধ্যে কেন?

পণ্ডিত ঃ তুমি সেই কেবলচাঁদ ওস্তাদ না? সেবার জমিদারবাবুর বাড়ি যা করলে! এখানেও কি সেই একই রকম আছো...ওহো তাই তো হবে! তা কী বলছিলে?

কেবল ঃ বলছিলাম আপনি বইয়ের বাইরে এসে কী করছেন?

পণ্ডিত ঃ এই যে! (হাতের পুঁথি দেখিয়ে) 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' পাঠ করবো বলে এলাম।

রাজা ঃ (নিজের পুঁথি বন্ধ করে) খেয়েছে রে! ওতে কী ন্যাড়ার কথা থাকবে?

কেবল ঃ বাঃ খুব ভালো! (মনে মনে) পালাতে হবে দেখছি...!

(কেবলের পালানোর আগেই থপ্ থপ্ করে নাচতে নাচতে কুমড়োপটাশ এসে ঢুকলো, পণ্ডিতমশাই তার দিকে তাকিয়ে হাঁ করে গেলেন।)

কু.প. ঃ "(যদি) কুমড়োপটাশ নাচে—
খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে;
চাইব নাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাকো পাছে;
চার পা তুলে থাকবে ঝুলে হট্টমূলার গাছে।"

সবাই ঃ (ভেঙিয়ে) যদি কুমড়োপটাশ নাচে।

আহ্লাদীরা ঃ হোঃ হোঃ হোঃ কি চেহারা দেখ।

রা. ছা. ঃ আঃ! বললাম না হাসি বারণ, বাপু কুমড়ো তুমি ওই চেহারা নিয়ে না নাচলেই ভালো।

বাকিরা ঃ যা বলেছে!

কু.প. ঃ (রেগে) কি ব্যাপার? যা করতে বলা হলো তা হচ্ছে না কেন?

পণ্ডিত ঃ এটা কী মাতুলালয়ের আবদার নাকি হে অকালকুষ্মাণ্ড?

দাশু ঃ তাছাড়া এটা বই নয়!! আমাদের ওপর কেরদানি ফলিও না, আমার সাথে লাগতে গিয়ে জগদ্বন্ধুর কি দশা হয়েছিলো জানো তো?

পথিক ঃ আমিও আছি...ওকে তিরিশ রকম জলের নাম বললেই ওর হয়ে যাবে।

কু. প. ঃ "তুচ্ছ ভেবে এসব কথা করছো যারা হেলা..."

সবাই ঃ 'তাতা' মশাই জানতে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা।

কু. প. ঃ (আরো ক্ষেপে) "দেখবে তখন কোন কথাটি কেমন করে ফলে"

সবাই ঃ মোদের তখন দোষ দিয়ো না আগেই রাখি বলে।...আরে সবার মুখস্থ একসাথে থাকি আবার আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে! কাণ্ড দেখো!!

কাক ঃ তাছাড়া এখানে আস্তাবল কোথায় রে বাবা!

ব্যা.শি. ঃ তুমি তো আমাদের গুরুজন নও!

রাজা ঃ আমিও নই, আমাদের সবার গুরুজন তিনি!

সবাই ঃ একদম!

রা.ছা. ঃ হ্যাঁ তিনিই আমায় হাসি দেননি আর তুমিও তো কুমড়ো বেশ গোমড়া মুখেই আছো। আবার হেসো না যেন...

খুড়ো ঃ ওহে ভুলে গেলে নাকি? "যদি কুমড়োপটাশ হাসে..."

রা. ছা. ঃ কি জ্বালাতন! এতো রকম লোক হলে তো মুশকিল।

জলধর ঃ ওটাই তো মজা! হাসি, কান্না, গোমড়া সবাইকে এক ছাঁচে বেঁধে রেখেছেন...আর এতোরকম বলেই তো মজা! তাই না?

বাকিরা ঃ একদম! ঠিক কথা!

ভীষ্ম ঃ আমরা যেমন গাইয়ে ওরা তেমনি হাসিয়ে ওরা কাঁদিয়ে...

ব্যা.শি. ঃ গাইয়ে বোলো না বাবা...এরকম হলে গানকে অপমান করা হয় এতোক্ষণ সহ্য করেছি...

কেবল ঃ সে তো আমরাও করছি, না জেনে এভাবে বলেন কেন?

রা. ছা. ঃ হ্যাঁ খালি হাসি আর হাসি।

ভীষ্ম ঃ চোপ!!

(থামো থামো বলতে বলতে 'আমি' এসে ঢোকে। সবাই অবাক।)

সবাই ঃ এই এ আবার কে রে? কোনোদিন দেখিনি তো?

খুড়ো ঃ তুমি কি অন্য বই থেকে এসেছো?

আমি ঃ না, ওনার যাবতীয় গল্প-কবিতায় যে 'আমি'কে দেখো আমিই সে আমি।

সবজান্তা ঃ তাহলে আপনিই 'তাতা'মশাই?

জলধর ঃ কিন্তু উনি তো...

আমি ঃ না আমি নই বললাম তো, তোমাদের মতো আমিও তাঁর তৈরি। আমিচন্দ্র আমি। হ্যাঁ একদিক থেকে তাঁর প্রতিনিধি বলতে পারো কিন্তু স্বয়ং তিনি নন। যার জন্য এলাম তোমার বাইরে কেন? আমি দেখি পুরো বই ফাঁকা!

বিজ্ঞানী	ঃ কি করবো বলো? আর বন্দী থাকতে ভালো লাগে?
আমি	ঃ লোকে কি ভাববে? যদি কেউ বই খোলে?
দাশু	ঃ এই মাঝরাত্তিরে! সব টেনে ঘুম দিচ্ছে...তাছাড়া আমাদের কি আর কোনো সংস্করণ নেই?
সবজান্তা	ঃ আর ওসব ছাড়্...। এখন আমাদের কারা ছোঁবে? আমরা তো ফেলে আসা দিনের লোক। হাসির বই বলে কথা?
রা. ছা.	ঃ এটা স্বীকার করতেই হবে!
ভীষ্ম	ঃ যাক বুঝেছিস। সেই হচ্ছে কথা। আরো কতো বই আছে...। এই এখানেই আছে!
পণ্ডিত	ঃ হুম্ তারা এখন উন্নততর গ্রন্থ পেয়েছে না?
আমি	ঃ ছি! এরকম বলতে লজ্জা করে না? আমরা কীসে কম? কারো মগজে ঠিকমতো ঢুকতে পারলে আমরা সেই মগজে খেলে বেড়াই আর তারা বাধ্য হয় আমাদের নিয়ে কাজ করতে! তখন আবার সবাই আমাদের নতুন করে চেনে না?
কাক	ঃ ঠিকই বলেছে! আমি তো উড়েই যেতে পারি...!
কেবল	ঃ আবার বইয়ে ঢুকতে হবে?
পথিক	ঃ হ্যাঁ আবার সেই স্থির হয়ে থাকা। নড়লে তো একেবারে নাটক হয়ে যাবে।
দাশু	ঃ তা নাটকই বটে! ছবি, অক্ষর সব নাচবে!
আমি	ঃ এবার আমরা এতক্ষণ ধরে যে নাটকটা জমিয়ে রেখেছি তাকে শেষ করলে হয় না কী? তাছাড়া রাত শেষ হতে বেশি দেরি নেই কিন্তু, ওরা যদি ভোর ভোর এসে দরজা খুলে ফেলে...
বাকিরা	ঃ ওরে বাবা! থাক্! বলার দরকার নেই।
আমি	ঃ চলো আবার অসম্ভবের ছন্দে মত্ত মাদল বাজাবো আর বাকিদের ডেকে নাও কে কোথায় আছে না আছে...
সবজান্তা	ঃ আচ্ছা আবার কাল এরকম করলে কেমন হয়? আমাদেরও একটু ভালো লাগবে?
দাশু	ঃ এইতো একটু ঠিকঠাক কথা বললি! মন্দ নয়, আমিও তো থাকতে পারো?
আমি	ঃ সে হবেখন...আরে ভোরের আলো ফুটবে এবার চলো চলো...! কেউ না কেউ এসে ঠিক আবার আমাদের দেখবে!
সবাই	ঃ চলো যাওয়া যাক!

(সবাই পিছন ফিরে চলতে শুরু করে, নেপথ্যে সুকুমার রায়ের শেষ 'আবোল তাবোল' কবিতার একটা অংশ শোনা যায়... সঙ্গে হালকা পাখির ডাক। সবাই সেই বিরাট বইয়ের পাশ দিয়ে গিয়ে ঢুকে যায়। বইটা আস্তে আস্তে মুড়ে বন্ধ হয়ে যায়। ওপরে লেখা 'সুকুমার সমগ্র'। সূর্যের আলো এসে ঠিক মলাটের ওপর পড়ে। তারপর সারা মঞ্চ সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়। পর্দা নামে।)

রাখহরি ফিল্ম কর্পোরেশন

ছান্দস ভট্টাচার্য
অর্থনীতি বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

[চরিত্রলিপি ঃ টনিদা, কুশল, স্বর্ণেন্দু, কমলেশ, বিচারবুদ্ধি, প্রথম অভিনয় আগ্রহী, দ্বিতীয় অভিনয় আগ্রহী, তৃতীয় অভিনয় আগ্রহী, চা-ওয়ালা সুবল]

[স্টেজের মাঝখানে রয়েছে একটি মাঝারি সাইজের পড়ার টেবিল, তাতে কয়েকটা দেরাজ থাকবে। টেবিলের পেছনে দর্শকদের দিকে মুখ করে একটা চেয়ার। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আরও কয়েকটা চেয়ার ও টুল। পেছন দিকে ডানদিক করে একটা বইয়ের তাক—বইতে ঠাসা। পেছনে বাঁদিক করে একটা খাট, একজন মানুষের শোওয়ার মতো। এসময় টনিদা চেয়ারে এসে দর্শকদের মুখোমুখি বসে। টনিদার বয়স তিরিশের কোঠায়। কিন্তু দেখে যেন আরও বুড়ো মনে হয়। মুখে উসকোখুসকো দাড়ি। পরনে নোংরা পুরোনো পাঞ্জাবী আর প্যান্ট। এরপর হলুদ, আলো ওপর থেকে এসে পড়ে। আলোয় দেখা যায় টনিদা কিছু লিখছে।]

টনিদা ঃ (বিরক্তির সঙ্গে সদ্য লেখা কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দ্যায়) না, পারছি না। হচ্ছে না, কিছুতেই পারছি না লিখতে। (ক্লান্তির সঙ্গে) লেখালেখি...। অন্তত এজন্মে আমার দ্বারা আর হবে না।

(ঘরেতে ডানদিকের দ্বিতীয় উইং দিয়ে স্বর্ণেন্দু, কুশল আর কমলেশ এসে ঢোকে। তিনজনের বয়স কুড়ির কোটায়। কমলেশ খুব রোগা। কুশল আর স্বর্ণেন্দু স্বাস্থ্যবান। কুশলের চশমা আছে। তিনজনই সাধারণ পরিষ্কার জামাকাপড় পরে থাকে।)

কুশল ঃ কিছু লিখছিলে টনিদা?

টনিদা ঃ (কাগজ থেকে চোখ তুলে পেছন দিকে ঘুরে দেখতে পায়) আরে আয় আয়। বোস। অনেকদিন বাদে তিনজনে সকাল সকাল এলি।

স্বর্ণেন্দু ঃ আর কী টনিদা, সবার সেই চাকরি। এই তিন-চারদিনের ছুটি জুটল একটা। তাই সবাই মিলে এলাম তোমার সাথে দ্যাখা করতে।

কুশল ঃ তুমি তো বেশ ভালই আছ। নিজের মনে লিখছ, চাকরির দায়দায়িত্ব, বসের চোখরাঙানি এসবের কোনো বালাই নেই।

টনিদা ঃ (চেয়ার থেকে উঠে) ভালো নেই রে, কী হল বলতো জীবনে? একটা সময়ে কত রঙিন স্বপ্ন দেখতাম। অসাধারণ লিখব। আমার লেখা পড়ে হাজার হাজার লোকে চিঠি লিখবে আমায়। প্রকাশকরা সব আমরা বই ছাপতে কাড়াকাড়ি করবে। নাটক লিখব—দেখতে হল উপচে পড়বে। আর এখন...শূন্যতার সাথে কলম নিয়ে আর কতদিন লড়াই করা যায় বল?

কমলেশ ঃ তোমার কিন্তু এখনই ভেঙে পড়ার কিছু নেই টনিদা। তোমার সামনে অনেকদিন আছে, ট্যালেন্ট আছে। এত ভাবছ কেন?

টনিদা ঃ ভাবছি কেন? হাতে পয়সা নেই রে, নিজেরটা নিজে চালাতেও তো পয়সা লাগে নাকি।...যেভাবে হোক, কিছু টাকা হাতে আসা ভীষণ দরকার। বুঝলি?

কুশল ঃ কেন, যে নাটকটা আগেরবার লিখলে, সেটার কী হল?

টনিদা ঃ (ক্লান্ত) কেউ নিল না রে। একটা বড়ো দলও নিল না। বুঝতে পারছি না, কেউ একজন মানিয়ে নিতে পারছে না। সেটা কে? আমি না বাজার? (চেয়ারে বসে পড়ে)

স্বর্ণেন্দু ঃ না টনিদা, লেগে থাকো। তোমার ট্যালেন্ট আছে। আমরা আছি। চেষ্টাটা ছেড়ো না।

টনিদা ঃ একটা আইডিয়া আছে। প্রচণ্ড অরিজিনাল একটা আইডিয়া। একটা শর্টফিল্ম করব। একজন শিল্পীর, একজন ভেঙে পড়া শিল্পীর জীবন, আর তার স্ট্রাগল নিয়ে...দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। কিচ্ছু লাগবে না খালি একজন ভালো অভিনেতা, কয়েকটা সাইড ক্যারেক্টার (স্বর্ণেন্দু, কুশল, কমলেশকে দেখিয়ে) তোরাই করে দিতে পারবি, আর তুলতে একটা ভাল ক্যামেরা...কত দাম হবে? এই ধর আশি হাজার, কিন্তু আমার হাতে (হতাশার সঙ্গে) তার সিকিভাগ টাকাটুকুও নেই। খালি কিছু টাকা যদি পেতাম...

(নীরবতা)

এই তোরা অনেকক্ষণ এলি। বাইরে সুবলের দোকানে চারটে চা দিতে বল না আমার নাম করে বল, ভেতরে দিয়ে যাবে।

(যে উইং দিয়ে ওরা ঢুকেছিল, স্বর্ণেন্দু সেই উইং দিয়ে বেরিয়ে যায়)

নাহ্, মাথাটা বড্ড জ্যাম হয়ে আছে। একটু হাল্কা কিছু পড়ি। ওই যে, (হাত দিয়ে পেছনের তাকটা দেখায়) টেনিদা সমগ্রটা দেখতে পাচ্ছিস, ওটা দে তো...

(কুশল তাক থেকে বইটা তুলে টনিদাকে দেয়)

(স্বর্ণেন্দুর পুনঃপ্রবেশ)

স্বর্ণেন্দু ঃ বলে এলাম চারটে চা আর দুটো করে বিস্কুট।

(টনিদা টেনিদা সমগ্র'র পাতা উল্টোয়। হঠাৎ করে একটা জায়গায় এসে স্থির হয়। প্রচণ্ড আগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়ে পাতাটার ওপর।)

(এরই মধ্যে ডানদিকের দ্বিতীয় উইং দিয়ে চা-ওয়ালা ঢোকে। গামছা পরা, গায়ে নোংরা গেঞ্জি, হাতে একটা ট্রেতে চারকাপ চা আর বিস্কুট রাখা)

স্বর্ণেন্দু ঃ (টনিদার টেবিলটা দেখিয়ে) এই, এই জায়গাটায় রাখো কাপগুলো। (হঠাৎ টনিদার দিকে নজর পড়ে) টনিদা অত মন দিয়ে কী পড়ছ?

(কয়েক মুহূর্তের নীরবতা)

টনিদা ঃ (উল্লাসে প্রায় লাফিয়ে ওঠে) পেয়েছি, পেয়েছি, এভাবেই হবে। হতেই হবে!

কমলেশ ঃ (ঘুরে কমলেশ্বর দিকে তাকিয়ে টেনিদা সমগ্রটা ওর দিকে ছুঁড়ে দ্যায়)। পড় কী লেখা আছে।

কমলেশ ঃ হ্যাঁ, এতো গল্প। 'ভজহরি ফিল্ম কর্পোরেশন', ছোটবেলায় পড়েছিলাম। তবে প্লটটা এখনো মনে আছে মোটামুটি।

টনিদা ঃ আইডিয়াটা পেলি?

কমলেশ ঃ কী আইডিয়া?

টনিদা ঃ আরে আমাদের টাকার দরকার। তো? টেনিদা কী করেছিল? ফিল্ম কোম্পানি? আমিও খুলব। দেয়ালে পোস্টার দেওয়া হবে, যে যত টাকার শেয়ার কিনবে তার তেমন পার্ট। আমার শর্টফিল্মটা তোলার টাকা মোটামুটি উঠে যাবে।

কুশল ঃ তুমি তা'লে যারা শেয়ার কিনবে তাদের দিয়ে অভিনয় করাবে?

টনিদা ঃ সেটা হয় নাকি? খালি টাকা ঢাললেই সে অভিনয় করতে পারবে? যে অভিনয়ের 'অ' টুকু জানে না, তাকে দিয়ে আমরা ফিল্মটা আমি কোনো মতেই করব না।

কুশল ঃ কিন্তু লোকে তো এই ভেবে টাকা দিচ্ছে যে তারা সিনেমায় চান্স পাবে। কিন্তু যখন তারা আসল ব্যাপারটা জানতে পারবে, তখন?

টনিদা ঃ (থতমত খেয়ে) আরে সেসব পরে ভাবা যাবে। আগে দ্যাখা যাক, লোকের মধ্যে কেমন সাড়া পড়ে, কত টাকা ওঠে, তারপর ভাবব না হয় সেসব।

স্বর্ণেন্দু ঃ তা টনিদা, যদি বানাওই শেষমেশ ফিল্ম কোম্পানি, তবে তার কী নাম রাখবে, সেসব কি ভাবলে কিছু?

টনিদা ঃ অ্যাঁ নাম? হ্যাঁ, তা বটে কী নাম রাখা যায়...(একটু ভেবে) এই তো পেয়েছি, টেনিদার গল্পে ফিল্ম কোম্পানির নাম ছিল 'ভজহরি ফিল্ম কর্পোরেশন'। আমাদের স্টুডিও-র নাম তা'লে দেওয়া যাক 'রাখহরি ফিল্ম কর্পোরেশন'। (কুশল, স্বর্ণেন্দু, কমলেশ একসঙ্গে হেসে ওঠে)

স্বর্ণেন্দু ঃ এটা কিন্তু একেবারে যা'তা হবে টনিদা। ভজহরি থেকে একদম রাখহরি! তোমার মাথায় আসেও বটে!

টনিদা ঃ ব্যাস্, আর কোনো সমস্যা রইল না তাহলে। আমি বিজ্ঞাপনের একটা খসড়া লিখে দিচ্ছি। তোরা প্রেসে দিয়ে আয়।
(একটা কাগজে খস্ খস্ করে কিছু লিখে ওদের দেয়)
কখন আসছিস তাহলে তোরা?

কমলেশ ঃ দেখি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়? সব মিটিয়ে ফিরতে বেলা তো হবেই একটু।

টনিদা ঃ ও হ্যাঁ, আর কিছু টাকা নিয়ে যা।
(পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে দিতে যায়)

কুশল ঃ আরে তুমি রাখো তো টনিদা, আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখন।

টনিদা ঃ আরে রাখ না।

কুশল ঃ ছাড়ো তো।

[কুশল, কমলেশ আর স্বর্ণেন্দু ডানদিকের দ্বিতীয় উইং দিয়ে বেরিয়ে যায়। আলো নিভে যায় সাময়িকভাবে।]

[আবার আলো জ্বললে দ্যাখা যায়, টনিদা টেবিলে বসে কিছু একটা লিখছে।]
[কুশল, কমলেশ আর স্বর্ণেন্দু ডানদিকের দ্বিতীয় উইং দিয়ে পুনঃপ্রবেশ]

স্বর্ণেন্দু ঃ (হাতে একতারা কাগজ টনিদাকে দেখিয়ে বলে) এই নাও, হয়ে গ্যালো। লোকের সাথে কথা হয়ে গ্যাছে। আজ বিকেল থেকেই দেয়ালে পোস্টার সেঁটে যাবে। আর অডিশনের ডেটটা, তোমার, পরশু করা আছে।

টনিদা ঃ আমিও স্ক্রিপ্টটায় একটু ফাইনাল টাচ্ দিচ্ছিলাম। বুঝলি? কয়েকটা জায়গা এত সুন্দর দাঁড়িয়েছে না, যে কী বলব!

[কমলেশকে একটা স্ক্রিপ্ট দেয়]

অগ্নীভ-র ওই ডায়ালগের জায়গাটা একটু পড় তো। একটু অভিনয় করেই বল দেখি।

কমলেশ ঃ (স্ক্রিপ্ট থেকে পড়ে) সাত্যকিবাবু, আপনার এ নাটক কি মঞ্চসফল হবে? দেখুন, আপনার লেখায় নতুনত্ব আছে মানছি, কিন্তু আপনার ভাষা যেন দর্শক আর অভিনেতার মাঝখানে একটা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টনিদা ঃ (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্ক্রিপ্ট থেকে পড়ে) আমি একজন শিল্পী আর আমার মূল দায়বদ্ধতা সত্যের কাছে, আমি জানি আমার মাথার পেছনে কোনো বৃত্তাকার বলয় নেই, কিন্তু হাতে কলম আছে, এই কলম যে ছুরির থেকে অনেক বেশি ধারালো, তাতে আমি বিশ্বাস করি, খুব গভীর ভাবেই করি। আমার ভয় করে চারপাশের এই শূন্যতা আর আদর্শহীনতাকে দেখে। মুখোশগুলো মানুষগুলোকে গিলে ফেলছে জানেন—রোজ রোজ দেখছি আর আমার মুখে থুথু জমছে। তবে এদের ঘৃণা ধাক্কা—এক ধাক্কার আখড়ায় মাঝখানে ফেলে দেওয়া। চেরা চাবুকের মতো ভাষা দিয়ে মুখোশগুলোকে ছিঁড়ে ফেলা। কিন্তু চাবুক দেখলেই এরা পালায়। আমিও তাই একটা মুখোশ পরেছি, আমার ভাষাটা একটা মুখোশ পরেছে। একটা দুর্গ যদি আপনার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে আসে, তখন? কী করবেন আপনি? পালানোর সব রাস্তা বন্ধ! মাথা ঠুকবেন, বোবা ইঁটে মাথা রক্তাক্ত হলে দেখবেন ডিমের খোলার মতো মুখোশে ক্র্যাক ধরেছে। আমার ভাষা কেন দূরত্বে বিশ্বাসী বুঝলেন?—আরো নিশ্চিতভাবে কাছে আসার জন্য। নির্লজ্জ আলোয় সব সত্যকে টেনে বের করে আনতে চাই আমি। (প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে বলে হাঁপায়।)

কুশল ঃ অসাধারণ টনিদা! (আশ্চর্যরকমের সুন্দর কয়েকটা কথা! যেমন ধরো ওই চেরা চাবুক। দারুণ!

টনিদা ঃ দ্যাখা যাক, অনেক খেটেছি রে, বিস্তর খেটেছি এটাকে দাঁড় করাতে, আর একটা জায়গা শোন—

(স্ক্রিপ্ট থেকে পড়ে) আমার শরীরে এখনো রক্ত আছে কিন্তু কলমের কালি দ্রুত শুকিয়ে আসছে। একটার পর একটা দরজা আমার মুখের ওপর বন্ধ হচ্ছে

—আঃ কী সুন্দর অন্ধকার! একটা মাত্র রাস্তা, একটামাত্র স্ক্রিপ্ট, মাত্র, মাত্র একটা সাফল্য চাই। আর যদি না হয়, না না, ভাবতে পারছি না। ভাবতে চাইনা আমি। কিন্তু সত্যি যদি না হয় তখন? আমি কি পালাব? কোথা থেকে পালাব? কোথায় পালাব? এখান থেকে? কতদূর? এই পৃথিবী থেকে? না না, কিন্তু, কিন্তু যদি ওই দূরের দরজাটাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসে? তখন? তখন? কী? কী তখন? হ্যাঁ কী, কী?

স্বর্ণেন্দু ঃ এটা সফল হবেই টনিদা, আমি লিখে দিতে পারি। এটা যদি সফল না হয়, তবে আমি জানি না কিসে সার্থক শিল্প হয়।

টনিদা ঃ আশা নিয়েই আছিরে, সেই একটা গান আছে না—

'আশা নিয়ে ঘর করি, আশায় পকেট ভরি'

(সকলের হাসি)

কমলেশ ঃ নাহ্ টনিদা আমরা উঠি এবার। মেঘে মেঘে বেলা নেহাত মন্দ হল না। আজ দিনটা বেশ ভাল কাটল। আর তোমার স্ক্রিপ্টটা...গায়ে কাঁটা দিচ্ছে এখনো।

টনিদা ঃ বেশ, তোরা আয় আজ। আর পরশু আসিস কিন্তু। সেদিন আবার অডিশন, রেসপন্স আশা করি ভালই হবে।

কুশল ঃ এলাম টনিদা।

কমলেশ ঃ টনিদা আসছি।

স্বর্ণেন্দু ঃ পরশু দ্যাখ্যা হচ্ছে টনিদা।

[কুশল, কমলেশ, আর স্বর্ণেন্দু ডানদিকের দ্বিতীয় উইং দিয়ে বেরিয়ে যায়। স্টেজের আলো সাময়িকভাবে নেভে। আবার আলো জ্বললে দ্যাখা যায়, টনিদা স্টেজে ইতস্ততঃ পায়চারি করছে। স্পষ্টত উত্তেজিত।]

টনিদা ঃ অন্তত কুড়িজনও যদি আসে...খেল খতম। করতেই হবে। সিনেমাটা দাঁড় করাতেই হবে।

[কুশল, কমলেশ আর স্বর্ণেন্দু স্টেজে পেকে ডানদিকের দ্বিতীয় উইং দিয়ে]

কমলেশ ঃ চলে এসেছি টনিদা। আর বাইরেও দেখলাম অনেক লোকই চলে এসেছে। এখনো সময় হয়নি বলে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

টনিদা ঃ আয়, আয়, বোস। টেবিলটা একটু ঘুরিয়ে দেতো। আর স্বর্ণেন্দু, তুই বাইরে থাক। একজন করে ঢোকাবি।

স্বর্ণেন্দু ঃ ঠিক আছে টনিদা।

[চারজন মিলে মাঝখানের টেবিলটাকে ঘুরিয়ে ডানদিকের উইংয়ের দিকে মুখ করিয়ে রাকে। তিনটে চেয়ার (বা টুল) এনে টেবিলের পেছনে রাখে। একটা চেয়ার টেবিলের উল্টোদিকে রাখে। স্বর্ণেন্দু ডানদিকের উইং দিয়ে বেরিয়ে যায়।]

স্বর্ণেন্দু ঃ (বাইরে থেকে) প্রথম জনকে পাঠালাম।

টনিদা ঃ হ্যাঁ, পাঠা।

[প্রথম অভিনয় আগ্রহী ভেতরে ঢোকে।]

টনিদা ঃ নমস্কার (চেয়ারটা দেখিয়ে) বসুন।

প্রথম অভিনয় আগ্রহী ঃ নমস্কার, আপনিই তাহলে অয়নাংশুবাবু! আমার নাম প্রীতম বসাক।

টনিদা ঃ হ্যাঁ, আপনি তাহলে আমাদের সিনেমায় বিনিয়োগ করতে চান? তা আপনি কত টাকা দেবেন?

প্রথম অভিনয় আগ্রহী ঃ দেখুন, আমার টাকার অভাব নেই। তা আপনি কত টাকা বিনিয়োগ করলে আমায় নায়কের পার্টটা দিতে পারবেন বলুন?

টনিদা ঃ আপনি আগে কখনো অভিনয় করেছেন কোথাও?

প্রথম অভিনয় আগ্রহী ঃ (একটু ভাবার সময় নেয়) ছোটবেলার ক্লাবে একবার, না, না, দু'বার করেছিলাম, মনে পড়ছে। একবার 'সেলফিস জায়েন্ট'-এ ফুলের ভূমিকায়; আর একবার গাছের ভূমিকায়। নাটকটার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।

[তিনজন পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে]

টনিদা ঃ তা আপনি তো আগে কখনো অভিনয় করেননি, হঠাৎ করে একেবারে নায়ক?

প্রথম অভিনয় আগ্রহী ঃ (খানিক রেগে) দেখুন মশাই, অতশত বুঝি না, টাকা ঢালছি। কত চাই বলুন আপনার (মানিব্যাগ থেকে তাড়া তাড়া নোট বার করে), ক্যাশ দিয়ে দেব—দশ-পনেরো-কুড়ি; খালি নায়কের পার্টটা আমার চাইই।

টনিদা ঃ (কিছুক্ষণ ভেবে) ঠিক আছে, আপনি কুড়ি হাজার দিন। আপনিই নায়ক হবেন। আর এই কাগজে আপনার নাম ফোন নম্বর দিয়ে যান, যথাসময়ে যোগাযোগ করা হবে। আর আজ যদি অন্তত কিছু টাকা দ্যান...

প্রথম অভিনয় আগ্রহী ঃ কিছু ক্যানো? ক্যাশ করিয়েই এনেছি। পুরো কুড়ি হাজার। এই নিন। (এক তাড়া নোট ফ্যালে)

টনিদা ঃ ধন্যবাদ প্রীতমবাবু, অসংখ্য ধন্যবাদ। পরে আপনার সাথে যোগাযোগ করব।

প্রথম অভিনয় আগ্রহী ঃ বেশ, আজ তাহলে আসি।

[প্রথম অভিনয় আগ্রহী বেরিয়ে যায়]

টনিদা ঃ পরের জন।

[দ্বিতীয় অভিনয় আগ্রহীর প্রবেশ]

আসুন, বসুন, আপনার নাম?

দ্বিতীয় অভিনয় আগ্রহী ঃ (একটু ন্যাকামি করে) আমার নাম শ্যামল পাল। আমি কিন্তু আগে বহুবার অভিনয় করেছি। গোরু-ঘোড়া-গাধা-কুকুর সমস্ত রোল আমার ঘোরা হয়ে গ্যাছে খালি মানুষটা বাকি। আর আমি কিন্তু নায়ক ছাড়া অন্য কোনো রোল করব না।

টনিদা ঃ আপনি কত বিনিয়োগ করতে চান?

দ্বিতীয় অভিনয় আগ্রহী ঃ দশ হাজার অব্দি দিতে রাজি আমি। একটাই শর্ত, নায়কের পার্টটা আমার চাইই।

টনিদা ঃ দেখুন, নায়কের পার্টটা তো অলরেডি বুক্‌ড্‌। তা আপনি না হয় নায়কের ভাইয়ের পার্টটা করুন।

দ্বিতীয় অভিনয় আগ্রহী ঃ না, না, চলবে না। খেলব না এরকম করলে। চাই চাই চাই। আমার নায়কের পার্ট চাইই।

টনিদা ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। আপনি না হয় নায়কই করলেন। এবার খুশি তো?

দ্বিতীয় অভিনয় আগ্রহী ঃ (উঠে দাঁড়িয়ে টনিদার হাত ধরে) আপনি খুব বড় মানুষ। দেখবেন আপনার সিনেমা হাউসফুল হবেই। আর এই নিন, ধরুন আমার চেকটা।

টনিদা ঃ কিন্তু এটা তো একটা শর্ট ফিল্ম।

দ্বিতীয় অভিনয় আগ্রহী ঃ আহা, তাতে কী? হাউসফুল হবেই।

টনিদা ঃ তারপর।

[তৃতীয় অভিনয় আগ্রহীর প্রবেশ]

টনিদা ঃ নমস্কার। তা আপনিও কি মশাই নায়ক হবেন নাকি?

তৃতীয় অভিনয় আগ্রহী ঃ (অঙ্গভঙ্গি করে) আমাকে আবার জানেন তো, ভিলেনের পার্টটায় হেব্বি মানায়। ভিলেনদের একটা আলাদা ক্যারিশমা আছে না, ওটা আমার হেব্বি লাগে!

টনিদা ঃ বেশ তো। আপনিই ভিলেন হবেন। সমস্যা কোথায়?

তৃতীয় অভিনয় আগ্রহী ঃ নাহ, রোলটায় একটু মশলা ঢালবেন, বুঝলেন? দুটো নাচ, তিনটে ফাইটিং, দুটোতে হিরোকে পুরো পাতলা করে ছেড়ে দেব। তিন নম্বরটায় না হয় মার খাব। বুঝলেন?

টনিদা ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনি যেমন বলছেন। তা আপনি কত টাকার শেয়ার কিনছেন?

তৃতীয় অভিনয় আগ্রহী ঃ দশ হাজারের। এই নিন চেক।

টনিদা ঃ ঠিক আছে। আপনার নাম ঠিকানা ফোন নম্বর লিখে এই ফর্মটা দিয়ে যান।

[তৃতীয় অভিনয় আগ্রহী তাই-ই করে, বেরিয়ে যায়]

টনিদা ঃ আর কেউ আছে নাকি?

স্বর্ণেন্দু ঃ এখনো দুজন।

টনিদা ঃ ওদের কাল আসতে বল।

স্বর্ণেন্দু ঃ ঠিক আছে টনিদা।

[স্বর্ণেন্দু এরপর স্টেজে এসে একটা চেয়ারে বসে, সবাই বিধ্বস্ত]

টনিদা ঃ আমায় একটু বিষ দিবি?

কুশল ঃ সত্যি কেউ খেয়াল করেনি পোস্টারে শর্টফিল্ম লেখা ছিল।

কমলেশ ঃ খালি টাকা, টাকা ঢালছি আর (ব্যঙ্গ করে) আমি নায়ক হব, মহানায়ক হব। যত্তসব।

স্বর্ণেন্দু ঃ তোমরা বাইরে তো দ্যাখোনি। নায়কের রোল করবে বলে দুজনের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি হয়ে যাচ্ছিলো। কোনমতে থামালাম।

টনিদা ঃ প্রচণ্ড বিরক্ত আর ক্লান্তি লাগছে জানিস। এদের টাকা আছে, কিন্তু সিনেমা নিয়ে কোনো ধারণাই নেই। ভাবা যায়!..যাই হোক, কুড়ি হাজারের ক্যাশটা নিয়ে এই দোকানটায় যা (চিরকুট দেখায়) আর ক্যামেরার খোঁজ কর।

কমলেশ ঃ কিন্তু এবার কী করবে? দু'জন নায়ক, একজন খলনায়ক...সত্যি তুমি যদি এমন একটা সিনেমা বানাও না...(হাসি)

টনিদা ঃ (কিছুটা গম্ভীর) নারে, হাসি পাচ্ছে না জানিস। এই লোকগুলোকে দেখে হাসি পাচ্ছে না একদম।

[আলো নিভে যায়। একটা মৃদু আলো জ্বলে—দ্যাখা যায় টনিদা শুয়ে আছে। এমন সময় ডানদিক থেকে স্টেজে ঢোকে বিচারবুদ্ধি। এই অংশটা টনিদার মনের মধ্যে অভিনীত হচ্ছে।]

বিচার বুদ্ধিঃ (ব্যঙ্গসুরে) টনি, বাবা টনি, একটু ওঠো, তাহলে আমি নায়ক হচ্ছি তো? হ্যাঁ বাবা? আমিও তো? বলো বাবা, বলো....

টনিদা ঃ (ঘুমের ঘোরে) না, তোমরা কেউ নায়ক হবে না, কেউ না...

বিচারবুদ্ধি ঃ (গম্ভীরভাবে) আমিও তো তোমায় সেটাই বলতে চাই। আচ্ছা টনি, তুমি সত্যি এত নিচে নামতে পারলে? এতগুলো লোককে আশা দেখিয়ে তারপর তাদের ইচ্ছেগুলোকে ভেঙে দেবে? এই লোকগুলো তোমায় বিশ্বাস করেছিল, তার বিনিময়ে তুমি এদের স্বপ্নগুলো নিয়ে পারবে এভাবে ছিনিমিনি খেলতে?

টনিদা ঃ (উঠে বসে বিচারবুদ্ধির মুখোমুখি হয়) তাহলে আমি কি করতাম বলো? আমার কি ট্যালেন্ট নেই। আমি অযোগ্য? আমরা কোনো বাবা-কাকা নেই বলে কি আমার লেখা খারাপ? চিন্তা-ভাবনা দুর্বল? এই কথাগুলো তোমার থেকে ভাল আর কেউ জানে না।

বিচারবুদ্ধি ঃ কিন্তু এই মানুষগুলোর কী দোষ? এরা ভালমতোই জানে যে, অভিনয় করার কোনো ক্ষমতাই এদের নেই। তাই টাকা ঢালতেও এরা কোনো কার্পণ্য করেনি। কিন্তু তুমি, নিজের স্বার্থে এদের এমন করে ব্যবহার করার অধিকার তোমার কেউ দ্যায়নি।

টনিদা ঃ নাহ, আমার কাছে শিল্পের মূল্য এই মাথামোটা পকেটভারি লোকগুলোর থেকে অনেক বেশি। আমি জানি আমার শর্টফিল্মটা রেকগনিশন পাবেই, তখন এরা নিজেদের প্রোডিউসার বলে জাহির করবে।

বিচারবুদ্ধিঃ কিন্তু এরা কি তা চেয়েছিল? এরা চেয়েছিল অভিনয় করতে। প্রতিভা নেই, তাই টাকা দিয়েছে। তাই তুমি, যে কিনা একজন শিল্পী (টনির দিকে এগিয়ে এসে কলার চেপে ধরে), একজন আদর্শবান শিল্পী বলে নিজেকে, পারলে এমন নির্লজ্জের মতো এদের ধোঁকা দিতে?

টনিদা ঃ শিল্পের ওপরে কেউ নেই।

বিচারবুদ্ধিঃ তাই, (দর্শকদের দেখিয়ে) এরা না থাকলে তোমার শিল্প কি লোকে ভাতের সাথে মেখে খাবে? এদেরকে দ্যাখো—তাকাও এদের প্রত্যেকের চোখের দিকে। শোনো, এরা কী বলতে চায়।

[দর্শকাসনে থেকে একজন অভিনয় আগ্রহী ব্যক্তি উঠে দাঁড়ায়। বলে—]

প্রথম অভিনয় আগ্রহী ঃ কী হল টনিবাবু? আমার নায়কের পাট? আমি শিল্প বুঝি না, কিন্তু টাকাটা বুঝি। হয় আমার নায়কের পার্ট দিন, নয়তো ফেরত দিন আমার কুড়ি হাজার।

[তৃতীয় অভিনয় আগ্রহী উঠে দাঁড়ায়]

তৃতীয় অভিনয় আগ্রহী ঃ মশাই, আমি শর্টফিল্ম বুঝি না। কিন্তু শিল্পীদের জানতাম একটা আদর্শ থাকে। তাদের কথার দাম থাকে। আপনি আমায় কথা দিলেন ভিলেনের পার্টটা দেবেন, তারপর আর সিনেমাটা করলেন না। শিল্পীদের লোকে কেন গালাগাল দ্যায় জানেন? আপনাদের মতো লোকের জন্য। আপনাদের মাইরি, পুলিশে দেওয়া উচিত।

[টনিদা ছিটকে পেছিয়ে আসে। স্টেজের পেছনের দিকে সরতে থাকে আস্তে আস্তে। আলো জ্বলতে নিভতে থাকে। এর গতি দ্রুততর হয় এবং শেষমেশ সব আলো নিভে যায়।]

[আলো জ্বললে দ্যাখ্যা যায়, টনিদা গম্ভীর মুখে বসে আছে। কিন্তু ভাবছে। একরাতে যেন বুড়িয়ে গ্যাছে অনেকটা।]

[কুশল, কমলেশ, স্বর্ণেন্দু ডানদিকের দ্বিতীয় উইং দিয়ে ঢোকে।]

স্বর্ণেন্দু ঃ টনিদা, পাওয়া গ্যালো না।

টনিদা ঃ (প্রথমে শুনতে পায় না, হঠাৎ খেয়াল করে) কিছু বললি?

স্বর্ণেন্দু ঃ তোমায় অ্যাতো বিধ্বস্ত লাগছে ক্যানো বলতো?

টনিদা ঃ আমি লোকগুলোকে ব্যাপারটা খোলাখুলি জানিয়ে দেব বুঝলি।

কমলেশ ঃ কী বলছ কী? তোমার কি মনে হয়, ব্যাপারটা জানিয়ে দিলে ওরা শর্টফিল্ম করতে এক পয়সাও দেবে?

টনিদা ঃ না রে, অনেক ভেবে দেখলাম, এটা করা ঠিক হবে না। লোকগুলোর রক্ত জল করা টাকা নিয়ে, ওদের স্বপ্নগুলোকে নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা ঠিক হবে না। এক আদর্শ ছাড়া আমার আর থাকার মতো কিছুই নেই। এমনটা করলে আমি সেটার সামনেও আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না।

কুশল ঃ কিন্তু টনিদা, তুমি এভাবে আদর্শের দোহাই দিও না। শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তুমি এটুকু করতে পারবে না?

টনিদা ঃ শিল্প আর শিল্পীর আদর্শকে কি আলাদা করা যায় রে কুশল...যাগগে বাদ দে। ফোনগুলো করি। তোরা একটু ঘুরে আয় বাইরে থেকে। আমায় একটু একা থাকতে দে।

স্বর্ণেন্দু ঃ ওক্কে, টনিদা। আমরা আধঘণ্টা বাদে আসছি।

[কুশল, স্বর্ণেন্দু আর কমলেশ ডানদিকের দ্বিতীয় উইং দিয়ে বেরিয়ে যায়। টনিদা ফোন করে। ফোন করে যারা পার্টের জন্য টাকা দিয়েছে, তাদের আসতে অনুরোধ করে। তারা সবাই বলে যে দু-ঘণ্টার মধ্যে আসছে। কথা বলে টনিদা স্টেজের মধ্যে পায়চারী করছে বিভ্রান্ত অবস্থায়।]

টনিদা ঃ (স্বগতোক্তি) নাহ, ওরা আসুক। মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে কোনো শিল্প হয় না। আমি কী চাই, সব সব বলবো। তারপর যদি ফিল্ম না হয়, তো না হবে।...কিন্তু, কিন্তু ওরা যদি টাকা ফেরত চায়? তখন, তখন কুড়ি হাজারটা ওহ, কুড়ি হাজার ক্যাশ, কোথায়? কোথা থেকে পাব আমি? ক্যামেরা নিয়ে আমার কী হবে এখন? নাহ্, পারছি না, আর নিতে পারছি না, কী করব? কী করব আমি?

[কুশল, স্বর্ণেন্দু, কমলেশ পুনরায় ডানদিকের দ্বিতীয় উইং দিয়ে ঢোকে।]

কমলেশ ঃ তোমায় একটা কথা বলার ছিল টনিদা...

টনিদা ঃ কিছু বলিস না আর। এবার মনে হচ্ছে আমি সত্যিই উন্মাদ হয়ে যাব। বোস, তোরা বোস। আমি একটু আসছি।

[টনিদা ভেতরে যায় বাঁদিকের দ্বিতীয় উইং দিয়ে]

স্বর্ণেন্দু ঃ আজ টনিদাকে বড্ড বিধ্বস্ত লাগছে না।

কমলেশ ঃ ক্যামন একটা অদ্ভুত ব্যবহার করছে না!

কুশল ঃ গতকাল অব্দি তো সিনেমা করার জন্য উৎসাহে ফুটছিল। আজ হঠাৎ কী হল—

[ওরা বসে। বই পড়ে চুপচাপ। বেশ কিছুক্ষণ হয়। তবুও টনিদা আসে না।]

কমলেশ ঃ এই টনিদা কোথায় গ্যালো রে?

স্বর্ণেন্দু ঃ হঠাৎ করে শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি? অনেকক্ষণ, প্রায় একঘণ্টা হতে চলল। দাঁড়া ভেতরে গিয়ে দেখি।

[স্বর্ণেন্দু বাঁদিকের দ্বিতীয় উইং দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাকি দু'জন আগের মতো বসে গল্পের বই পড়ে।]

[স্বর্ণেন্দু হঠাৎ ছুটতে ছুটতে আসে, বিভ্রান্ত—]

স্বর্ণেন্দু ঃ টনিদা কোথাও নেই।

কুশল ঃ মানে?

স্বর্ণেন্দু ঃ সারা বাড়ি খুঁজলাম। লোকটা পুরো উধাও।

কমলেশ ঃ এরকম হঠাৎ করে বসিয়ে রেখে টনিদা—

[ডানদিকের উইং থেকে আওয়াজ আসে। অভিনয় আগ্রহীরা এসে গ্যাছে। তারা বলে, 'অয়ানাংশুবাবু আমরা এসেছি, অয়নাংশুবাবু দরজা খুলুন।]

কুশল ঃ ওরা এসে গ্যাছে।

স্বর্ণেন্দু ঃ কী করবি এখন? টনিদা নেই, ওদের কী বলবি? ওরা আমাদের কথা শুনবে বলে মনে হয়।

কুশল ঃ কিচ্ছু করার নেই। চল পালাই।

স্বর্ণেন্দু ঃ পালাবি?

কুশল ঃ তাছাড়া আর কী? পেছনের দরজা দিয়ে কেটে পড়ি। চ—

স্বর্ণেন্দু ঃ টাকাটা?

কমলেশ ঃ ওহ্, ভুলেই গেছিলাম, দোকান তো আজ বন্ধ ছিল। ওটা নিয়ে কী করবি? লোকের টাকা। টনিদার দেরাজে রেখে দে তাড়াতাড়ি।

[ওরা পালিয়ে যায়। বাইরে গুঞ্জন বাড়তে থাকে। ওরা চিৎকার করে। শেষ অব্দি দরজা ভেঙে ঢুকে আসে।]

প্রথম অভিনয় আগ্রহী ঃ এরা কোথায়? কেউ নেই বলেই তো মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয় অভিনয় আগ্রহী ঃ আমাদের ফোন করে ডেকে নিজেরাই হাওয়া।

তৃতীয় অভিনয় আগ্রহী ঃ তাহলে আমাদের টাকা?

[সবাই একসঙ্গে, যেন একই সঙ্গে মনে পড়েছে, 'টাকা' বলে ওঠে।]

[ওরা টাকা খোঁজে, ঘর তছনছ করতে থাকে। পেছনে একটা নাটকীয় আবহসঙ্গীত বাজে। আওয়াজটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। শোনা যায়, টনিদার গলায় স্ক্রিপ্টে লেখা ডায়ালগ! "আমার শরীরে এখনো রক্ত আছে, কিন্তু কলমের কালি দ্রুত শুকিয়ে আসছে। একটার পর একটা দরজা আমার মুখের ওপর বন্ধ হচ্ছে—আঃ কী অন্ধকার! একটা মাত্র রাস্তা, একটা মাত্র স্ক্রিপ্ট, মাত্র মাত্র একটা সাফল্য চাই। আর যদি তা না হয়, না না, ভাবতে পারছি না, আমি, ভাবতে চাই না। কিন্তু সত্যি যদি না হয়, তখন? আমি কি পালাতে পারব? কোথা থেকে পালাব? কোথায় পালাব? এখান থেকে? কতদূর? এই পৃথিবী থেকে? না, না, কিন্তু কিন্তু যদি এই দূরের দরজাটাও বন্ধ হয়ে আসে আস্তে আস্তে ? তখন, কী তখন কী? হ্যাঁ, কী কী?" পর্দা নামতে থাকে ধীরে ধীরে।]

[সবাই স্টেজ থেকে বেরিয়ে যায়। টনিদা টলতে টলতে ঢোকে। পেছনে dialogue চলতে থাকে। 'আমার শরীরে এখনো রক্ত আছে...]

ভ্রমণকাহিনি

সবুজ পাহাড় ডাকে

অর্ণব সাধুখাঁ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

তারিখটা ২রা জানুয়ারি, ২০১৩। আমরা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মিরা ছুটে চলেছি কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে করে ডুয়ার্সের পথে।

পরদিন পৌঁছালাম হাসিমারা স্টেশনে। দুপুরের খাওয়া সারা। সন্ধ্যা হয় হয়। আমরা চললাম বল্লালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটোপাড়ায়। উদ্দেশ্য টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো নয়; 'টোটো'-দের সম্পর্কে জানা। টোটোরা ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু আদিবাসী সম্প্রদায়; সবমিলিয়ে প্রায় শ'তিনেক মানুষ। কথা হল অশোক টোটো-র সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে আমরা পেলাম নানান তথ্য—আদিবাসী সংস্কৃতির নানান মূল্যবান উপাদান। 'আয়ু' (মা) 'আপা' (বাবা) নিয়ে তাঁদের যৌথ পরিবার। মণ্ডল, কাইজি, দাংকোবি তাঁদের সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। প্রকৃতির এই মানুষরা প্রকৃতির বন্দনায় উৎসাহী। তাঁরা পুজো করেন পাহাড়-নদী-ঝরনা—এসব। এই পুজোর মধ্যে নিহিত আছে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের একাত্মতার কথা। ভাদ্র থেকে 'দেমসা'-য় (মন্দির) শুরু হয় অংচুপূজা। বাৎসরিক অংচুপূজা আসলে সমগ্র টোটোজাতির পুনর্মিলন উৎসব। উৎসবে তাঁরা মেতে উঠবেন 'মরুয়া'-র নেশায়। এই উৎসবে প্রত্যেকের যোগদান বাধ্যতামূলক; নতুবা মিলবে শাস্তি; জরিমানা দিতে হবে। সংখ্যালঘু টোটো উপজাতির মধ্যে অনেক উপ সম্প্রদায় আছে—১৩টি গোত্র তাঁদের। 'পাতাং' (বল্লম) তাঁদের রক্ষাস্ত্র।

আধুনিক সভ্যতা থেকে টোটোরা পিছিয়ে নেই। তাঁরা ভারতের মূল জনস্রোতে মিশে যেতে চান। তাই তাঁরাও পৌঁছে গিয়েছেন উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনে। ইতোমধ্যে তাঁদের সমাজের ৬ জন পুরুষ এবং ১ জন নারী স্নাতক হয়েছেন।

টোটোদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের নিজস্ব ভাষা আছে। সে ভাষার নাম 'টোটো ভাষা।' কিন্তু মনে রাখতে হবে তাঁদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও নিজস্ব লিপি নেই। তাঁরা কাজ চালান বাংলা লিপির সাহায্যে।

এরপর আমরা ঘুরলাম 'Jaldapara Wild Life Sanctuary' তে। প্রকৃতির বুকে উড়ন্ত ময়ূর, গণ্ডার (একশৃঙ্গ) দেখবার সৌভাগ্য হল। কোচবিহার জেলার এই অভয়ারণ্যটি ২১৬.৫১ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত।

আমরা দেখলাম পশুদের 'কয়েদখানা'—South Khairbari Nature Park.'

জলপাইগুড়ি জেলার 'Garumara National Park' দেখা হল 'মেদলা ওয়াচ টাওয়ার' থেকে। এখানে আমরা পেলাম 'আদিবাসী নাচনী আঁখড়া'-র নৃত্যের ছন্দোময় হিল্লোল।

দার্জিলিং জেলার 'বিন্দু'তে দেখা হল 'West Bengal State Electricity Distribution Company Limited'-এর 'Bindu Barage/Jaldhaka Hydel Project.' আমাদের কাছে উন্মোচিত হল জলবিদ্যুতের রহস্য।

লাভায় গিয়ে আমরা পৌঁছলাম কুয়াশা আর সবুজে ঘেরা 'Kagyu Thekchenling Institute' মনেস্ট্রিতে।

ঋষভ যাওয়ার পথে আমরা ঢুঁ মারলাম Wild Life Division II এর অন্তর্গত 'Neora Valley National Park'-এর Nature Interpretation Centre'-এ। এই Valley কে একসময় বলা হতো 'পাখিদের স্বর্গরাজ্য।' কিন্তু এখন কোথায় পাখি? তারা সব এখন ছবির পটে এবং মডেল হিসেবে বিরাজমান।

ঋষভ পৌঁছলাম পাহাড় ট্রেকিং করে। সবুজ আর কুয়াশা। যেন মেঘ রাজ্যে প্রবেশ করেছি। অন্ধকার নেমে এসেছে। নক্ষত্রখচিত পথে হেঁটে চলার অভিজ্ঞতা সত্যিই অসাধারণ।

কালিম্পং যাওয়ার পথে ঘুরলাম 'Deolo Tourism Complex'—উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় রং বেরঙের নাম-না-জানা পাহাড়ি ফুলে সাজানো বাগান।

'Pineview Nursery' তে না গেলে আমরা জানতেই পারতাম না প্রকৃতি 'ক্যাকটাস'-কে কত রঙে কত রূপে সাজিয়ে দিয়েছেন। ১৯৭১ সাল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ক্যাকটাস এখানে পরম মমতায় লালিত হচ্ছে।

এরপর আবার আমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণে আমরা শিখেছি নানান প্রতিকূলতা কেমন করে অতিক্রম করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়; কেমন করে পথ চলতে হয় হাতে হাত ধরে। আর এভাবেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আমাদের জীবন অভিজ্ঞতার ঝুলি।

"আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগতকে ভালবাস দেখি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীক্ষেত্র ভ্রমণ

নীলাদ্রি শেখর চক্রবর্ত্তী
শিক্ষাকর্মী, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

প্রায় প্রতি বছরই পুরী ঘুরতে যাই। কিন্তু সেটা হয় শীতকালে অথবা গ্রীষ্মকালে। এবারে একেবারে ঘোর বর্ষাকালে। ২০১৫-এর ১৪ই আগস্ট আমরা ৮৫ জন ইউথ হোস্টেল, হাওড়া শাখার পরিচালনায় হাওড়া স্টেশনে বিকাল ৫টা ৩০মিনিটে জড়ো হলাম। এত জন একসঙ্গে এভাবে কোনোদিন যাইনি। বেশিরভাগই অচেনা। অথচ তাঁদের অনেকেই আমাদের বাড়ির কাছাকাছি থাকেন। হাওড়া স্টেশনেই বেশ কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হল। সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে চেপে পুরীর উদ্দেশে রওনা দিলাম। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ খাবার খেয়ে যে যার বাঙ্কে শুয়ে পড়লাম পুরীর চেনা দৃশ্যগুলোকে মনের মধ্যে নিয়ে।

ভোর পৌনে পাঁচটা নাগাদ যখন পুরী স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াল তখন তুমুল বৃষ্টি চলছে। হালকা আলো-অন্ধকারে আমরা ষ্টেশনের বাইরের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ইউথ হোস্টেলের কয়েকজন আগেরদিনই পুরী চলে এসেছিলেন, তাঁরাই আমাদের নিতে এসেছেন। স্টেশনের বাইরে গাড়ী ভাড়া করে রাখা আছে, আমরা সবাই কিছু কিছু করে স্টেশনের বাইরে যেতে লাগলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাওয়া চলছে। কোনো রকমে মালপত্তর নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ীগুলি ৮ জন করে নিয়ে আমাদের হোটেলের দিকে চলল।

প্রত্যেকবারের মতো এবারেও দৃষ্টিটা সমুদ্রের দিকে গেল যখন গাড়ীটা স্টেশন থেকে আসার পথে বাঁদিকের কোনো একটা মোড় ঘুরেই সমুদ্রের মুখোমুখি হওয়া যায়। এতো বৃষ্টিতে সমুদ্রের দেখা মেলা ভার হলো। শুধু গর্জন শোনা যায়। এই গর্জন সেই পরিচিত গর্জনের থেকে আলাদা শোনালো। প্রতিবারই স্বর্গদ্বারের কাছে থেকেছি। এবার গাড়ী ছুটল সমুদ্রকে বাঁদিকে রেখে সোজা লাইটহাউসের দিকে। লাইটহাউস ছাড়িয়ে আমাদের হোটেলের গাড়ীবারান্দায় গাড়ী থামল। সেখানেও ইউথ হোস্টেলের দু'জন কর্মকর্তা ছিলেন যাঁরা আমাদের হোটেলের রুম নম্বর জানিয়ে সেইসব ঘরে প্রত্যেককে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। আমরাও আমাদের নির্দিষ্ট রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে যখন বাইরে এলাম তখন দেখলাম বৃষ্টি থেমে গেছে। আর সমুদ্র ঠিক রাস্তার ওপারেই তার স্বমহিমায় বিরাজ করছে। ১৫ই আগস্টের সকালটা ফিসফ্রাই, চা ইত্যাদি দিয়ে ভালই শুরু হল। মধ্যাহ্নভোজনের মূল আকর্ষণ হল ইলিশ মাছ।

ঠিক হল সোমবার যেহেতু নন্দনকানন বন্ধ থাকে, তাই রবিবার ১৬ই আগস্ট কোনারক, নন্দনকানন, ইত্যাদি বেড়ানো হবে। রবিবার ভোর চারটেয় উঠে যা দেখলাম ও শুনলাম তাতে মন একেবারে দমে গেল। মাঝরাত থেকে খুব বৃষ্টি চলছে। তাতে আশেপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আর তারজন্যেই আজকের বেড়ানো বাতিল। একটা নতুন উদ্যমে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। সব ভেস্তে গেল বৃষ্টির জন্যে। যাইহোক সকালে যখন উঠেই পড়েছি আর ঘুমোব না। সবাই মনমরা হয়ে রইলাম। সকাল ৭টা নাগাদ

বৃষ্টি থেমে গেল। তখন কর্মকর্তারা ঠিক করলেন বাস যখন ভাড়া করা আছে তখন সবাই ঘুরেই আসি। কিছু জন অবশ্য হোটেলে থেকে গেল। আবার তাড়াতাড়ি করে সবাই তৈরী হয়ে বাসের দিকে চললাম...। রাত ৮টায় আবার হোটেলে ফিরে এলাম।

পরের দিন সোমবার খুব ভোরেই স্নান সেরে চললাম জগন্নাথ দর্শনে। সবাই মিলে অনেকগুলো অটো ভাড়া করে চললাম মন্দিরে। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে খুব কাছ থেকে দেখে মনে তৃপ্তি হল। পরে সবাই আবার হোটেলে ফিরে আসলাম।

আমাদের মধ্যে অনেকেই দেখলাম শিক্ষক বা শিক্ষিকা। এঁদেরই মধ্যে একজন শিক্ষিকা শোনালেন জগন্নাথদেবের এই রূপের কারণ। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার রাজা। তখন বৃন্দাবনে নাকি শ্রীকৃষ্ণের নাম নেওয়া বারণ ছিল। কারণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে অনেক নারী নাকি আকুলা হয়েছিলেন। তাই নতুন প্রজন্মের কাছে শ্রীকৃষ্ণের লীলা অজানা। তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ শুধুই রাজা। কিন্তু দু-একজনের কাছে কিভাবে এই লীলার খবর চলে আসে। তারা তখন গুরুজনদের কাছে বিস্তারিত জানতে চায়। তাঁরা কিছুতেই বলতে রাজি হন না। পরে সুভদ্রাকে অন্যঘরে সরিয়ে তাদের বিস্তারিত জানান। সুভদ্রা পাশের ঘরে থেকেও সমস্ত শুনে ফেলেন। তাতে তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত হয় ও দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। এই অবস্থায় অনেকক্ষণ কেটে যায়। কিন্তু প্রকৃতিস্থ হন না। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এটা বুঝতে পেরে তাঁরা বোনের পাশে উপস্থিত হন এবং তাঁরাও বোনের অশ্রু দেখে তাঁদেরও চক্ষু বিস্ফারিত হয় ও দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। বহুক্ষণ এইভাবে কেটে গেলেও তাঁরা প্রকৃতিস্থ হতে পারেন না। এমন সময় নারদ উপস্থিত হন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেমে যাবে দেখে শ্রীকৃষ্ণ, বলরামকে এই অবস্থা থেকে বের হবার জন্য স্তব করেন। তাতে তাঁরা প্রত্যেকে প্রকৃতিস্থ হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নারদকে খুশি হয়ে বর দিতে চান। নারদ বলেন যে, তিনি সন্ন্যাসী, তাই তাঁর কিছু বর লাগবে না। বরং তিনি যদি মর্ত্যবাসীকে এই রূপ দেখার সুযোগ করে দেন তবে ভালো হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেন শ্রীক্ষেত্রে তাঁদের এইরূপের পূজা প্রচলিত হবে। তাই জগন্নাথদেবের এইরকম মূর্তি।

মঙ্গলবার, ১৭ই আগষ্ট, সন্ধ্যেবেলা সবাই রাস্তার ওপারে সমুদ্রের ধারে বা এপারে হোটেলের গাড়ীবারান্দায় বসে গল্প করা হচ্ছে। এমন সময় এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাচ্চা নিয়ে একপ্রকার দৌড়ে রাস্তার ওপার থেকে আমাদের হোটেলে এলেন। ইনিও আমাদের সঙ্গে এসেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, দৌড়ে আসছেন কেন? তিনি বললেন সমুদ্রের ধারে তাঁরা বসেছিলেন। তাঁরা দেখলেন একটা বাচ্চাছেলের মত একটা প্রাণী সমুদ্র থেকে হামাগুড়ি দিয়ে যেন উঠে আসছিল। তাই দেখে আমাদের একজন কর্মকর্তা সেটাকে ধরতে যেতে সে আবার জলে নেমে গেল। আমরা কয়েকজন সমুদ্রের ধারে গেলাম। ঐ কর্মকর্তাকে সেখানে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও তাই বললেন। যদিও অন্ধকার ছিল, তবুও তিনি একটু কাছ থেকেই দেখেছেন। আন্দাজে বললেন শীল বা সমুদ্রঘোটক নয়। বেশ খানিকটা বাচ্চাছেলের মতই লাগছিল। তিনি আফসোসও করলেন যে ধরতে পারলে বেশ ভালো হত। কেউ কেউ বললেন না জলের প্রাণীদের জলে বেশি জোর, যদি তোমায় টেনে নিয়ে যেত কেউ কিছু করতে পারতাম না।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ একটা লটারীর আয়োজন হল। এর টিকিট অবশ্য আগের দিন কোনারক ঘোরার সময় বাসে প্রত্যেকের কাছে ৫টাকা প্রতি টিকিট হিসাবে কর্মকর্তারা বিলি করেন। আমাদের মধ্যে যত বাচ্চা ছেলে ও মেয়েরা ছিল তাদের দিয়ে এই লটারীর টিকিটের কাউন্টার পার্ট তোলানো হল। প্রাইজ হিসাবে পুরীর বড় বড় হাঁড়ি, থালা, জগন্নাথদেবের মূর্তি ইত্যাদি ছিল। এই খেলাটাও খুব উপভোগ করলাম। যাঁরা প্রাইজ পেলেন তাঁদের অভিনন্দন দেওয়া হল।

কোথা দিয়ে যে কটা দিন সমুদ্র স্নান, চারিপাশ ঘুরে দেখা, আর কেনাকাটা ইত্যাদি করে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। মনে হল আরো কটা দিন হাতে থাকলে ভালো হত।

১৮ই আগস্ট, বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় আবার পুরী স্টেশনে এলাম বাড়ী ফেরার উদ্দেশ্যে। মন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। বেশ কটা দিন সবাই মিলে একটা পরিবারের মত কাটালাম। কত আপন হয়ে উঠেছিলাম। আবার সব ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। পরের দিন সকালে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন পৌঁছতেই সবাই যে যার বাড়ী ফেরার ব্যস্ততায় মেতে উঠল। আমরাও ট্যাক্সি ধরে আবার পুরানো জায়গায় ফিরে এলাম।

"কাজ করা চাই বই কি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছাড়া থাকা উচিত নয়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

"সংগ্রাম—শুধু সংগ্রাম, যতক্ষণ আলো দেখা না যায়, ততক্ষণ সংগ্রাম করতে হবে। সেজন্য অগ্রসর হতে হবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

নয়াদিল্লীর বিজ্ঞানভবনে ০৩-০৪-২০১৮ তারিখে NIRF আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জাভড়েকরের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ।

চিত্র সৌজন্য ঃ 'এই সময়' পত্রিকা

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশততম আবির্ভাব বার্ষিকীতে আয়োজিত আন্তঃকলেজ মহাবিদ্যালয় অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারিণী লীনা সাঁকি (শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়)-এর নিবেদন।

The 'Congress Exhibition' of Calcutta, 1901 & 1906

Prithwiraj Biswas

Associate Professor and Head of Department of History

"Exhibitions have a special value. They teach us not by words, but by deeds."[1]

The 'Indian Industrial Exhibition', first held in Calcutta, 1901 was historic in many respects and not just for its role in the endorsement of Swadeshi industry and enterprise. It was the first exhibition under the aegis of the Indian National Congress and the first exhibition held as part of its annual session. This brief essay focus on the first and the sixth such exhibition, both held in Calcutta, by a study of ephemeral data like advertisements as also news reports. While the larger economic agenda of the grand old party was clearly manifested in these exhibitions, the later, it seems also had a positive outcome in the societal life of Colonial Bengal.

One of the methods adopted by the nationalists' to popularize Swadeshi was exhibitions. Swadeshi was apparent and inherent from the objectives stated in publicity materials released for its propaganda. For example, an advertisement of the first Industrial Exhibition declared, "The object of the exhibition is to preserve encourage and develop indigenous industries."[2] Exhibitions were not new to the indigenous populace since exhibitions of diverse variety were occasionally held, ranging from small local fairs to the first ever grand International Exhibition in 1883-84.[3] The exhibitions organised by Europeans were however professionally managed, and its power to attract visitors to successfully fulfill the aim of the organizers were not missed by the national leadership. As a result, an exhibition modeled on western lines was conceived to showcase Indian manufactures and natural products as part of the annual sessions of the Indian national Congress (henceforth INC).

The aim and need for such a fair was elaborately declared: "The prosperity and power of all the advanced nations of the world are due to their arts, industries and enterprise, and if India is ever to take her place amongst them she must rise in the same way. Her arts and industries have been the admiration of the world both in ancient and modern times, but from want of enterprise they are fast deteriorating and some have already died out. Our great country once more to be recognized as such has only to develop her resources and to revive her lost arts and industries. Every day of inaction on our part in this respect means so much material loss to our people. Our continued apathy in this matter means a willful impoverishment of our country and deliberate handing over of our national wealth to the more energetic

1 Quote attributed to Sir Lawrence Jenkins.

2 The Bengalee, 7th December, 1901

3 Which incidentally, was held also in Calcutta, at the premises of the Indian Museum.

and wealthy nations of the world. We consider therefore, that the question affecting our industrial revival and development is next to none that is engaging public attention at the present moment. We feel that immediate steps should be taken by the Indian public for preserving our existing industries reviving those that have died out or are showing signs of decline and of developing others which may advance our national prosperity. As a preliminary step we suppose(sic) to hold an Indian Industrial Exhibition at Christmas time 1901 in the Beadon Gardens at Calcutta with a view to encourage and improve the existing industries and to promote and develop new ones. We are sure that our object will meet with the sympathy and support of every class of community."[4]

The exhibition solicited 'All articles of indigenous art or manufacture or natural or agricultural products from .....India..." as exhibits. Additionally, "Implements or machinery of foreign manufacture likely to promote or develop indigenous industries..." were allowed to be exhibited but was ineligible for any awards. The awards in the form of medals were sponsored by "several distinguished *raises(sic)*[5] and representatives of the noble and aristocratic houses of Bengal'.[6] As a truly professional exhibition along modern lines, detailed rules of the exhibition was clearly specified and reported in the major dailies.[7] For example, anyone desiring to participate in the exhibition, had to apply in a prescribed form, and were designated stalls measuring 5ft by 5ft, free of charge; however if an exhibitor desired more space, he had to pay 8 annas per additional square feet. Again exhibitors had to mark their goods 'plainly with prices in Indian currency for the information of the jury and the public.' Exhibitors also had to 'submit their goods for adjudication to the jurors." The members of the Exhibition Committee included illustrious princes like Maharaja Surja Kanta Acharya Bahadur who was the President and others like Maharaja of Nattore, Nawab Abdus Subhan Chaudhuri etc. Noted personalities of various standing like Surendranath Bannerjee, Gogendranath Nath Tagore, Radha Raman Kar, Trailuckyo Nath Mukherjee, Krishna Kumar Mitra, businessman and entrepreneurs like Dhannu Lal Agarwalla, Mr.S.K.Burman (founder of Dabur), Sett Lal Chand and well-known professionals like Dr.Nil Ratan Sircar etc were also members. Some Europeans sympathetic to the Indian cause were also enlisted like E.B.Havell (Principal of the Government Art College) Mrs. David Yule (of Andrew Yule) etc.[8]

---

4 The Bengalee, 4th December, 1901

5 Men of wealth and status.

6 Ibid. italics original; raises means the rich..

7 Ibid,5th December, 1901. A similar transformation was apparent in the fair or mela around this time. Prithwiraj Biswas,*'Fair' play in Swadeshi: The changing contours of 'mela' in Colonial Bengal (c.1890-1915)*, paper presented in Indian History Congress, 28th December, 2017

8 ibid

An advertisement listing medals and certificates meant for awarding deserving exhibitors make it clear, that was the focus of the nationalist were cotton, silk, woolen fabrics, dyeing, printing and embroidery on such fabrics, leather articles, metal works, iron ware, cutlery, wood work, and handicrafts, mills, machines and mine products, seeds, cereals, agricultural and natural products, glass, pottery, chemicals and chemical products, inventions and designs, fine arts.[9] To bring out the best in participants of specific categories, it was announced that "H.H. the Maharaja of Kuch Behar will award three gold medals, one for the best loom, the second for the best sporting requisite and the third for the best oil painting.[10]"

The first Indian Industrial Exhibition held in December 1901 in Beadon Gardens, Calcutta was historic in many respects and not just for its promotion of Swadeshi. It was the first initiative by the collective national leadership, the first exhibition under the aegis of the INC and the first session of the INC to hold an exhibition as part of its annual meeting.[11] Swadeshi was taken rather seriously as seen in a report asking delegates who were attending the annual session to '...as far as practicable, appear in dress made of materials manufactured in this country.'[12] The image of anglicized moderates and delegates was sought to be changed drastically much before Gandhi revolutionized the nationalists' attire. Again Swadeshi was extended to food habits; those delegates who preferred European food was charged four Rupees a day but the same was free for those partaking desi foods cooked 'in orthodox style.[13] The first Indian Industrial Exhibition inspired other nationalist minded Indians to organize similar Exhibitions in different parts of the country. For example one of the earliest of such exhibition was held in Tangail. The Tangail Industrial and Agricultural exhibition seems to have been a success as seen from a report.[14] The success encouraged the organizers of the same to organise it the following year too. It was met with success with over five thousand people visiting the exhibitions. "Lectures on industrial and agricultural subjects were delivered." At the closing ceremony, the President of the exhibition "...appealed to the public to unite themselves and try to revive the indigenous industries."[15]

Calcutta also hosted the sixth chapter of the Indian Industrial Exhibition in 1906. The 'Industrial and Agricultural Exhibition' as it was now known,[16] was held on an

---

9 ibid, 7th December, 1901

10 ibid, 15th December, 1901

11 Form the Beneras session, (1905) it was renamed Industrial and Agricultural Exhibition. Op cit,11th June, 1905

12 Op cit, 15th December, 1901

13 Op cit, Notice, 17th December, 1901

14 Op cit, 28th February, 1902

15 Op cit, 1st March, 1903

16 In the Benares session of INC (1905), it was renamed as the Industrial and Agricultural Exhibition, befitting its role of showcasing the best of industry and agriculture. Op cit,11th June, 1905

even grand scale that overshadowed the first exhibition. While the participation of European firms in the first exhibition was practically nonexistent, the sixth saw substantial European participation. This made a difference in the nature of exhibits displayed. The latest in various industrial and heavy machineries were displayed. These included colliery winding engines, mortar mills, steam engines for oil, flour milling plants, jute presses, steam pumps and pumping plants. Another exciting feature was the interest shown by the 'Government of Bengal' to showcase 'articles from its agricultural, arts, forest, sanitary and other departments.'[17] While the union of foreign and indigenous articles and machinery seemed out of sync with the swadeshi spirit, the organizers explained the move as justified one. The 'combination of articles of indigenous growth and manufacture-for which the event is particularly intended-and the latest improvements in machinery and appliances of foreign manufactures ...are likely to help and develop Indian industries .."[18] A press correspondent observed, 'Indigenous methods of manufacture of the different provinces have much in common... (they) do not provide a productive source of information. Thus 'it is to the west and the Far East that..... (one must) look for fresh ideas.'[19] In any case, it was felt that since 'Indian artisans (we)re by general consent an intelligent body, ready to imbibe and adopt new ideas,' the country stood to benefit from their learning experience.

The exhibition of 1906 covered a large area, about 60 bighas of land that included three water tanks. The Bengalee suggested to the organizers if the three tanks could be connected to make it appear like a canal and put a few gondolas in it. This would then, it was hoped 'give an Earl's Courts touch to the exhibition and certainly add to its picturesqueness.' The designer of the exhibition was Mr. Edward Thornton, F.R.I.BA and the famous landscape gardener S.P Chatterjee worked on the landscaping.[20] A ladies section of the exhibition was also organised with Mrs. C.G.H Allen and Mrs. P. N. Bose as secretaries. The purpose was to highlight and encourage 'all kinds of handiwork prepared by ladies in India irrespective of any caste or nationality'.[21] The exhibition committee through advertisements invited tenders for electric installation at the exhibition a process that started from 7th December[22] Participants who were putting up stalls publicized their involvement in the exhibition by advertising in the newspapers. For example an ad of Bengal Chemical and Pharmaceutical reminded readers not to fail to visit its stall in the

---

[17] Op cit, 6th October,1906
[18] Op cit, 6th October,1906
[19] Op cit, 30th December,1906
[20] Op cit, 6th October,1906
[21] Op cit, 14th October, 1906
[22] Op cit, 8th November,1906

exhibition.[23] Similar advertisements were given others taking up stalls; for example, that by 'Mistanna Bhandar' of Harrison road, a shop specializing in 'swadeshi sweets'.

While the economic agenda of the nationalists' were apparent, the exhibition seems to have been a great liberating experience for the indigenous women. This is seen from a letter to the editor by a lady who chose to remain anonymous and signed herself as 'a woman of India.' Here she notes with great satisfaction the mingling of ladies belonging to high and middle class with the general crowds in the exhibition. She also observed ladies having tea with gentlemen at the tea stalls set up at the grounds. This was a radical departure rarely seen in social spaces in colonial India. Even in the first Indian Industrial Exhibition, the ladies, particularly those belonging to the upper and middle classes, could come down for a visit only after a specific slot for was booked for them in advance. But not anymore; the writer notes with satisfaction how emancipated the women had become as seen in their presence in large numbers not only in the exhibition. The writer states that the exhibition ultimately proved to be a 'great social reformer.' And that 'the purdah system is disregarded by orthodox and high born Hindi ladies'. She notes that "Indian ladies under the influence of western ideas and other forces at work in modern life are regaining freedom which they lost during the Mahomedan period."[24]

The Congress exhibition opened the flood gates of more such exhibitions. While there are numerous reports of such exhibition from all over the country, a few from the province of Bengal in order of chronology, as reported in the press were, the Noahkhali Industrial exhibition,[25] Jessore Industrial and Agricultural Exhibition,[26] Khulna Exhibition,[27] the 'Uttarpara Sammilani' art, agriculture and industrial exhibition[28] and others. Organised to fulfill larger politico-economic objectives, these exhibitions perhaps went beyond their anticipated intent to influence the social life in Colonial Bengal also.

---

23 Op cit, 22th December, 1906

24 Op cit,14th February, 1907

25 Op cit 17th February, 1910

26 Op cit 7th April, 1910, Under the presidency of Mr.S.K.Agasti which was opened on 23rd February.

27 5th February,1914

28 Op cit, 28th December,1913 & 11th January,1914

BOLSHEVISM AND UNREST IN THE INDIAN LABOUR WORLD

Debasis Pal

Assistant Professor, Department of History

In India, the Russian Revolution and communism have become synonymous in popular imagination and academic parlance. But there was a time when it was not so, and a centennial year is an occasion when it is worth remembering the more complex story of inspiration and legacy that are an outcome of the events of 1917 in Russia.

Bolshevism, is not, like other sciences, simply a science of politics and economics submitting itself to changes due to criticism. A true Marxian or a Bolshevik will admit of no change in the body of theories of his faith. The Bolsheviks demand power, dictatorship of the proletariat, as they say, to reform human mind, to dispossess capital and to teach everyone in society to work for the common good.[1] Lenin had outlined the practical steps by which working people of Eastern countries could take the pattern of non-capitalistic development to socialism in alliance with the forces of victorious socialism.[2] He also maintained the view that Communist Russia should support the national liberation movements in Asian countries including India regardless of their ideological bases.[3]

Two factors always played a vital role in the development of communism in India. One was the inspiration, guidance and support provided by the international communist movement since the time of the Russian Revolution (1917) and the other one was provided by the growth of the national movement dominated by the Indian National Congress under Gandhi, from 1920-21, onwards. The cross-currents of nationalism and internationalism always swayed the Indian communist. Naturally enough, the Communist Party of India had a close relationship with the working class movement of the country. The shifts in the policy and strategy of the communists inevitably affected the course of the working class movement.[4]

Impact of Russian Revolution greatly inspired the working classes of the western capitalist countries in their fight for a socialist revolution and a proletarian state. 'The Herald' and 'The Labour Leader' published reports on the Russian Revolution which were intended to amplify news received through the usual channels and to instruct labour generally as to the actual nature of the revolution. It is argued that Alexander Kerensky, key political figure in the Russian Revolution, was ejected by the will of the Russian people and that he is an outcast and imposter. The Bolsheviks are held to be the true representatives of the Russian people and defenders of the revolution against the aggressions of monarchism and capital, because they have

been able to maintain their authority for a year without organized military assistance, with no censorship and free press. The intervention of the Allies in Russia is regarded as being solely in the interests of capitalism. The Independent Labour Party militated considerably against Kerensky's mission to England and to some extent nullified his efforts. Papers such as 'Justice', which were outside the Independent Labour Party, denounced its attitude towards the Russian Revolution under Lenin and Trotsky, they were not in favour of the intervention of the allies but they certainly suspect the Bolsheviks of being agents of Germany and not bona fide workers in the cause of democracy.[5] It is impossible to say how near the Independent Labour Party approaches actual Bolshevism but it is significant that it is ready to meet Bolsheviks delegates at International Socialist and Labour Conferences and recognize them as representatives of the Russian democracy.

The national liberation movement of India, her labour movement particularly were also marked with the inescapable influence of this world-shaking event. The Intelligence Branch, Criminal Investigation Department, Bengal, reported [6] on 27th August 1919 that a new organization had been set up in Calcutta on the lines of the English trade unions and entitled the, India Employees Association.? Its object was to promote the general status of the clerical community in mercantile and trades firms in Calcutta. A general meeting attended by about 62 people was held on 23rd August 1919, under the presidency of Rai Radha Charan Pal Bahadur at which the object of the association was explained. A leaflet was circulated with the signature of honorary secretary. There was nothing in the facts reported to indicate that it was not a genuine body organized for economic purposes and was not the first instance of the organization of labour in India. At the same time it must be noted that such organisations in times of stress offer the agitator a tempting opportunity for political exploitation and there was in contemporary England a spurious agitation on behalf of Indian labour which spread to India. in 1919, J. E. Potter or Potter Wilson, a trade unionist, with the support of Dr. K. S. Bhat, President of The Workers' Welfare Leauge, Saklatvala, Secretary of the Indian Committee, A.G. Field who apparently founded the league and is one of the London Pan-Islamist was general secretary, was an original member and J. M. Parikh, President of Indian Committee, tried to revive the, Workers Welfare League of India? from its inactivity. Potter Wilson's idea as expressed by himself, was ,One Grand Union of the Orient? He hoped to arouse all Asians to demand equal trade union conditions with British workmen. He intended to push the agitation vigorously not only in India, but in every country where Indians work and all labour under colonial domination will be encouraged to demand higher wages and trade organisations.[7]

In Leicester 15 and in London 3, English trades union branches are affiliated to the Workers Welfare League of India?. B.P. Wadia united the Indian Trade Unions

with the League; Madhavrao, Satyamurti, Yakub Hassan and M.A. Jinnah joined it. Its programme was that all racial and religious differences were to be abandoned and Hindu, Muslim, Parsi and Sikh communities were to work on a common basis to raise the status of the poor. Neil Maclean was to act as spokesman in the House of Commons. The League was to appeal for support in the name of humanity and when funds sufficed, Saklatvala and anothers were to obtain appointments to speak in every centre of Trade Unions. Having obtained a sufficient Trade Union backing, Potter Wilson would be ready to fight Government in India and England. He supported the Anglo-Ottoman Society and did all he could for Turkey in order to create a strong religious tie, which was to be the basis of an Islamic Federation as the counterpart of his, Grand Union? Madavrao and Satyamurti are reported to have committed themselves to the Labour Party and to intend to introduce in the next National Congress in India a resolution advocating labour principles. They also tried to form trade unions in India through which they could harass the Government.[8]

It is difficult to believe that Indian agriculturists and workmen cannot long be deceived by this sort of thing. Their welfare seems to be the last thing these schemers contemplate. A meeting of workmen in Bombay just repudiated their self-constituted leaders Tilak and Wadia. Wadia, who was sent as a deligate to the International Labour Conference, asked Saklatvala in England to help in organising workers in India into a strong trade union Congress and workers federation in cooperation with other labour-leaders.[9]

The Indian Workers' Welfare League was appointed the representative of the AITUC and the services of Saklatvala were recognised in the inaugural session. Chaman Lal, who too was associated with the Workers' Welfare League thought in terms of the formation of an All India Labour Union. The government felt that the idea of holding an All India Trade Union Congress emanated from Chaman Lal himself, who was a professed Bolshevik.[10]

The trade union activities of Indian labour, particularly the wave of strike-struggles conducted by leaders in the post-war period were visibly influenced by this proletarian revolution.[11] Even though, strikes are no new thing in India. In the past owing to the ignorance and lack of organisation of the strikers they had generally been led by some disinterested person often of the lawyer class and generally of advanced political views. This fact considered with the other fact that industrial unrest swept India from end to end, wherever strikes have occurred to allegations being freely made that outside influence has engineered them. For example, the number of strikes that have taken place in Indian since 1918, the history of which are written in blood.[12] It is not the object of this note to prove or disprove this hypothesis, because no widespread inquiry has been made into it. But it is may be of interest simply to record the facts that are known.

In the first place the economic justification of unrest and epidemic of strikes can hardly be denied. The enormous increase in the cost of living is patent. It effects Europeans and Indians alike. Economic causes alone seem insufficient to account for it, and that speculation and profiteering are largely contributory causes to it is the conviction of many.[13] The movement begun in one place and spread to neighbouring places, and in any particular place it started in one mill and spread to others of the same industry or to other industries. But there are facts pointing to outside influence behind these strikes. The duration of some of the strikes and the demands put forward by the men point to something more than the economic difficulty having moved them. In most places workers have put themselves at the head of the strikes. In some cases these men have not been notorious as politicians, in others they have been notorious leaders of extremist party or local members of that party. The strike doctrine has been inculcated into Indian labour by various politicians at different times. At Cawnpore it is reported that the strikers talked among themselves about B. P. Wadia, at Bombay an Indian journal declared that the doctrines of Saklatvala, if not his name, are circulating among the mill hands. Approaching the question from the other side it was reported some time ago that Tilak and his extremist co-workers had decided to take up the Indian labour question, because on various occasions they had been taunted due to their inability to represent the labouring masses of India. The value of solidarity has already been realised by the Indian workers. The president of Madras Union, Mr. Wadia, writes- Indian labour understands that men working on the railway in Punjab, in the mills of Bombay, in the engineering shops of Bengal, are no better off than those working in the mills of Messrs. Binney & Co., Madras. The distance of a few hundred miles makes no difference in their solidarity, which alone will lead them to the final victory, the destruction of wage slavery.[14] In Leon Trotsky's words-if the Indian people do not wise to remain as slaves for all eternity, then they must expose and reject those false preachers who assert that the sole enemy of the people is fascism. Hitler and Mussolini are, beyond doubt, the bitterest enemies of the toilers and oppressed. They are gory executioners, deserving of the greatest hatred from the toilers and oppressed of the world...the oppressed classes and peoples - as Marx, Engels, Lenin and Liebknecht have taught us – must always seek out their main enemy at home, cast in the role of their own immediate oppressors and exploiters. In India that enemy above all is the British bourgeoisie...India is deprived not only of democracy but of the most elementary right of national independence. Imperialist democracy is thus the democracy of slave owners fed by the lifeblood of the colonies. But India seeks her own democracy, and not to serve as fertilizer for the slave owners.[15] There is another and perhaps more important phase of the question. After the first World War nationalization of mines agitation in England, the suggestion

that coal should be imported from India to relieve any shortage in England. Speaking on this, Williams, the labour leader, declared that to meet this step would be taken to raise Indian labour to the level of English. This is the avowed object of a body known as the Worker's Welfare League of India. The league was apparently founded late in 1917 in London, its principal object being stated to be –Independently of all political movements or aims, to advocate the institution in India of Provision for the welfare of the working population, equivalent if not identical with that granted to the work people of Great Britain.[16] The league was to seek the co-operation of trades unions for the furtherance of this object.

At first the league besides the general committee had two special committees, one for English and one for Indian affairs. The work of British committee was to seek the co-operation of English Trade Unionists in order to carry out the object of the league. Trades Unions were affiliated to the League and conferences of trades union representatives have been held under its auspices. Its own meeting have been regularly held and its members, especially Saklatvala, have addressed Labour audiences on its behalf. Most of the speeches and particularly his were very objectionable and violent. Potter Wilson early declared his intention of making the League a power in the labour world, and the threat to English labour from cheap unorganized Indian labour has been steadily rubbed into English audiences.[17]

In a leaflet issued in 1918 the League drew attention to the influx of capital into India to start new mills, railways, etc., declared that one object of the League was to get into touch with the various workers welfare societies in India and supply, information, encouragement and even help from the workers of England to the workers of India in the event of any great trouble? Yet few indications of direct relations with India came to light in England. A conference of trades union epresentatives in 1918 referred in a resolution to the Kam Hilvardah Sabha of Bombay. The Indian deputations in 1919 furnished the League with some new recruits. Wadia, Madhav Rao and Satyamurti joined it openly while Yakub Hassan and M.A. Jinnah associated themselves with it. A meeting held 18th September 1919 last showed that B. C. Pal, Velkar, Chaman Lal and Dip Narayan Singh were member of or associated with the League. A further meeting on November 20th, gave letters to Satyamurti and Madhav Rao, who were returning to India, authorizing them to act on behalf of the League in India. A similar letter was to be given to Chaman Lal who was proceeding to India later. In India too there are few indications of the work of League. In an extreme Pro-Bolshevik speech in Calcutta on December 17th last B.C. Pal openly preached its creed :

So, that is danger. It is that the League seeks to uplift Indian labour. That indeed is inevitable if India is ever to advance industrially. But the League is animated by a violent anti-British spirit and openly advocates Bolshevism.[18]

Saklatvala and A. A. Mirza in England distributed Bolshevik literature and the latter addressed Bolshevik meetings. And the League itself was in close touch with W. F. Watson, John Arnall, John MacLean, the Bolshevik 'consul' in Glasgow was not long ago sentenced to five years imprisonment for sedition, Tom Mann, notorious agitator and friend of Emma Goldman, an anarchist was deported America to Russia. All these men were open and professed Bolsheviks. The speech of B. C. Pal, referred to above, embodied the creed of the League. Among its other members who returned to India were Satyamurti, Madhav Rao and Chaman Lal. Proof is lacking, but the facts quoted point to the possibility of the League being behind the labour troubles in India.[19]

The Russian Revolution of 1917 and phenomenon of world-wide labour awakening that Followed were the obvious implications. The real impact of these historic events on Indian labour did not escape the political insight of the shrewd imperialist government. Thus one can conclude that if fruitfully applied the ideals of Bolshevism as embodied in the thoughts and actions of individuals like B.P Wadia, Satyamurty and others will led to the improvement in the status of industrial workers in the future.

End notes:

1. S. A. Dange, Gandhi vs Lenin, Bombay: Liberty Literature Co., 1921, pp. 24 and 33
2. Nirula Singh Nirula, India and the Soviet Union 1917 to 1947, New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation, 2005, p.24
3. David N. Druhe, Soviet Russia and Indian Communism: 1917-1947 With an Epilogue Covering the Situation Today, New York: Bookman Associates, 1959, p. 24
4. Nirban Basu, The Political Parties and the Labour Politics-1937-47: With Special Reference to Bengal, Calcutta: Minerva Associates(Publications)(P)Ltd. 1992, p. 52
5. Weekly Report,15th February 1919, C.I.D/I.B File No. 117A/1920, West Bengal State Archives
6. Weekly Report, 8th September 1919, Ibid
7. Ibid
8. Ibid
9. Nirula Singh Nirula, India and the Soviet Union 1917 to 1947, p.14-15
10. G. Adhikari(ed.), Documents of the Communist Party of India, 1917-1922, Vol. 1, New Delhi: PPH, 1971, p.25
11. Sukomal Sen, Working Class Of India: History of Emergence and Movement 1830-1970, Calcutta: K. P. Bagchi & Company, 1977, p.130
12. Abani Mukherjee, 'Indian Labour Movement: A Review of the Situation', The Communist Review, Cmmunist Party of Great Britain, Vol.3 No.5 , September 1922
13. Criminal Investigation Department, Intelligence Branch, west Bengal, File No. 117A/20
14. Ibid
15. Leon Trotsky, 'An Open Letter to the Workers of India', New International [New York], Vol.5 No.9, September 1939, pp.263-266
16. Criminal Investigation Department, Intelligence Branch, west Bengal, File No. 117A/20
17. Ibid
18. Ibid
19. Ibid

Sister Nivedita : The Cauldron of Patriotism

Spandan Banerjee
3rd Year, Ecoa

On the evening of the sesquicentennial birth anniversary of Sister Nivedita, the most famous disciple and spiritual daughter of the cyclonic Hindu monk, Swami Vivekananda, it is only fitting that a proper appraisal of her role in one of the less discussed aspects of her plethora of activities be discussed, that is, her contribution to the Indian struggle for Independence.

It is often seen that for achieving a very noble cause, if one is trying hard enough, help often comes from most unexpected quarters. Our freedom fighters and national leaders were putting up a good resistance against the oppressive and exploitative policies of the British Raj. The pitiable plight of countless Indians deprived of the basic amenities of life, prompted many sympathetic foreigners to support the struggle for freedom. Notable among these were Sir Allan Octovian Hume, Annie Besant, and Sister Nivedita.

Nivedita is widely acclaimed for her various social welfare activities and her unswerving devotion to Swamiji's ideals. However historians have for long neglected her significant role in the Indian freedom movement. It is against logic to ignore such a personality who was the single biggest idol of many young radical nationalists alongside her Guru, Swami Vivekananda. A ridiculous logic for denouncing the sister's role in the freedom movement is that she was not arrested by the police for revolutionary activities nor was she mentioned much in official Police records. That she evaded arrest only goes to show her astute and all alert nature. Her fiery speeches filled with encouragement for armed revolutionaries had tremendous influence on many radicals like Barin Ghosh, Aurobinda Ghosh and Hemchandra Ghosh. She did not like young people who were cowards and had a meek sheep-like attitude towards the British. She also critilised the moderate notionalists for their mild, non-confrontational approach. Once, during a prize distribution ceremony at a college, she chastised the students who had received awards for performing well in a cricket tournament for neglecting indigenous sports and endorsing a foreign sport. She encouraged them to pursue training in wrestling, fencing and others.

The Ramakrishna Mission, a completely apolitical organisation, was running the risk of inviting police interrogation and surveillance and the President, Swami Brahmananda and secretary, Swami Saradananda, were especially worried that the Mission might be dissolved if it was seen as interfering in politics. Nivedita had

taken the plunge into active politics after Swamiji's Mahasamadhi and was seen as a rabble-rouser by the British. Out of compulsion, the mission severed formal ties with Sister Nivedita, though she maintained a cordial and warm relationship with the monks of the order. Many radicals were irked by the Mission's apparent desertion of Nivedita, though later on learning the truth they acknowledged the logic behind the Mission's decision.

Lord Curzon, the Viceroy, infamous for his decision to partition Bengal in 1905 in order to widen the gap between Hindus and Muslims, in a speech at a convocation ceremony at Calcutta University, had once denounced all oriental people as dishonest, saying that the western world was more honest in its dealings. Not one Indian, seated at the ceremony, raised a finger against Curzon. However, Nivedita, also present there, was outraged at this blatant insult to the Indians and later presented evidence that Curzon was known to make false statements and was not saint himself. It caused a furore in the country when her retaliation along with proof were published in leading dailies like “Amritabazar Patrika” and “The Statesman”.

Her contributions towards the upliftment and empowerment of the Indian women can also be seen as one of her many ways of, giving a new meaning to the word “nationalism”. She taught the girls at the school she established for them in Bagbazar in Calcutta to be self-reliant and fend for themselves. Swamiji once said that a nation which oppresses its women cannot prosper and is bound to be doomed. The women of India had certainly lost the stature they gained in the ancient vedic ages and fell into a miserable plight. Nivedita did not attack Indian traditions, rather she tried to blend modernity with them. She taught the girls sewing, knitting and even how to use guns. Her inspiration spurred many women to participate in the Indian freedom movement.

Nivedita had also a commanding influence over towering personalities who ushered in the Indian renaissance. She encouraged the development of literature and arts, as seen from her close friendship with Rabindranath Tagore and her patronisation of Abanindranath Tagore and Nandalal Bose. She believed in the need for developing science and technology, and was very affectionate towards the great scientist Acharya Jagadish Chandra Bose, who she regarded as her ‘Khoka’ (Child in Bengali) even though he was ten years older than her. The Tamil Poet Subhramanya Bharati was once chastised by Nivedita for failing to accord due respect to his wife. His life became transformed after that and he developed into a fiery poet with patriotic fervour.

All of these actions blended perfectly with Sister Nivedita's ultimate aim of making India great again and fulfilling the dreams of her Guru, Swami Vivekananda.

Even her social welfare activities had a patriotic touch to them. Netaji Subhas once said that "I understood India through Swami Vivekananda's work, and Vivekananda through sister Nivedita's work." Clearly, Subhas became Netaji because he read Swamiji and Nivedita's works. She served as " a friend, Mistress and Servant all in one" to India's people as Swamiji had hoped in his "Benediction" poem. Lastly, which could be said to be a fitting tribute to the sister's sacrifices for the nation, we mention the writing on the plaque at Roy Villa in Darjeeling, where the Sister breathed her last, which says, "here lies Sister Nivedita, who gave her all to India." This pretty much sums it up all. We should strive to live up to her legacy and not merely content ourselves with singing her praises. We should not let her sacrifices go in vain. Only then shall we truly pay our greatest tribute to the greatest "foreign" daughter of Mother India.

> Not only…these, but I shall keep my heart open for all (religions) that may come in the future. Is God's book finished? Or is it still a continuous revelation going on? It is a marvellous book—these spiritual revelations of the world…I would leave it open for all of them.
>
> **—Swami Vivekananda**

The Wavy Puri

Arkaprabha Adhikari
2rd Year, UG, Microbiology

A land bound with the salty water of ungirdled ocean filled up with sonorous, mellifluous warblings & Kaleidoscopic prayer flags swaying languidly in the nippy breeze—can be none other than, Puri, the sanctum of odisha, where the holiness & natural beauty have merged with each other in the waves of the ocean.

A year ago, I got a chance to visit Puri with my family. My Father gave me the news at first about this tour after the Durgapuja. A rapturous joy filled my heart. I started my packing with ebullient mind. At last the day came, the date of journey. Our train was from Howrah at about 9.30 p.m. I completed my dinner with my family in the nearby restaurant. Then we arrived at station at about 9.00 p.m. We saw the dazzling Puri express waiting for us. We entered into the train & took our seats. We organized our baggage. I took my seat at lower berth. After sometime the wheel started to roll. The opprobrious, monotonous life made me flummoxed, disturbed As soon as the train started to move, I cut myself free from the tedium of my claustrophobic, lackadalisical life & set out to relish the beauty of the sea. I wrapped a quilt over me as the whole compartment became dark. I could only hear the cacophony of the wheels & the sound of snoring of the passengers within the train. The effervescence of my heart forced me to keep my eyes open. I was peeping through the glass of the windows. It was dark outside but I could feel the presence of grassy greenish fields, the huts, the ponds, sometimes, the skyscrapper building. Everything was just triggering my longing to reach Puri. Next day at about 9.00 a.m. the radiant sunbeam fell upon my eyelids through the glass. Then I heard my father say "wake up, wake up" quickly! We will arrive within 1 hour." I quickly brushed my teeth & washed my face and took the baggage. At last I saw the platform, a line was visible in the board—"Welcome to Puri." My heart jumped up. When I landed on the station, I saw many tourists, many vendors, an obstreperous condition—but my heart reeled with joy. After landing on the station, We hired a taxi and went to our hotel which was already booked by me through my android phone. We took two rooms—one for my parents & one for me only. I saw my room well organized & clean & I felt relaxed. Then we took our meals at hotel. Then I rushed to the sea beach & listened to the roar & rumble of the sea. I stood near the awesome sea. The surging waves were just touching the tip of my toe & enthralling me. I bathed in the sea, scuffing with the waves & took some selfies. I diffused all my anguish in the water of the perilous sea. After a mind boggling bath, we came back to our hotel & took our lunch. The lunch was scrumptions with variegated veg items,

pickled rice & sweets. Then owing to the tiredness of train journey siesta engulfed me. At about 5.00 pm., I wokeup and sipped a cup of coffee. As I looked through the window, I saw the diaphonous ether becoming crimson & at last the evanescent welkin somewhere mingled with the sealine at horizon. The surroundings took on a veil of evening. Then we set out for marketing at the sea-beach. Multifarious objects, toys & food items were being sold by the local people. We bought many things for our uncles, aunts, cousins, and neighbours. My mother bought sarees, my father bought some shirts and trousers from local market. Then we took our dinner at a local restaurant. Next day was our final day in Puri. At early morning we completed our bath & went to the famous Jagannath Temple. The temple was packed with lot of pilgrims. The gridlocked condition, tremendous sweating, etc. made me uncomfortable but when I saw the big idol of God Jagannath, I became overwhelmed. I prayed in front of God & then I circumatnbulated the temple. The bodacious sculpture of the Temple flabbergasted me. I took some photos & came back to hotel I quickly changed my dress & got ready for bath. I rushed to the sea beach & jumped into water. I played with the waves, made some buildings with sand. Then I took our lunch in hotel, packed our luggage and took some rest. Our departure time according to the train schedule was 6.30 pm. Before setting out for station, I went to see the ocean for last time. It was dusk, the birds were flying back to their nest, fishermen were returning to their home with buckets of fishes. I looked at the sky, where the sunset made the sky extravagant & the pulchritude of the nature was reflecting in the waves of the Bay of Bengal. The rumble of the wave thrilled me again & also for the last time. Then as my father called me, we set out for train. Tears streamed from my eyes, as humdrum life will be upon me again.. The train started & I bade good bye to Puri. Now, I am in the city but the waves of the unfettered ocean still beckons me again & again. Sometimes, I think like John Keats.

> "That day so soon glided by...
> like the passage of an angel's tear
> that falls through the clear ether silently."

Modern Science and Ancient Indian Culture

N.V.V.J. Swamy

(Department of Physics, Bhavnagar University)

No area of science has perhaps made as deep inroads into philosophy as modern physics with its mistifying quantum Theory and enigmatic Relativity. The Uncertainly Principle, Duality. observation and the observer, symmetry between space and time. past and future, curvature of space-time, cause-effect anomalies are all thought provoking concepts which go beyond the domain of their applicability in physics. Be that as it may, those who are familiar with ancient Indian culture, the wisdom of the Vedas, Upanishads and the epics, can vouch for the amazing number of precise utterances about several aspects of life, material as well as philosophical -whether it is about the size of the soul of a human being or the shape of the universe, the ancients had unambiguous notions and these have been conveyed to us in articulate pronouncements. While many scientists have the opinion that these are more subjective beliefs devoid of scientific substance, it is equally true that science, on the other hand, has been increasingly helpful in throwing some light on some of these otherwise inscrutable concepts and making them understandable to at least those who are not anxious to summarily dismiss all this as imaginative poetry. In this paper we would like to draw attention to two areas of interaction between modern science and ancient Indian culture. One of these areas can be broadly classified as cosmology and the other as the paranormal.

In Hindu chronology the smallest unit of time is the time taken for the batting of an eyelid or the time taken for the inhalation of breath. This is comparable to the second of the westerners. The next bigger unit is the Vighati which is the equivalent of 24 seconds. 60 Vighatis make a Ghati and Sixty Ghatis make a day. A ghati thus signifies 24 minutes. It is interesting to note that the ancients had a fascination for the number 60. The seven days of the week are named after the seven major planets in the Solar system, as in the west. It is ironical that the day named after the Sun, but for whose energy the earth be extinct, is sabbath day of rest for a majority of the world's population. The Indian planetary system recognizes nine planets in contrast to seven of the westerners, from which the names of the days of the week are derived. The points of intersection of the orbit of the earth around the sun and the Moon around the Earth, called ascending and descending Nodes in Western Astronomy are personified as the planets Rahu and Kethu.

The Vedic month is a synodic month and this lunar month of thirty days is today reckoned essentially from New Moon to New Moon. The lunar months, chaitra, vaisakha etc. do not coincide with January, February etc., of the Julian Calender and to understand these one should discuss the interesting concept of Nakshatras or Asterisms (groups of stars) of the ancient Indians. These are 27 in number and are listed in Table I together with their equivalents in Western astronomy. The traditional Hindu belief is that the Nakshatras are lunar mansions personified by the 27 daughters of Daksha and the consorts of Moon who, incidentally, is regarded as a male planet.[(2)] Each one is divided into four quarters of 3'20' duration and the 108 quarters make up the 360° of the zodiac. For instance four quarters of Ashwini, four of Bharani and one of Krithika span the zodiacal sign aries (Mesha). The zodiacal signs have the same symbolism in East and West. In the Hindu calculations the longitude of a planet is given according to its location in a particular quarter of an Asterism instead of its angular position from the first point of Aries. The names of the lunar months are associated with the Asterism in which the full moon is likely to fall. There are six Indian seasons, as against four of the Westerners, and these are shown in Table II. As can be seen therein, the starting month of the year is Chaitra. The year itself is believed to follow a Jupiter cycle, the mean motion of Jupiter through one sign of the zodiac. The first day of Chaitra for instance (the start of the New Year to many in India) is the day after New Moon with the Sun entering pisces, the succeeding month starting similarly when sun enters Aries and soon. The twelve lunar months. however, total only 350 days as against 365 days in the solar year. This discrepancy is taken care of by adding an intercalary month of 30 days every sixth year. This is usually done when two New Moons occur between two solar transit times, the lunar starting from both New Moon endings bearing the same name. Thus there is periodical agreement of the lunar and solar calendar such that in six years each covers total of 2190 days. The years have names too, starting with Prabhava and ending with Akshaya, which has no parallel in the West. Here once again is a cycle of sixty years. For instance in March 1987 a new cycle has started with Prabhava. Story goes that these are associated with the sage Narada's (a confirmed bachelor) longing to taste womanhood and becoming Naradi begetting sixty children.

Then follow bigger building blocks of time which are typical of Hindu Cosmology and which have no strict parallel in the West.Those are Yugas, Mahayugas. Manvantharas and Kalpas. Before discussing these in detail, two points have to be borne in mind. The day of the ancient Hindus is different from the night and includes a dawn and twilight. The Yugas follows the same pattern. Secondly the duration of the latter is defined in terms of divine years, each divine year being the equivalent of 360 solar years. The total duration of a Mahayuga is 4.32 million solar years and

is composed of four yugas as follows :

Maha Yuga (Great Age)

Yuga	Divine Years	Solar Years
Kritha Yuga (Golden Age)		
Dawn	400	144,000
Yuga	4,000	1,440,000
Twilight	400	144,000
	4,800	1,728,000
Treta Yuga (Silver Age)		
Dawn	300	108,000
Yuga	3,000	1,080,000
Twilight	300	108,000
	3,600	1,296,000
Dwapara Yuga (Bronze Age)		
Dawn	200	72,000
Yuga	2,000	720,000
Twilight	200	72,000
	2,400	864,000
Kali Yuga (Iron Age)		
Dawn	100	36,000
Yuga	1,000	360,000
Twilight	100	36,000
	1,200	432,000
Maha Yuga = Total of Solar Years	12,000	4,320,00

The different Yugas are sometimes referred to as 4,3,2,1 type. It is the traditional belief that the story of Ramayana actually happend in the Thretha Yuga and that of Mahabharata in the Dwapara Yuga. Some indeed believe that the start of the current Kali Yuga should be reckoned with the last day of Mahabharata period.

According to the surya siddhanta[3] the commencement of Kali Yuga is midnight of 17/18 February 3102 B.C. at which epoch the planets are assumed to have been in mean conjunction for the last time. Seventy one such Mahayugas make a Manvanthara the duration of which is computed as follows :

	Divine Years	Solar Years
71 Mahayugas	852,000	306,720,000
Twilight	4,800	1,728,000
	856,000	308,448,000

Fourteen such Manvanthares form a Kalpa (Aeon)

14 Manvanth areas	11,995,200	4,318,727,000
Early Dawn at the beginning of a Kalpa	4,800,800	1,728,000
	12,000,000	4,320,000,000

Thus the total duration of a Kalpa is a thousand Mahayugas or 4.32×10^9 solar or 4.32 billion solar years. It is believed that at the beginning of each Kalpa all the planets are in conjuction. In his book "Gravitation" prof. J. A. wheeler[4], a great astrophysicist and a colleague of Einstein at Princeton, refers to this idea of Kalpa as the original cosmological speculation. It is interesting to note that in the same book he also quotes the following verse on "Time" from the Mahabharata of Vyasa :

Time is awake when all things sleep
Time stands straight when all things fall
Time shuts in all and will not be shut
Is, was, and shall be are Time's children
O'Reasoning, be witness, be stable.

Padma Kalpa being over, the reigning aeon is Varaha Kalpa in which we are in the seventh Manvanthara called Vaivasvitha Manvanthara. The Manvantharas of Swayambhuva, Swarochisha, Utthama, Thamasa, Raivatha and Chakshusha are over. With uncanny vision of the future the ancients also laid down the names of future Manvantharas—Savarini, Daksha, Brahmasavarni, Rudrapurthra, Rauchya and Bhautya. The starts of the Great Bear Constellation or Ursa Major are personified as seven sages - Saptharishis-named Atri, Bharadwaja, Gautama, Jamadagni Kashyapa, Vashishtha and Vishwamithra. It appears these will come down to earth in each Manvanthara, set right all errors in the scriptures and then go up to assume their stellar roles. The interesting thing is that their names in future Manvantharas

are also prescribed. A Kalpa or Aeon is but a day in the life of Brahma and there is a night of equal duration. Brahma's lifespan is taken to be a hundred years. Half of his life is past and we are in the first day of his 51st year. All this is perhaps the oldest cosmological speculation known to man.

There is a reason for not dismissing the above as grandiose poetry or unscientific speculation. The span of Kalpa 4.32×10^9 years or 4.32 billion years does echo something in modern physics. Archaeologists, Anthropologists have used Radioactivity as a clock to determine the age of a geological or biological or archaeological specimen. Radiocarbon dating, for instance, has become a standard procedure for determining the ages of materials like decaying wood. Now in the Uranium series U^{238} is a parent atom which, through a well known series of decays, ultimately becomes stable lead (Pb^{206}). The intermediate elements in the series, Thorium, protoactinium, Americium and Polonium are short-lived, at least on the time scale of an Aeon. If we assume that only Uranium atoms were present at the beginning of Creation, then what we will have today is a mixture of Uranium and lead. Nuclear experimentalists generally believe that a mixture of 8 grams of lead per gram of uranium is what exists today. From the known law of radioactive decay the time required for this mixture to be established happens to be given by the formula

$$t = (1/\lambda_u)\,(N_{pb}/N_u + 1)$$

Where λu is the radioactive decay constant of Uranium (4.88×10^{-18} sec^{-1}) and N_{pb}/N_u is the ratio of number of atoms of lead to uranium in the mixture. Calculations show that

$$t = 1.34 \times 10^{17} \text{ sec}$$
$$= 4.25 \times 10^9 \text{ years.}$$

When we compare the figure of 4.25 billion with the 4.32 billion years of a Kalpa, the agreement in the order of magnitude is indeed striking. Although the age computed on the basis of the radioactivity of Uranium pertains to the solar system, we do not as yet know of the existence of human life elsewhere in the universe, nay not even on other planets of the solar system. If the ancients are talking about the future of Man and his extinction, it may not be altogether absurd to suggest that the difference of 0.07 billion years may be the time left for life to end on this planet. It is well known that the sun is likely to lose all his energy and die someday and without the sun the earth cannot survive either. Even if the numerical figures cannot be taken to be literally true, the ideas of the ancients seem to be in consonance with modern scientific thinking. It can be argued that there is no evidenc that the ancient Indians had any idea of Radioactivity or Nuclear Physics and that this is too far fetched an unscientific extrapolation. We will later go into the question of why there is no acceptable scientific arugument in almost any of the utterances in ancient works.

Two others astrophysical phenomena remind one of ancient Indian concepts. Prof. S. Chandrasekhar, the renowned astrophysicst and Nobel Laureate said that a reasonably massive star, compared to the Sun, becomes a white dwarf in its old age. Robert Oppenheimer and his associates have shown that an even more massive star eventually collapses into a neutron star barely a few Kilometres in diameter. Pulsars, discovered in the sixties, are considered to be neutron stars. A star is usually in hydrodynamical equilibrium because of the balance between gas pressure and light pressure on the one hand and gravitational attraction on the other. When all the thermonuclear sources of energy are exhausted, the star starts collapsing because of the internal gravitational attraction between different parts of the star itself. It is now known that stars, sufficiently massive to begin with, ultimately become invisible Black Holes out of which nothing can escape, not even light. Everything in the vicinity of a Black Hole is sucked in because of the almost infinite gravitational pull. It is conjectured that there is a black hole in our own Galaxy. This concept of everything being sucked in reminds one of the 89th hymn of the Rigveda Mandala 7 (Mrinamayam Griham) as also of the Viswarupadarshana in the eleventh chapter of the Bhagawadgita. It is equally interesting to note that the age old notion of Brahmanda or Brahma egg (Hiranyagarbha)[5] mentional in Manusmrithi for instance, parallels the conclusion that Einstein arrived at in his cosmological speculations about the shape of the Universe. He maintained that the universe is finite but unbounded and ellipsoidal in shape.

The admirable researches of great psychologists like Freud, Jung and Mcdougall led to the uncovering of the Subconscious state of the mind. The ancient Indians, however, appear to have knowledge of a superconscious state leading to supernormal or paranormal capabilities. The powers of the sages (Rishis) can only be characterised as supernormal if not supernatural. The Yoga sutras of Patanjali, nicely summarised by Swami Vivekananda in his "Raja Yoga", contain what may be construed as prescriptions for acquiring talents like clairvoyance and Telepathy, to mention only the least spell-binding ones. The late Prof. J.B. Rhine of Duke University in U.S.A. is usually credited with introducing scientifically tenable tests for investigating such paranormal phenomena. Two laser physicists of the stanford Research Institute (SRI) of Menlo Park, California in U.S.A.-Puthoff and Targ[6] have been conducting experiments for more than a decade to investigate these phenomena. The details of their approach can be known from their published work. The following is a brief description of their scientific experiment. The experimental group consists of an experimenter, a subject and a target demarcation team of a couple of other experiementers. To shield them from stray electromagnetic disturbances, the subject and the experimenter are closeted in what is called a Faraday cage. After synchronising their watches, the target demarcation team drives for exactly 30 minutes and reaches

a target location like a Park or a Stadium. This target itself is randomly selected by the experimenter in the car while driving. After reaching the target they are then advised to watch something for 15 minutes. During this time the subject, far away from the target location and completely ignorant of it, is asked to describe his impressionl of the target site into a tape recorder and to make up any drawings he thought appropriate. These experiments, carried out to "investigate those facets of human perception that appear to fall outside the range of well understood perceptual or processing capabilities" revealed the existence of a high quality "remote-viewing" ability. The accumulated data from over fifty experiments showed that his telepathic ability is not dependent on distance over a range of several kilometres. Most of the correct information given by the subjects is of a non analytic nature pertaining to shape. form or colour. The nature of this information channel coupling remote events and human perception is sought to be understood in terms of the current knowledge of Information Theory, Quantum Theory etc. The IEEE Proceedings paper has several drawings made by subjects together with comparisons with the originals. The important point is that these do establish the existence of telepathic abilities at least to some extent. A Nobel Prize winning biologist. Sir J.C. Eccles[7] has been investigating whether mental events cause neural events analogously to the probability fields of quantum mechanics—for instance, whether a mental event such as intention to move could influence the subtle probabilitic operations of synaptic boutons. Researches of this kind can throw light on whether two minds can transmit information mutually without any verbal communicational or gestural communication as in the case of the deaf and the mute., In the light of these experiments it is not unreasonable to assume that the aphorisms of Patanjali may not be without scientific substance and that the ancient sages and Yogis perhaps knew how to train themselves to cultivate these super-normal talents in a controllable way.

There thus appears to be a case for ascertaining ways and means to understand the wisdom of the ancients in terms of modern science. It is unfortunate that with a great many scientists, especially the younger ones, the ultimate truth is not so important as the means to arrive at it. Thus any conclusion not arrived at through the use of heavy formalism like Feynman Graphs, Quantum Field Theory, Differential Forms, Topology, Fibre Bundles, the Renormalization Group or the Finite Element Method, must be of a low order and a matter of no consequence. Before one accuses the ancient writers of throwing at us a bunch of results without establishing any one of these by logical scientific reasoning, one should bear in mind an important point. Do we really have now all the works of the ancients before us to be able to judge conclusively whether or not they had any idea of scientific reasoning? For instance the Surya Siddhantha, translated by Rev. Burgess, mentions some of the works which are no longer in existence—Brahma Sidhanta,

Parasara Siddhantha, Pancha Siddhantika of Varahamihira, Romaka Siddhantha, etc. On the other hand one gets the impression that the great Persian scholar Al Biruni[8], who came to India in the 10th or 11th century, has knowledge of the pancha siddhantika. Swami Vivekananda says in one of his writings that even the Vedas that we are familiar with today, are only a fraction of what existed once. What then if all the convincing reasoning the ancients had to establish any conclusion that we are familiar with today, is lost in some of these books that somehow disappeared? Even the precision of their utterances ought to make us think alone thse lines. Then again there is one towering question. Science, as we know today, is broadbased on reason and it is the spirit of science to summarily discard anything that is not amenable to reasoning. What if there is something superior to reason? For instance Mahatma Gandhi says clearly in a recorded spiritual message "Faith transcends Reason". Interestingly though, modern scientific researches themselves have exposed the perceptual limitations of an average human being. Man cannot hear supersonic sounds while bats can detect polarized light. These should caution us to acknowledge that the dictum "What man does not comprehend ought not to exist" should be treated with extreme reserve. After all Lord Krishna had to equip doubting Arjuna with a "divine eye" for the latter to be able to comprehend the divine magnificent form shining with "the splendour of a thousand suns". There may be a deep scientific meaning in this.

"I tell you one thing—if you want peace of mind, do not find fault with others. Rather see your own faults. Learn to make the whole world is your own. No one is a stranger, my Child ; the whole world is your own."

—Sri Ma Sarada Devi

Hey Ram : Gandhi & India Today

Dipanjan Muhuri
3rd Year, Economics Hons.

At a time when Gandhi's global relevance is undisputed, his vision of a tolerant and inclusive democracy is threatened by adversarial nationalism triggered by the ascending extremism in the political spectrum of India. Is the Swaach Bharat Abhijan the lone survivor of Gandhism? Embraced by the world, is Gandhi stranded at home? If so, can a heterogeneous democracy like India thrive without the principles of secularism, pluralism and interfaith harmony so assiduously upheld by Gandhi? Guilty of parricide at birth, can the nation afford to abandon the father in spirit? The answer is an emphatic NO. At the brink of the Mahatma's 150th birth anniversary, the world looks up to him as a vanguard of democracy seeking sustenance and light.

Gandhi humanised politics in the most violent century in human history. While Mao Zedong was initiating a violent revolution in China and Lenin defended the murder of 'class enemy' who lay in a hospital, Gandhi, in what is one of the decisive moments in the counter discourse of his politics, called off the nationwide Non Co-operation movement due to the violence at Chauri Chaura. Incapable of hatred, Gandhi's last utterance was the name of the Lord as the three fatal shots claimed his life. Gun shots have continued to claim lives, the silencing of Gauri Lankesh's dissenting voice being the latest instance of the brewing contagion of intolerance in the country. India today in its shameless spree of persecution and censorship has undermined the rich arugumentative heritage to which Gandhi's intellectual debates with Tagore bear witness.

Suspending the Civil Disobedience Movement, only the sagacity of a self-evolving political seer like Gandhi, could have undertaken the walking tours in the winter of 1933/34 proselytizing against the obnoxious social practice of untouchability. In his unwavering commitment to establish equal citizenship, Bapu fraternized the untouchables and owing to it six decades before Obama, the first African American President of the United States-took office, a Dalit was drafting the Indian Constitution. In June 1947, a couple of months before independence, Gandhi's suggestion of a Dalit head of state was turned down by the myopic Congress leadership. What would have been a remarkable symbolic move by a nation at birth, was achieved fifty years later in 1997 when K R Narayan, the first from the Dalit community, took

office as the tenth President of India, Continuing in Gandhi's footsteps if we have achieved a G.M.C. Balayogi, a Meira Kumar, a Ram Nath Kovind, our deep-seated casteist venom has also claimed its latest victim, Rohith Vemula.

India lived a life of contradiction practising at once political equality and social and economic inequality. In 2017, a Dalit was elected to the highest constitutional office and months later in a shocking instance of casteist mentality officials of Kushinagar distributed soaps, shampoos and scents to members of Mushar community to cleanse themsleves before they could meet the chief minister of an overwhelmingly elected government, while Gandhi preferred to stay in a Dalit colony in Delhi rather than in the palatial Birla House. In the afternoon of 30 January 1948, a couple of hours before his assassination, Gandhi had asked the higher-caste leaders, "How are the Harijans?"—this question reverberates with an even greater significance today in the broken lives of those teeming below, what P Sainath calls, the 'destitution line'.

While constituting the first cabinet of free India, Bapu in a remarkable instance of statemanship advocated for the inclusion of the best minds regardless of political affiliations. Through Gandhi's mediation, despite their differences and long-standing political bickering with Congress, S K Shanmukham Chetty, S P Mukherjee and above all B R Ambedkar became prominent members of Nehru's cabinet. Among the numerous leaders of national movements in the twentieth century, Gandhi was the only one not to assume office when freedom was won. Between November 1946 and April 1947, when the Congress leadership was part of an interim central government, the Mahatma with a handful of companions served as a relief worker quelling communal tensions in Bengal and Bihar which Rajagopalachari considered Gandhi's greatest achievement.

Repeatedly investing in the future generation, in complete disregard to self-aggrandizement, Gandhi declined the coveted presidency of the Congress once backing the younger Nehru in 1929 and then Sardar Patel in 1930. Always nurturing and bringing young mnds to the fore, it is his political acumen which forged the first generation of leadership so crucial to the turbulent years after independence. Gandhi, the astute leader, cautious of the ill tremors of domination, in an unprecedented act of political sagacity resigned from the Congress in the Bombay session of 1934. Disregarding his clarion call, the fang of personality cult and the mute allegiance it engenders have swelled reaching its nadir during the black days of Emergency and is now manifested in the fanatic bridge of the Go Rakshak. Yet Gandhi, a vegetarian and lifelong tender of cows, had peaceflly shared a roof with a beef eating White couple, the Polaks, in the Johannesberg of 1890s.

In overhasty outbursts of short sighted notions of development, leaders have often violated the pragmatic roots of the Gandhian notion of gradualism: “one step at a time” as he famously put it. Disregarding the protestations of his trusted watchman, the tribal activist and anthropologist, Verrier Elwin, dams became the Nehruvian monuments of ‘modern’ India displacing millions, mostly Adivasis and Dalits. Gandhi's critique of the excesses of material civilization and his environmental concerns have proved to be prophetic. Although non-violent mass protests like Chipko Movement or Jan Lokpal Movement have aptly played the role of whistle-blowers, yet, dizzied by the techno-commercial, we have continued to indulge in climate incompatible development. The clamour of liberalisation, privatisation and globalisation and the conspicuous consumption by the nouveau riche have left almost no room for safe pedestrian crossing. We have at once funded global environment summits and continued with our resource splurging life styles while Lakshadweep, Sunderbans and extensive areas of coastal Bengal and Odisha face the threat of imminent submersion. The frugal means of an ascetic life like Gandhi's is perhaps our last resort.

Bapu was among the first who envisaged a major social role for women. Women today have successfully entered professional fields but innumerable Nirbhayas continue to weep in the dark alleys of the nation. Without curbing this penchant towards gender violence the greater idea of Satyagraha cannot be realized.

The geatest adversary of peace is not war, it is the mentality of war. Sadly, India too has fanned this mentality by embracing the nuclear weapon keeping alive the vogue of war in the name of peace. We have been perennially at war with our ceasarean twin, Pakistan. Gandhi's final fast, a couple of weeks before his assassination, in the cause of Hindu-Muslim harmony, quelled communal tensions even in Pakistan and prompted a message from Jinnah urging Bapu to end his fast. The adversarial twins may reflect a moment on these episodes and would do well to remember that Gandhi and Jinnah were fellow Gujaratis and comrades. The recollection of the virtually forgotten episodes of Leung Quinn, Gandhi's Chinese comrade and a fellow satyagrahi in South Africa, who willingly courted arrest and had long spells of discussions with Gandhi in jail about the multiple paths to God, may resonate with a whole new significance on the backdrop of the recent escalation of tension between China and India.

Democracy is the greatest laurel in the broad forehead of India; we have sanctified the ballot but at once reduced electoral opinions into communal polarisations. With the political majority illicitly acting as an extension of the religious and linguistic

majority of the country, the threat of a majoritarian theocracy looms large over the world's largest democracy. The alarmingly rapid Saffronisation has also cast its pale shadow over judiciary—in January 2018, in an unprecedented instance of far reaching consequences, four senior most judges of the Supreme Court questioned the equanimity of the institution. The exclusionary principle driving the attempt of homogenization, in an outright denunciation of Gandhi's commitment to pluralism, secularism and interfaith harmony, has only succeeded in fueling the politics of hatred and the contagion of intolerance. In India today, dissent is treason-the intellectual non-conformism and free thinking rationalism of Narendra Dabholkar, Govind Pansare, M.M. Kalburgi have cost them their lives. With Gandhi's mantel resting on puny shoulders, there is little hope that the fast dwindling space of opposition, so essential for the healthy functioning of democracy, can be recovered.

"All religions are true. God can be reached by different religions. Many rivers flow by many ways but they fall into the sea. There all are one."

—Sri Ramakrishna

"How are we to know that the mind has become concentrated? Because the idea of time will vanish. The more time passes unnoticed the more concentrated we are. In common life we see that when we are interested in a book we do not note the time at all; and when we leave the book, we are often surprised to find how many hours have passed."

—Swami Vivekananda

Penetration Testing Methodology

Sourav Chabri
Department of Computer Science, 2nd Year

Penetration testing, often abbreviated as pen test, is a process that is followed to conduct an in-depth security assessment or audit. A methodology defines a set of rules, practices, and procedures that are pursued and implemented during the course of any information security audit programme. A penetration testing methodology defines a roadmap with practical ideas and proven practices that can be followed to assess the true security posture of a network, application, system or any combination thereof.

Security testing methodologies

Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM)

Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM) (http://www.isecom.org/research/osstmm.html) is a recognized international standard created by Pete Herzog and developed by ISECOM for security testing and analysis. It's being used by many organizations in their day-to-day assessment cycle. From a technical perspective, its methodology is divided into four key groups—scope, channel, index, and vector. The scope defines a process of collecting information on all assets that operate in the target environment. A channel determines the type of communication and interaction with these assets, which can be physical, spectrum, and communication. All of these channels depict a unique set of security components that must be tested and verified during the assessment period. These components are comprised of physical security, human psychology, data networks, wireless communication medium, and telecommunication. The index is a method that is used to classify target assets that correspond to their particular identifications, such as MAC Address and IP Address. At the end, a vector concludes the direction through which an auditor can access and analyze each functional asset. The whole process initiates a technical roadmap that evaluates the target environment throughly and is known as audit scope.

Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF)

Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF) (www.oissg.org./issaf) is another open source security testing and analysis framework. Its framework has been categorized into several domains to address the security assessment in a logical order. Each of these domains assesses different parts of a target system and provides field inputs for the successful security engagement. By integrating its framework into a regular business life cycle, it may provide the

accuracy, completeness, and efficiency required to fulfil an organization's security testing requirements. ISSAF was developed to focus on two areas of security testing—technical and managerial. The technical side establishes the core set of rules and procedures to follow and create an adequate security assessment process, while the managerial side accomplishes engagement with the management and the best practices that should be followed throughout the testing process. It should be remembered that ISSAF defines the assessment as a process instead of an audit. As auditing requires a more established body to proclaim the necessary standards, its assessment framework does include the planning, assessment, treatment, accreditation, and maintenance phases. Each of these phases holds generic guidelines that are effective and flexible for any organizational structure.

Open Web Application Security Project (OWASP)

The **Open Web Application Security Project (OWASP)** open community brings its **top 10 projects** forward to increase the awareness of application security. The project provides you with a necessary foundation to integrate security through secure coding principles and practices. OWASP also provides you with a wonderful testing guide as part of the OWASP Testing Project (https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Testing_Project) that should be carefully reviewed to determine if this framework can assist you in your efforts. The OWASP top 10 project categorizes the application security risks by evaluating the top attack vectors and security weaknesses in relation to their technical and business impact. While assessing the application, each of these risks demonstrates a generic attack method that is independent of the technology or platform being used. It also provides you with specific instructions on how to test, verify, and remediate each vulnerable part on an application. The OWASP top 10 mainly focuses on the high risk problem areas rather than addressing all the issues that surround the web application's security.

Web Application Security Consortium Threat Classification (WASC-TC) identifying the application's security risks requires a through and rigorous testing procedure, which can be followed throughout the development's life cycle. WASC threat classification is another such open standard to assess the security of web applications. Similar to the OWASP standard, it is also classified into a number of attacks and weaknesses but addresses them in a much deeper fashion. Practising this black art for identification and verification of threats that are hanging over the web application requires standard terminology to be followed, which can quickly adapt to the technology environment. This is where the WASC-TC comes in very handy.

There are a number of security testing methodologies but very few provide stepwise, consistent instructions on measuring the security of a system or application. I have discussed four such well-known open source security assessment methodologies.

Speed of Light

Sudarshan Sarkar
Applied Chemistry, PG-1

"There is a legend that everything that falls into the waters of this river (River Piedra)—leaves, insects, the feathers of birds—is transformed into the rocks that make the riverbed. If only I could tear out my heart and hurl it into the current, then my pain and longing would be over, I could finally forget." The quote from the very first page of the book 'By the River Piedra, I sat down and wept' by Paulo Coelho may be appropriate desire that most youths long for in various forms. Truly, river Piedra is but a myth, but there are miraculous waters and substances of sorts that might make you forget all your anguish, but are they the ultimate solution or just an escape, a fool's Heaven?

We often search for the right thing in wrong places or in the wrong way and then end up convincing ourselves that it doesn't exist. Our world, since the World Wars, has experienced drastic advancement in all fields such as in agriculture, industries, medicines et cetera, but with the rapid developments, we are bound to be entrapped within the confinement of the colourful cage of the technological era. In doing so, somewhere, we are limiting our potential as human beings and just surviving in the forest of bricks and Iron. We constantly try to be someone else, or just do things to please others and in that process, we tend to forget to live our own life.

Let me tell you a story of a young boy, called Dhruva. Dhruva was an average kid. As he grew up, he started making friends. Soon, he learnt about many 'sinful delights' from his friends which his parents might never have told him about. Initially, he would entertain the idea of trying out the *delights* out of the fear of getting scolded but soon he forced himself to try them out, as Dhruva wanted to look as cool as others. Dhruva, soon indulged in that delightful activity and instantly fell in love with the exotic feeling he experienced.

Time flew by and Dhruva, now works in a company that makes cars. Though he was reasonably rich and was used to social hangouts, he felt lonelier than ever. He made more friends, tried to be funny and even spent more time with them but in the end no one was able to make his loneliness disappear. He often returned home drunk or in foul mood complaining about the pressure in his office. He would lash it out at his aged parents. He felt that he isn't getting enough attention and if he didn't do anything sooner, he'll become lonely forever. He soon learned that

many of his friends, were the topic of every conversation be it in his office or at parties. Some of them were travelling or trying their hands in extreme sports or just talking random selfies or groupfies in lavish social events and posting them in social media in exchange for numerous graphically generated approval hand. So, Dhruva decided to make something breath-taking, which will make him a cynosure to all eyes. So, after lots of hard work, trials and errors and years of dedication, he made a car that can travel at the speed of light. After he made the car, his joys knew no bound. He never experienced such euphoric feelings before. His parents expressed their pride in their son. Everything seemed perfect. Then he remembered, why he made this car. He instantly grabbed his phone and clicked a selfie with his car and posted it with the caption, 'The revolutionary car that travels at the speed of light.' No sooner did he upload the picture in social media, millions of "approval hands" came flooding in. He was now ecstatic. He then got inside the car and started the engine. As soon as he pressed the gas pedal, the car zoomed in a flash. He was unable to control the speed and he was going wherever his car was taking him. He thought he was going to die, and then all the memories came flooding in-all the mistakes he made, the times he only thought about his own happiness and hurt others, and the fact that he never experienced true bliss all these times he chased for happiness. He prayed that if he comes out alive out of that mess, he would change his way of living for the better and be a good son to his parents that he never had been. Fortunately for him, the car came to a stop due to some mechanical failure that occured. He came out of his car, panting, thanking the stars above. Then he looked up and was shocked. He was unable to recognise anything. He soon learnt about the place or the time he was in. Two hundred years have passed since he made that car. Everything he knew and valued were long gone. He felt devastated.

The story is just a poor analogy to explain the beautiful things we leave behind in order to reach some place sooner in life and yet never find the true mirth we seek unknowingly. 'Happiness is a journey, not a destination,' as Robin Sharma had well written in his influential, best-selling book, 'The Monk who sold His Ferrari.' Happiness is about never achieving a goal but the good feeling that you get while you put your best efforts to reach your goal. The sensation that you receive after you have achieved your goal, is the complete return of the hard work and time you had invested. It's not the goal that makes you happy, but doing the things that you love doing, that makes you happy. When you are climbing Mt. Everest, the friends you make, the stories you share with your fellow climbers, the odds you fight together and the moments you spend with them on the venture of reaching the summit will always make your heart feel warm with happiness while your

achievement of reaching the summit will make you proud. However, as the world is moving forward, we are forgetting what true happiness is. That is because we are more focused on own personal benefits and instant gratification.

Partially, we can blame our parents, because they, out of love for their children are actually making their children's life more miserable. When a child cries for a toy or chocolates, to appease the child, many-a-time parents buy them whatever they ask for and over the years this becomes a habit. Basically, instant gratification is the craving of fulfilling one's desire without any delay and with the minimum effort. Who would want to wait for a long time, say studying for exams that's three months away? After all you will reap the fruit of your labour after your results are out.

Sometimes, there's nothing wrong in wanting something, sooner than expected. However, balancing your desire with the logical judgement of time is essential to have a serene life. Failure to attain instant gratification is often followed by disappointment, stress and annoyance. Such emotions are born from expectations not met. This again paves ways for substance abuse. Often many of my acquaintances have confessed (to me) that smoking or drinking instantly make them feel good even if they had a pretty rough day. That instant euphoric feeling, urges them to drink or smoke or both more often and soon they can't relax or feel good without parting their lips for the devil. Thus, stress and frustrations cloud over their life and only these substances remain which become both their momentary solace and death's own emissary.

"Give up dry discussion, this hotchpotch of philosophy. Who has been able to know God by reasoning ?"

—Sri Sarada Devi

"All the secret of success is there; to pay as much attention to the means as to the end."

—Swami Vivekananda

Fourth Convocation Address on 10 December 2016

Prof Virendar Sing Chauhan

Renowned Scientist, Chairman, EC, NAAC and Member, UGC

I am delighted to be amongst you all on the happy occasion of the convocation day of this magnificent college whose foundation was laid in 1941 by Ramakrishna Mission and whose name Vidyamandira was given by Swami Vivekananda himself who envisioned it to be a premier institute of higher learning modeled on Guru Kul System. Vidyamandira has gone from strength to strength and is now recognized as one of the best institutions of higher education in the country, fulfilling in many ways Swamiji's dreams. All of you and those who have been associated with the college deserve to feel proud of this fact. Convocation day is an important day in any student's life because it represents an important milestone in his/her life. I am sure about those of you who will be leaving the college, that your parents and well wishers are very proud of you and your achievements. Let me share some of my thoughts that might be of some relevance to this occasion.

India is a big country with the largest population of youth between the ages 18-30 in the world and therefore in this sense the future belongs to this country. You are among the top 1% of this age group in India, and therefore immensely privileged, and consequently, have additional responsibilities. Higher education, world over and now also in India has gone through a massive change. With the emergence of the middle class all over the world and increasing demand for accessing higher education, the universities and colleges everywhere have come under great pressure to expand, change and adapt. On the other hand they are expected to keep their core values of educating students not only by providing them with specific knowledge in their chosen areas of studies but also by preparing them to go out in the societies to serve. Institutions of higher education also impart a set of values, including ethical, moral and service of others particularly those who are less fortunate in the society. In this respect, you have been blessed and privileged in that you have been taught by teachers of not only outstanding quality but also immense dedication. It is a part of Indian culture for a long time that the teachers have been held in a very high esteem. As the saying, “Guru Govind Dono Khade, Kake Langoo Paon, Balihaari Guru Aapne Jin Govind Diyo Bataye” suggests it is the the teacher who shows the path for future and ultimately to God.

You will be stepping in a world which is highly connected, exciting, and full of opportunities but, at the same time, it is complex, full of ironies and conflicts. Fortunately for you generation India is really at a juncture where it can, and will,

revert to its old glorious days of prosperity, of scholarship of inclusiveness and with respect to all of you as the future workforce, India can be what Swami Vivekananda ji dreamed of; strong, full of opportunities, justice, moral values, and can emerge as a true world leader.

India has an ancient civilization but as a nation it is young, growing fast; its GDP growth is the fastest in the world. It has an aspirational huge middle class. India can feed its huge population, is rapidly increasing its educational base, its health care system, and above all has nurtured democracy since its independence. These are amazing achievements by any standards. But, at the same time there are huge challenges; India has an astonishing number of the poor, high degrees of malnutrition, high prevalence of infectious diseases like Tuberculosis, unacceptable levels of inequality and so on. These are the challenges that your generation will have to face and overcome to make India a great modern nation. This is where the value system(s) that you have been inculcated with at the university become of utmost importance.

What value system should one carry forward as one leaves university/college and prepares to step into a highly competitive and complex world. How does one become successful after obtaining higher education? What is the measure of success? Actually, we all are very lucky to have born in this great country of Sri Ramchandra, of Mahatma Gandhi, Ambedkar, Vivekananda, Tagore and many others. All of them have also left a huge body of written works and I urge you to read at least some of the work of these great souls and imbibe whatever appeals to you. For example, Swami Vivekananda said on "giving" that one should give and continue to give till it really hurts. And, that serving others is the real and only religion and real service to nation. You see enough austerity here in the life style of some very capable, dedicated I and highly intelligent monks of the Ramakrishna Mission order, but if you get a chance to visit Gandhi Ashram at Sabarmati you will see for yourself that our own needs are really very few. Needless to say, you have a duty to yourself, your family, your parents, and your teachers but you will have to go much beyond that in order to fulfill Swamiji's dreams.

India has amazingly rich and old traditions, culture, values which somehow appeared to have gone out of focus. Respect for others particularly older persons, sense of gratitude for receiving, awareness of one's own culture, language and traditions, rational thinking, and to take the best of these values is what will help you the most in life, and being a good citizen of this great country. A good reading and consideration of our age old literature and epics will actually inspire and amaze you. There are no situations in life where teaching from Gita, Ramayan and Mahabharat will not be of relevance. Lord Krishna said if your thinking is large then no problem is big enough but if your thinking is small then all problems become

big. Whatever you do, whatever job you undertake, do it with utmost honesty, and dedication. Always aspire for more but never at the cost of compromising with your value system and sense of whatever is right. At the end of the day that is what will give you joy, peace and a sense of purpose.

The world you will step into now is highly competitive, but I am sure that your stay at Vidyamandira has prepared you well, and that all of you will find your suitable places of work. No matter where you go, remember work is worship; there is no substitute for hard work. Whatever you do-do it well and honestly. Look after yourselves, but not at the cost of harming someone else. Keep your mind calm, and body fresh and strong. Regular exercise, practicing Yoga, sitting in silence for sometimes are very valuable habits. You must have made many friends at the university and you should nurture good friendship; at the end of the day it is the family and friends who will matter the most.

There is nothing that you cannot achieve once you put your mind to it. So, you go ahead, embrace the world-it is yours for taking but take it well and gently. You are the future of this great country.

Finally, as Swami Vivekanand said real education was that which emabled a person to stand on his own legs and helped him manifest the perfection already in him by a harmonious development of his head, hand and heart. In his opinion, a balanced combination of the secular and the spiritual training constituted the true dimension of education. So, you go ahead and show that you have imbibed the spirit of Swami Vivekananda's thoughts and dreams.

"God Can Be Realised Through All Paths."

—Sri Ramakrishna

"You cannot believe in God until you believe in yourself."

—Swami Vivekananda

5th Convocation Address on 8th December 2017

Prof. Dhirendra Pal Singh
Director, NAAC and Former Vice Chancellor

I am highly delighted, extremely privileged and honoured to address the august gathering here at Ramakrishna Mission Vidyamandira. Convocation day signifies a memorable occasion in the life of a student and is strongly linked with the dreams of youth. I take this opportunity to congratulate all the graduating students and their proud parents and the teachers who have groomed them to this level that they are being awared with degrees, medals and certificates of excellence. I wish you all to scale new heights of success and glory in your life.

It is a matter of great happiness to know that this college is widely known for its academic excellence and has achieved many milestones in its academic journey. It is committed to quality higher education, which is reflected in its NAAC 'A' Grade. Also, the college is adjudged by the UGC as a **'College with Potential for Excellence',** and has been awarded the stature of Autonomous College. I congratulate the Secretary, the Principal and their dedicated team for these achievements. I am also enthralled to see the serene and tranquil campus with adequate infrastructure. I am sure that this Vidyamandira will excel further.

Friends, we live in a world with diverse faiths and cultures. In India, we respect all the religions and faiths and service to mankind is supreme. Sri Ramakrishna Paramahamsa, an ardent devotee of Maa Kali, was an embodiment of Divinity. He believed in the Unity of God, divinity of human beings and the harmony of Religions. For Him, all paths lead to one goal that is the God Realization. He laid great emphasis on *"Devotion to God"*. According to Him *"In this age, work without devotion to God has no legs to stand upon. It is like a foundation on sand. First cultivate devotion." He further said, "One is safe to live in the world, if one has Viveka (discrimination of the Real from Unreal), and Vairagya (dispassion), and along with these, intense devotion to God."*

Sri Ramakrishna Paramhamsa changed the lives of many disciples and one of his disciples, Narendra Nath transformed into Swami Vivekananda, who showed the path of Karma, Service and Spirituality to the world. My dear students, you are blessed as you could get an opportunity to study in this great institution, guided by the philosophies of Sri Ramakrishna Paramhamsa and Swami Vivekananda.

Indians have always been on the forefronts and proven their mettle in all areas of performance in science, technology, industry, politics, education, governance or any other field. Youth has always been the engine of change, transformation and

growth. The students are the torch bearers of the future society. Our country has more than 50% of its population below the age of 25 and more than 65% below the age of 35. It is expected that, by 2020, the average age of an Indian will be 29 years, compared to 37 for China and 48 for Japan. Most of the revolutions around the world are sparked, fuelled and lead by the power of youth. In the times to come, the young generation of India will make the most formidable contribution in steering the nation on the path of growth, development and prosperity. I firmly believe that Indian youth has the perspective, potential and power to position our Nation as the "World Leader". **Swami Vivekananda** has rightly said for the youth, *"All power is within you. You can do anything and everything. Believe in that."* I am sure you will choose to do the right things in the righteous manner with the best of your intentions and efforts, and will be successful in all walks of your life.

Our students are the leaders of development of tomorrow. The teachers have groomed them and the educational institutions have equipped them with necessary abilities and skills. Their teachers have provided them with the wings and the strength to fly. They impart an all-round training in an atmosphere of serenity, discipline and moral purity which help them develop into worthy citizens of the country with a sense of genuine pride in their hoary cultural traditions. Education should not only be related to human empowerment but also to the broadening of outlook. An overall transformation can be worked out aiming at turning students into global citizens. Shri Rabindra Nath Tagore has rightly stated in his famous contribution 'Gitanjali' *"Where the mind is without fear and the head is held high; where knowledge is free; where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls."*

I firmly believe that teachers are shouldering the most important responsibility in the growth and development of individuals, society and nation at large. It is my personal experience and observation that the teacher impacts the life and achievements of students in a variety of ways. In our society teachers are looked upon as "Role Models". In fact, teachers are like a touchstone who can transform the lives of students by their character, conduct, attitude, knowledge and skills. The true meaning of a Teacher or Guru is *"One who dispels darkness of ignorance".* Guru is not just a person but it is considered as the divine guiding energy which helps humanity to realise its true nature. This energy works through an able person who is pure enough to hold it. The nation expects that the Gurus, the Teachers will discharge their duties and responsibilities in a pious, sincere and committed manner.

Holistic development of the students is a vital issue of concern. Our higher education institutions have to play the role of a master craftsman in unleashing the full potential of their students to bring out brilliance in all dimensions of their

personality. Sports, yoga, arts, cultural and extra-curricular activities are in integral part of student development. I believe that our educational policy, systems and institutions have to give more emphasis on holistic development by providing required support, resources and opportunities to students. The four pillars of learning proposed by the UNESCO as fundamental principles for reshaping the education are worthy to cite here. They are: Learning to know; Learning to do; Learning to live together and Leaning to be. In my opinion, the educational institutions should emphasise more on developing holistic personality of the learners and thereby contribute in making complete human beings.

As you are aware, the Government of India is coming up with a new National Policy on Education to bring major reforms in education system for quality and excellence. I firmly believe that it should focus on Indianising global education and global facilitation of higher education; promoting holistic education, holistic human development and holistic national development; strengthening family institution, human values and cultural heritage; and promoting inclusiveness, peaceful coexistence and universal brotherhood. The new National Policy on Education should also include initiatives on balancing the global and the local; ancient wisdom and modern world of knowledge; strengthing connection-individually, socially, nationally and globally; developing intellectuals and responsible citizens; and also initiatives for environmental up-gradation and sustainability. I am sure the new Education Policy will be able to meet the changing dynamics of our requirements with regards to equity, access, accountability, affordability, excellence, research and innovation, employmability etc.

My dear students, the world that you are now stepping into is full of opportunities. The manner in which India is being built is setting an example for the rest of the world. The exponential growth of the digital economy, affordable clean energy, and the significant accomplishments in the space programmes, etc., are a few examples of how India is marching ahead. We have to dream big and contribute in national growth and development. We have to realise our dreams through our sincere efforts and sustained hard work. Remember what our former President of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam once said, “Dream is not that which you see while sleeping, it is something that does not let you sleep”. This dream will determine your attitude and your attitude will then take your ventures to greater heights.

Me dear students, on this special day of your life, I wish your life to be guided by three essential gems or Tri Ratnas for Life:

The first gem is **Values**. Strong Human Values are at the core of every successful endeavour. We must realize, refresh and reinforce core human values such as Truthfulness, Love, Peace, Righteous Conduct, Integrity, etc. in our thoughts and conduct. It is only then we become great human beings.

The second gem is **Sensitivity.** Being sensitive is essential. In this digital era, we are losing our sensitivities to electronic communication technologies. We need to reflect our sensitiveness towards human and all living beings, nature and other aspects of life. We must respect the existence of every element of this Universe and serve them with our best possible efforts.

The third gem is **Karma.** We must have right focus on our Karma, that is- Actions, because actions speak louder than words. The youth is entrusted with the greatest responsibilities of creating the future. You must decide to to the right Karma, for the right Purpose, with right set of competencies, and with the devotion to God, so as to make your life purposeful and meaningful.

I am sure, each one of you will possess these three Gems within you. I also believe that you will follow the path prescribed by Sri Ramakrishna Paramahamsa and Swami Vivekananda for serving humanity.

I once again congratulate graduating students of this college and extend my best wishes for their bright future. I pray to the Almighty to lead you to the path of knowledge, happiness, peace, prosperity and fulfilling life.

I would like to conclude my thoughts with a shloka from the Upanishad :

"Om Sarve Bhavantu Sukhinah,
Sarve Santu Nir-Aamayaah
Sarva Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet
Om Shaantih Shaantih Shaantih"

It means :

"Om, May All become Happy,
May All be Free from Illness.
May All See what is Auspicious,
May no one Suffer.
Om Peace, Peace, Peace."

Acknowledgement

The convocation address has been developed by consulting several sources which are duly acknowledged.

বিদ্যামন্দিরের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে মাননীয় গায়ক শ্রীকান্ত আচার্য কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ

ভ্রাতৃবরণ উৎসবে ছাত্রদের সঙ্গীত পরিবেশন

বেলুড় স্টেশনে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

ফুটবল ম্যাচের একটি দৃশ্য

রক্তদান শিবির, ২০১৭

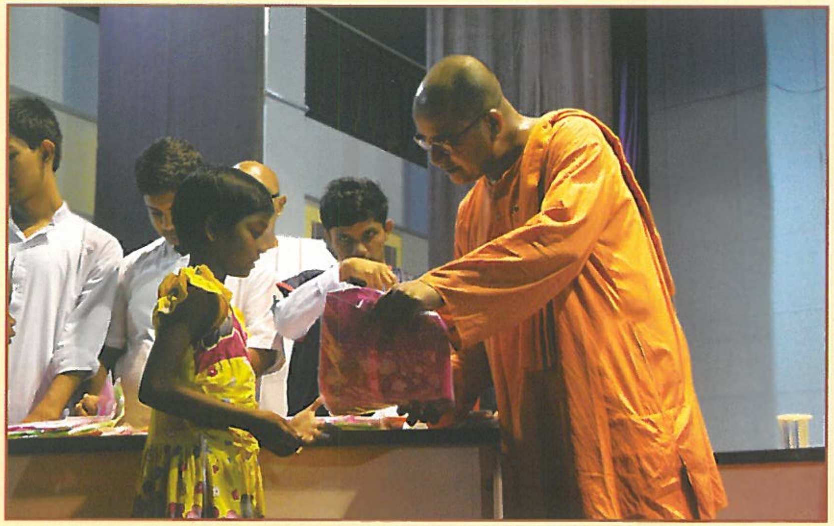

শারদোৎসবে অধ্যক্ষ মহারাজ কর্তৃক বস্ত্রবিতরণ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় এম.জে. আকবরের সম্বর্ধনা

পঞ্চম সমাবর্তন উৎসবে NAAC-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক ধীরেন্দ্র পাল সিং কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ

জাতীয় যুব দিবসে বেলুড় মঠে শোভাযাত্রা

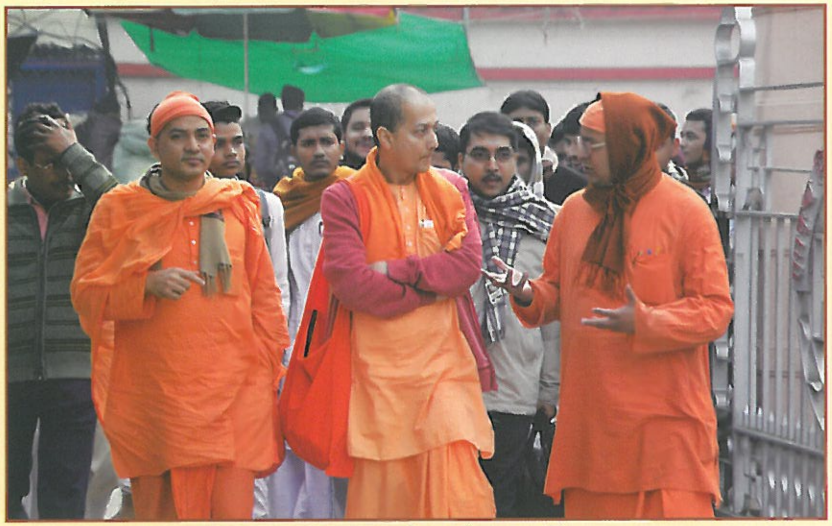

সাপ্তাহিক সেমিনারে স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ

বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত সরস্বতী পূজা

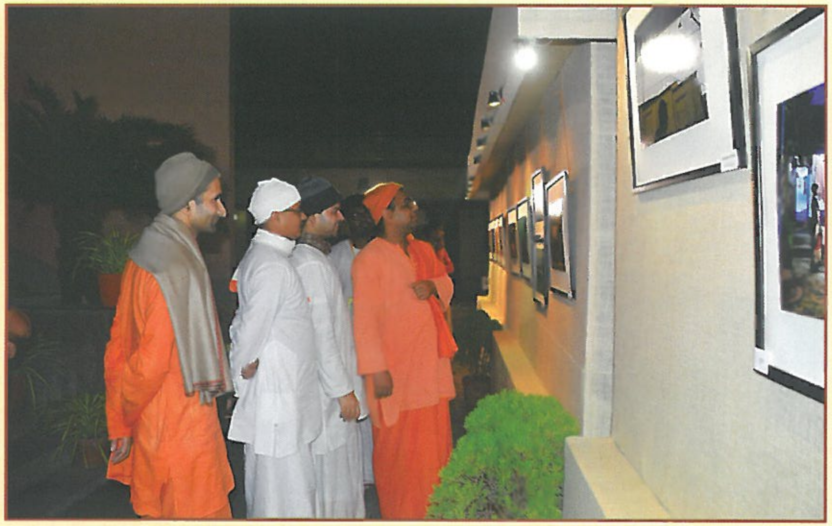

ফটোগ্রাফি বিভাগ আয়োজিত পলিফোনি ফটো ফেস্টিভ্যাল

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলা বিভাগের ছাত্ররা

বার্ষিক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে স্বামী বলভদ্রানন্দজীর ভাষণ

श्रीजीवगोस्वामिपाददिशा श्रीभगवत्स्वरूपपर्यालोचनम्

निबन्धकारः – डः हरेकृष्णपट्टजोषी

आस्तिकदर्शनेषु वेदान्तदर्शनपरम्परायां यथा अद्वैतं द्वैतं विशिष्टाद्वैतं शुद्धाद्वैतमित्यादयो वादा विदितास्तथैव अचिन्त्यभेदाभेदवादः विशिष्टं स्थानं बिभर्ति । श्रीलचैतन्यमहाप्रभुः मतवादस्यास्य आसीत् प्रचारकः । परन्तु प्रस्थान-त्रयीमवलम्ब्य न किमपि भाष्यं तेन रचितम् । अनन्तरं तदीयमतवादस्य प्रामाणिकतां स्फोरयितुम् आचार्येण श्रीबलदेव-विद्याभूषणेन निखिलं प्रणीतम् । अचिन्त्यभेदाभेदवादस्य कोऽभिप्राय इति जिज्ञासायामेतद्वक्तुं शक्यते-

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् ।
प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ।। इति

(महा.भा.भीष्मपर्व-५-१२)

श्रीशङ्कराचार्येणापि **श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्** (ब्र.सू. २.१.२७) इति सूत्रे भाष्ये श्लोकोऽयं समुद्धृतः ।

जीवब्रह्मणोः मध्ये कीदृशः सम्बन्धो विद्यते इति विचारप्रसङ्गे वेदान्तदर्शनेषु महान् कोलाहलो दृश्यते । श्रीशङ्करभगवत्पादमतानुसारं यथा माया सदसद्भ्यां विलक्षणा अनिर्वचनीया विद्यते तथैव अचिन्त्यभेदाभेदनये जीवब्रह्मणोः मध्ये कदाचिद् भेदः कदाचिद् अभेदः परिलक्ष्यते । **इदमेव अचिन्त्यत्वम्** ।

नयेऽस्मिन् ईश्वरस्य पराऽपरा-तटस्थभेदेन त्रिविधाः शक्तयो विद्यन्ते । तत्र पराशक्तिस्तावत् भगवति परमात्मनि चिच्छक्तिरूपा, अपरा शक्तिः मायाख्या, तटस्था शक्तिः जीवभूता च । शक्तिशक्तिमतोः सम्बन्धस्तु अभेद एव । अत्र दृष्टान्तः- सूर्य-सूर्यमण्डलयोः मध्ये यावान् सम्बन्धः तावान् ईश्वर-चिच्छक्त्योः मध्ये । एवं सूर्यस्य जलगतप्रतिबिम्बेन सह यथा सम्बन्धः तथा मयाशक्त्या सह परमात्मनः सम्बन्धः । एवं सूर्येण सह तद्गतरश्मिपरमाणूनां यथा सम्बन्धः तथा तटस्थशक्तिरूपजीवेन सह परमात्मनो विद्यते ।

पूर्वोक्तोदाहरणत्रये यथा सूर्यरश्मि-परमाण्वोः अंशांशिभावेन अभेदः भेदश्च विद्यते, एवं यथा प्रतिविम्बस्य विम्बेन सह अभिन्नत्वं भिन्नत्वं च विद्यते, तथैव ईश्वरेण सह शक्तीनां भेदः अभेदश्च वर्तेते । उपर्युक्तदिशा यद्यपि शक्ति-शक्तिमतोः मध्ये भेद आयाति, तथापि शक्तीनां पृथगस्तित्वे न किञ्चित् प्रमाणमुपलभ्यते । अतः जीवेश्वरयोः मध्ये जडेश्वरयोः मध्ये वा सिद्धेऽपि भेदे अभेदो भासते, एवं च अभेदे अपि भेदो विद्यते । तस्माद् **भेदाऽभेदयोः अचिन्त्यत्वमायातम्** ।

अचिन्त्यभेदाभेदवादविषये सारोऽयमुच्यते यत्-

आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं
रम्या काचिदुपासना वधूवरावर्गेण या कल्पिता ।
शास्त्रं भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्
श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नः परः ।। इति

श्रीचैतन्यमहाप्रभोः पन्थानमनुसरतां श्रीमद्भागवतमेव परं प्रमाणम् । गरुडपुराणे श्रीमद्भागवत-विषये उच्यते- **अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणाम्**............(श्रीमद्भागवताभिधः) इति । अत्र श्रीजीवगोस्वामिना तत्त्वसन्दर्भे प्रोच्यते-**ब्रह्मसूत्राणामर्थः तेषामकृत्रिमभाष्यभूत इत्यर्थः । पूर्वं सूक्ष्मत्वेन मनसि आविर्भूतं तदेव संक्षिप्य सूत्रत्वेन पुनः प्रकटितम्, पश्चाद् विस्तीर्णत्वेन साक्षाच्छ्रीभागवतमिति । तस्मात्तद्भाष्यभूते स्वतः सिद्धे तस्मिन् सति अर्वाचीनम् अन्यत् अन्येषां स्वस्वकपोलकल्पितं तदनुगतमेव आदरणीयमिति गम्यते** इति ।

श्रीजीवगोस्वामिपादेन परमं प्रमाणं भागवतमेतदाधारीकृत्य यो वैदुष्यविमण्डितो निबन्धो रचितः स सन्दर्भ इत्युच्यते । उक्तं हि तेन-

अथ नत्वा मन्त्रगुरून् गुरून् भागवतार्थदान् ।
श्रीभागवतसन्दर्भं सन्दर्भं वश्मि लेखितुम् ।। इति (तत्त्वसन्दर्भे)

ननु कोऽयं सन्दर्भशब्दार्थ इति चेद्, श्रीबलदेवविद्याभूषणेनात्रोच्यते-

गूढार्थस्य प्रकाशश्च सारोक्तिः श्रेष्ठता तथा ।
नानार्थवत्त्वं वेद्यत्वं सन्दर्भः कथ्यते बुधैः ।। इति

श्रीभागवतं संदृभ्यते ग्रथ्यते अत्रेऽति **हलश्च** ३.३.१२१ इत्यधिकरणे घञ् ।

अस्मिन् श्रीभागवतसन्दर्भे साकल्येन षट् सन्दर्भाः विद्यन्ते । ते च यथाक्रमं तत्त्वसन्दर्भः, भगवत्सन्दर्भः, परमात्मसन्दर्भः, श्रीकृष्णसन्दर्भः, भक्तिसन्दर्भः, प्रीतिसन्दर्भश्चेति।

एते हि षट् सन्दर्भाः भागवतमुपजीव्यैव प्रवर्तन्ते इति कृत्वा सन्दर्भार्थविज्ञानात् पूर्वं भागवतार्थविज्ञानं नितरामावश्यकमिति स्थितम् ।

ननु श्रीमद्भागवतस्य किं तावत् प्रतिपाद्यं वस्तु इति चेद् वेदव्यासः स्वयमेव जगाद यत्

धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् ।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ।। इति (१.१.२)

अस्यार्थः- द्वितीयाध्याये एवं **स वै पुंसामि**त्यादित आरभ्य **जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा** इत्याद्यन्तेन प्रतिपादितः । यथा-

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ।। इति १.२.६

अहैतुकी-फलाभिसन्धिरहिता ।

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ।
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम् ।। इति १.२.७

अहैतुकं-शुष्कतर्काद्यगोचरम् ।

धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः ।
नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् ।। इति १.२.८

धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते ।
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ।। इति १.२.९

अपवर्ग एव आपवर्गः। स्वार्थे अण् । स आपवर्गः प्रयोजनमस्येति आपवर्ग्यः। तस्य मोक्षप्रयोजनकस्य धर्मस्य अर्थाय फलत्वाय अर्थः धनं नोपकल्पते योग्यो न भवति । धर्मस्य

मोक्षः फलं न तु अर्थः इत्यर्थः । धर्म एव एकान्तं नियतं फलं यस्य तस्य अर्थस्य कामो लाभाय न हि स्मृतः । धनस्य कामो न फलं किन्तु धर्म इत्यर्थः ।

कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता ।
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः ।। इति १.२.१०

कामस्य विषयभोगस्य इन्द्रियप्रीतिः लाभः फलं न भवति । किन्तु यावता जीवेत । तङ् आर्षः । तावान् एव कामस्य लाभो जीवनपर्याप्त एव कामः सेव्यः । जीवस्य जीवनस्य कर्मभिः कर्मानुष्ठानद्वारा य इह प्रसिद्धः स्वर्गादिः सोऽर्थः न भवति किन्तु तत्त्वजिज्ञासा एवेति ।

श्रीजीवेन अत्रोक्तं- **टीका च- अत्र श्रीमति सुन्दरे भागवते.........वास्तवं परमार्थभूतं वस्तु वेद्यं न तु वैशेषिकादिवद् द्रव्यगुणादिरूपमित्येषा** । इति

ननु किंरूपं तद् वस्तुतत्त्वमिति चेदुच्यते-

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ।। इति (१.२.११)

अस्यार्थः- **तत्त्वविदस्तु तदेव तत्त्वं वदन्ति । किं तत् ? यज् ज्ञानं नाम । अद्वयमिति क्षणिकविज्ञानपक्षं व्यावर्तयति । ननु तत्त्वविदोऽपि विगीतवचना एव ? मैवं तस्यैव तत्त्वस्य नामान्तरैरभिधानादित्याह । औपनिषदैः ब्रह्मेति, हिरण्यगर्भैः (योगिभिः)परमात्मेति, सात्वतैः भगवानिति शब्द्यतेऽभिधीयते** । इति

श्रीजीवेन उपर्युक्तश्लोके **ब्रह्म परमात्मा भगवान्** चेति क्रमेण विन्यासो वैशिष्ट्यद्योतनाय कृत इत्युक्तम् । तथा हि तेनोक्तं- तदेकम् एव अखण्डानन्दस्वरूपं तत्त्वं थुत्कृतपारमेष्ठ्यादिकानन्दसमुदायानां परमहंसानां साधनवशात् तादात्म्यमापन्ने सत्यामपि तदीयस्वरूपशक्तिवैचित्र्यां तद्ग्रहणासामर्थ्ये चेतसि यथा सामान्यतो लक्षितं तथैव स्फुरद्वा तद्वदेव अविविक्तशक्तिशक्तिमत्ताभेदतया प्रतिपाद्यमानं वा **ब्रह्मेति** शब्द्यते । अथ तदेकं तत्त्वं स्वरूपभूतया एव शक्त्या कमपि विशेषं धर्तृ परासामपि शक्तीनां मूलाश्रयरूपं तदनुभवानन्दसन्दोहान्तर्भावितताद्दशब्रह्मानन्दानां भागवतपरमहंसानां तथानुभवैकसाधकतमतदीयस्वरूपानन्दशक्तिविशेषात्मकभक्तिभावितेषु अन्तर्बहिरपीन्द्रियेषु परिस्फुरद् वा तद्वदेव विविक्तताद्दशशक्तिशक्तिमत्ताभेदेन प्रतिपाद्यमानं वा **भगवानिति** शब्द्यते ।

श्रीजडभरतेन एवमेवोक्तम्-

ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेक-
मनन्तरं त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम् ।
प्रत्यक् प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं
यद् वासुदेवं कवयो वदन्ति ।। इति (५.१२.११)

श्रीध्रुवं प्रति श्रीमनुना-

त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तौ ।
भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्याग्रन्थिं विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम् ।। इति (४.११.३०)

पद्येऽत्र आनन्दमात्रं विशेष्यं समस्ताः शक्तयो विशेषणानि, विशिष्टो भगवानिति आयातम् । तथा च एवं वैशिष्ट्ये प्राप्ते पूर्णाविर्भावत्वेन **अखण्डतत्त्वरूपोऽसौ भगवान्** ; **ब्रह्म तु स्फुटम् अप्रकटितवैशिष्ट्याकारत्वेन तस्यैव असम्यगाविर्भाव** इत्यागतम् ।

विष्णुपुराणे भगवच्छब्दार्थः एवं प्रोक्तः-

यत्तदव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमक्षयम् ।
अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाद्यसंयुतम् ।।
विभुं सर्वगतं नित्यं भूतयोनिमकारणम् ।
व्याप्यव्याप्यं यतः सर्वं तद् वै पश्यन्ति सूरयः ।।
तद् ब्रह्म परमं धाम तद् ध्येयं मोक्षकाङ्क्षिणाम् ।
श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं तद् विष्णोः परमं पदम् ।।
तदेतद् भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः ।
वाचको भगवच्छब्दः तस्याद्यस्याक्षरात्मनः ।। इत्याद्युक्त्वा
संभर्तेति तथा भर्ता भकारोऽर्थद्वयान्वितः ।
नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्तथा मुने ।।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीङ्गना ।।
वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि ।
स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः ।। इति चोक्त्वा

ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यशेषतः ।
भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः ।। इति पर्यन्तेन

उपर्युक्तश्लोके **अरूपम्** इत्यादिकं प्राकृतरूपादिनिषेधनिष्ठम् । अतएव **पाणिपादाद्यसंयुतमि**ति संयोगसम्बन्ध एव परिह्रियते , न तु समवायसम्बन्ध इति ज्ञेयम् । **विभुम्** इति सर्ववैभवयुक्तम् । **व्यापी** इति सर्वव्यापकम् । **अव्याप्यम्** इति अन्येन व्याप्तुमशक्यम् । तदेतद् ब्रह्मस्वरूपं भगवच्छब्देन वाच्यं न तु लक्ष्यम् । भगवच्छब्दोऽयं तस्य नदीविशेषस्य गङ्गाशब्दवद् वाचक एव, न तु तटस्थवत् लक्षकः ।

पुनरपि अक्षरसाम्यात् निर्ब्रूयाद् इति निरुक्तमतमाश्रित्य संभर्तेति इत्याह-**संभर्ता**-स्वभक्तानां पोषकः। **भर्ता** धारकः स्थापक इति । **नेता** स्वभक्तिफलस्य प्रेम्णः प्रापकः । **गमयिता** स्वलोकप्रापकः । **स्रष्टा** स्वभक्तेषु तत्तद्गुणस्य उद्गमयिता ।

ऐश्वर्यं सर्ववशीकारित्वम् । **समग्रस्ये**ति सर्वत्रान्वेति । **वीर्यं** मणिमन्त्रादेरिव प्रभावः । **यशः** वाङ्मनःशरीराणां साद्गुण्यख्यातिः। **श्रीः** सर्वप्रकारा संपत् । **ज्ञानं** सर्वज्ञत्वम् । **वैराग्यं** प्रपञ्चवस्त्वनासक्तिः । **इङ्गना** संज्ञा । अक्षरसाम्यपक्षे भगववान् इति वक्तव्ये मतुपो वलोपः छान्दसः ।

प्रकारान्तरेण षड् भगान् दर्शयति-ज्ञानशक्ती **ज्ञानम्** अन्तःकरणस्य, **शक्ति**रिन्द्रियाणाम्, **तेजः** कान्तिः, **अशेषतः** सामग्र्येण इत्यर्थः । भगवच्छब्दवाच्यानि- भगवतो **विशेषणानि** (विद्यमानं सद् इतरव्यावर्तकानि) एव एतानि **न तु उपलक्षणानि** (अविद्यमानं सदितरव्यावर्तकानि) इत्यर्थः । अत्र भगवानिति नित्ययोगे मतुप् ।

अत एव श्रीगीताभाष्ये आचार्यशङ्करेणोक्तं- **स च भगवान् ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिः सदा संपन्नः** ....इत्यादि ।

एवं यत् श्रुतिप्रसिद्धं ब्रह्म तद् भगवतः महिमा एव । तदुक्तं सत्यव्रतं प्रति श्रीमत्स्यदेवस्योपदेशे-

मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम् । **इति** ८.२४.३८

<u>**ब्रह्म भगवतः पदम्**</u>- द्वितीयस्कन्धे भगवन्तं स्तुवन् ब्रह्मा जगाद -

शश्वत् प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम् ।
शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना ।। इति २.७.४७

तद् वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद् विदुरजस्रसुखं विशोकम् ।
सध्र्यङ् नियम्य यतयो यमकर्तहेति जह्युः स्वराडिवनिपानखनित्रमिन्द्रः ।। इति २.७.४८

शश्वत् सदैव प्रशान्तम् अभयं प्रतिबोधमात्रं ज्ञानैकरसं शुद्धं निर्मलं समं सदसतः स्थूलसूक्ष्मात् परम् आत्मनो ज्ञातुः तत्त्वं स्वरूपभूतम् अजस्तसुखं सदानन्दस्वरूपं विशोकं यन्मुनयो ब्रह्मेति विदुः तद् वै भगवतः पदं स्वरूपं यत्र शब्दोऽपि न प्रवर्तते इत्याद्यर्थः।

अत्र गोस्वामिचरणैरुक्तं- **सर्वतो बृहत्तमत्वाद् ब्रह्मेति यद् विदुः तत् खलु परमस्य पुंसो भगवतः पदमेव, निर्विकल्पतया साक्षात्कृतेः प्राथमिकत्वाद् ब्रह्मणश्च भगवत एव निर्विकल्पसत्तारूपत्वात्, विचित्ररूपादि-विकल्पविशेषविशिष्टस्य भगवतस्तु साक्षात्कृतेः तदनन्तरजत्वात्, तदीयस्वरूपभूतं तद् ब्रह्म तत्साक्षात्कारा-स्पदं भवति इत्यर्थ** इति ।

अथ तथाविधभगवद्रूपपूर्णाविर्भावं तत्तत्त्वं पूर्ववज्जीवादिनियन्तृत्वेन स्फुरद् वा प्रतिपाद्यमानं वा **परमात्मेति** शब्द्यते इति । श्रीकृष्णसन्दर्भे समानमेवोक्तं गोस्वामिना- **शक्तिवर्गलक्षणतद्धर्मातिरिक्तं केवलं ज्ञानं ब्रह्मेति शब्द्यते, अन्तर्यामित्वमयमायाशक्तिप्रचुरचिच्छक्त्यंशविशिष्टं परमात्मा, परिपूर्णसर्वशक्तिविशिष्टं भगवान्** इति

<u>भगवति प्राकृतगुणनिषेधः</u>- उपर्युक्तलक्षणलक्षिते भगवति प्राकृतगुणानामभावो विद्यते । तदुक्तं प्राकृताः सत्त्वादयो गुणाः जीवस्य न तु ईशस्येति । तदुक्तमेकादशे- **सत्त्व रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे** इति । गीतोपनिषत्सु च-

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।। इत्यादि
दशमे अपि- हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः ।
स सर्वदृगुपद्रष्टा तं भजन्निर्गुणो भवेत् ।। इति

श्रीविष्णुपुराणे-

सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः।
स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ।। इति

एवं प्राकृतगुणानामभावेऽपि अप्राकृतास्तु अन्ये गुणाः तस्मिन् सन्त्येव इति व्यञ्जितं भवति ।

<u>भगवतः मायातीतत्वम् आनन्दरूपत्वं च-</u>

त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः ।
मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि ।। इति १.७.२३
त्वं साक्षात् स्वयमेवाद्यः पुरुषः भगवान् इत्यादि ।
परावराणां परम आस्ते कैवल्यसंज्ञितः।। इति ११.९.१८
केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ।।
स्वयमुपलब्धनिजसुखानुभवो भवानिति ।६.९.३३

<u>भगवतः कालातीतत्वम्-</u>

नष्टे लोके द्विपरार्द्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु
व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः ।। इति १०.३.२५

<u>भगवतः विभुत्वम्-</u>

न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम् ।
पूर्वापरं बहिश्चान्तर्जगतो यो जगच्च यत् ।। इति १०.९.१३

बन्धनं हि बहिः परीतेन दाम्ना अन्तरावृतस्य भवति । तथा पूर्वापरविभागवतो वस्तुनः पूर्वतो दाम धृत्वा परतः परिवेष्टनेन भवति । न तु एतदस्तीत्याह-**नचान्तरिति** ।

गीतायामयमर्थ उच्यते-

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।। इति

<u>भगवतः स्थूलसूक्ष्मातिरिक्तत्वम्-</u>

स वै न देवासुरमर्त्यतिर्य्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः ।
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः ।। इति ८.३.२४

टीका- किं वहुना यदत्र सत् स्थूलम् असत् सूक्ष्मं तदेकमपि न भवति स्वप्रकाशरूपत्वात् इति भावः। किन्तु सर्वस्य निषेधे अवधित्वेन शिष्यते इति शेषः।

एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः ।
नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् ॥ इति ८.३.३०

एवमुपवर्णितं निर्विशेषं देवादिरूपं विना परं तत्त्वं येन तं गजेन्द्रम् । विविधा चासौ लिङ्गभिदा देवादिरूपभेदश्च तस्यामभिमानो येषाम् । अतएव ते ब्रह्मादयो यदा नोपजग्मुः तदा निखिलात्मकत्वात् निखिलानां तेषां परमात्मसुख-रूपत्वात् तद्विलक्षणो मायया अशेषात्मकत्वात् अखिलामरमयो हरिराविरासीत् । एवमाविर्भावं प्रार्थयमाने श्रीगजेन्द्रे यूद्रेण आविर्भूतं तत् खलु तादृशमेव भवितुमर्हतीति साधूक्तं स्थूलसूक्ष्मवस्त्वतिरिक्तः भगवतः श्रीविग्रहः इति ।

<u>भगवतः निर्विकारत्वम्-</u>

न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा ।
तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ इति ८.३.८

अयमर्थः- अवस्थान्तरप्राप्तिः विकारः । तत्र प्रथमविकारो जन्मेति । अपूर्णस्य निजपूर्त्यर्थां चेष्टा कर्मेति । मनोग्राह्यस्य वस्तुनः व्यवहारार्थं केनापि संकेतितः शब्दः नामेति । चक्षुषा ग्राह्यो गुणो रूपमिति । यस्य च सर्वदा स्वरूपस्थत्वात् पूर्णत्वात् मनसः अगोचरत्वात् स्वप्रकाशत्वात् प्रकृत्यतीतत्वात् तानि न विद्यन्ते । तथापि यस्तानि ऋच्छति प्राप्नोति तस्मै नमः इत्युत्तरश्लोकेनान्वयः ।

<u>भगवतः असम्यक्स्फूर्तिरिव ब्रह्म-</u>

श्रीभगवानेव अखण्डं तत्त्वं साधकविशेषाणां तादृशयोग्यत्वाभावात् सामान्याकारोदयत्वेन तदसम्यक्स्फूर्तिरिव ब्रह्मेति श्लोकद्वयेनोच्यते-

ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः।
द्वयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः । इति ३.३२.३२
यथेन्द्रियैः पृथग्द्वारैः अर्थो बहुगुणाश्रयः ।
एको नानेयते तद्वद् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः ॥ इति ३.३२.३३

दृष्टान्तः- यथा बहूनां रूपरसादीनां गुणानामाश्रयः क्षीरादिरेक एवार्थो मार्गभेदप्रवृत्तैः

इन्द्रियैः नाना प्रतीयते, चक्षुषा शुक्ल इति रसनेन मधुर इति स्पर्शेन शीत इत्यादि तथा भगवान् एक एव तत्तद्रूपेण अवगम्यते । अत एव तदंशत्वेन एव ब्रह्म श्रूयते । तदुक्तं-

अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः ।
शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू ।। इति (३.३२.६४)

भगवतो विभूतिनिर्विशेषं ब्रह्म-

अतः भगवतः असम्यक्प्रकाशत्वात् विभूतिनिर्विशेषम् एव ब्रह्म । तदुक्तं **मदीयं महिमानं च परंब्रह्मेति शब्दितम्** इति ।

उपसंहारः- वस्तुतः ब्रह्मसूत्रस्य अकृत्रिमभाष्यभूतं श्रीमद्भागवतं सर्ववेदान्तसारमुच्यते । **वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहमि**ति भगवद्वचनात् स एक एव वेदान्तवित् नान्य इत्यवगम्यते । इतरे तु स्वस्वमनीषामनुसृत्य वेदान्तार्थमधिजग्मुः । अतः वेदान्तसिद्धान्तभूतं ब्रह्म भवतु अथवा भगवान् सर्वमेतत् प्रकृतेः परतत्त्वत्वेन अस्मत्कृते अचिन्त्यमेव । अतः यादृशं ब्रह्म यादृशो वा भगवान् तादृशमेव नमस्कृत्य विरम्यते इति शम् ।

लेकर हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेक्चर आदि यदि इच्छा हो तो यह सब बाद में करो। केवल ब्रह्म–ब्रह्म कहने से क्या होगा–यदि विवेक वैराग्य न रहे। वह तो केवल व्यर्थ में शंख फूँकना ही हुआ।

—श्रीरामकृष्ण

बात सत्य होते हुए भी उसे अप्रिय दंग से नहीं कहनी चाहिए। नहीं तो आखिर में ऐसा ही स्वभाव हो जाता है। मनुष्य के नेत्रों के नेत्रों की लज्जा चली जाने पर फिर मुँह में कुछ अटकता नहीं।

—श्रीश्रीमाँ सारदा देवी

'ध्रुवमपायेऽपादानम्' इति सूत्रे ध्रुवग्रहणतात्पर्यम्

असीमरुइदासः

स्नातकोत्तरद्वितीयवर्षीयः

उपोद्घात :

मानवान्तःकरणेषु विद्यमानभावानां प्रकाशनाय उपलब्धेषूपायेषु अन्यतमा श्रेष्ठा च भाषा। सा भाषा तदैव सम्यग्ज्ञाता भविष्यति यदा तदीयभाषायाः व्याकरणज्ञानं परिज्ञातं भवेत्। जगति प्रचलितासु भाषासु प्राचीना भाषा हि संस्कृतभाषा देवभाषा वा। संस्कृतभाषामाश्रित्य नैके व्याकरणसम्प्रदायाः आविर्बभूवुः। तथाहि प्राप्यते श्रीतत्त्वविधिनामधेये वैष्णवग्रन्थे-

''ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्।
सारस्वतं चापिशलं शाकल्यं पाणिनीयकम्॥''१ इति।

संस्कृतव्याकरणम् आधुनिकभाषाविज्ञानदृष्ट्या आङ्गलादिव्याकरणदृष्ट्या च यथा भिन्नं तथा संकीर्णञ्चापि। आ प्राचीनकालात् शब्दतत्त्वस्य अतले गभीरे संस्कृतवैयाकरणानां प्रवेशो यथा विस्मयकरस्तथा प्रशंसनीयश्चेति। एतेषु व्याकरणग्रन्थेषु न केवलं ध्वनि-पद-शब्द-वाक्य-प्रत्ययादयो विषया आलोचिताः, अपि च शब्दवादस्फोटवादादयो दार्शनिकविषया अपि।

संस्कृतव्याकरणसम्प्रदायेषु महावैयाकरणपाणिनिप्रवर्तितः पाणिनीयसम्प्रदाय एव श्रेष्ठः। अस्मिन् सम्प्रदाये यथा सूत्रकारस्य पाणिनेः अवदानं विद्यते तथा वार्तिककारस्य कात्यायनस्य, भाष्यकारस्य पतञ्जलेश्चापि। तदर्थमेव पाणिनीयव्याकरणं 'त्रिमुनि व्याकरणम्' इति नाम्ना अभिधीयते। वैयाकरणशिरोमणिना पाणिनिना चतुर्दश-माहेश्वरसूत्राणि अवलम्ब्य अष्टाध्यायीनामको ग्रन्थो ग्रथितः। अष्टाध्यायीमाश्रित्य वार्तिककारेण वार्तिकानि विवृतानि, सूत्राणि वार्तिकानि चाबलम्ब्य पतञ्जलिना महाभाष्यं भाषितम्। सुष्ठूक्तम्—

''यद् विस्मृतमदृष्टं वा सूत्रकारेण तत्स्फुटम्।
वाक्यकारो ब्रवीत्येव तेनादृष्टं च भाष्यकृत्॥''२ इति॥

ननु व्याकरणं नाम किम्? किं वा अस्य प्रयोजनम्? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययविभागेन शब्दा अनेनेति व्याकरणम्।

'अथ शब्दानुशासनम्'३ इति महाभाष्यकारवचनानुसारं साधुशब्दज्ञानमेव व्याकरणस्य साक्षात्प्रयोजनम्। इदानीं महाभाष्यविषये किञ्चिदुच्यते-

पातञ्जलमहाभाष्यम्

पाणिनिप्रणीतानि सूत्राणि वार्तिककारनिगदितानि वार्तिकानि च आश्रित्य पतञ्जलिमुनिना महाभाष्यनामधेयो ग्रन्थः निर्मितः। संस्कृतवाङ्मये नैकेषां शास्त्राणां भाष्यग्रन्थाः दृश्यन्ते। यथा वेदान्तशास्त्रस्य शाङ्करभाष्यम्, मीमांसाशास्त्रस्य शावरभाष्यं, न्यायदर्शनस्य वात्स्यायनभाष्यम्। एतेषां प्रयोगसमये केवलं भाष्यमिति शब्दः प्रयुक्तः परन्तु महामुनिपतञ्जलिभाषितं भाष्यं महाभाष्यमिति नाम्ना कीर्त्यते। भाष्यलक्षणं लक्षितं-

''सूत्रस्थं पदमादाय पदैः सूत्रानुसारिभिः।
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः॥''[४]इति।

महाभाष्यस्य भाषा अतिसरला सत्यपि गाम्भीर्यसमन्विता। सूत्रव्याख्यानसमये पतञ्जलिना आक्षेपसमाधानप्रत्याख्यानरूपपद्धतिरबलम्बिता। तदुक्तं पदमञ्जरीकारेण हरदत्तेन-'**आक्षेपसमाधानपरो ग्रन्थो भाष्यम्, तद्धि कात्यायनप्रणीतानां वाक्यानां पतञ्जलिप्रणीतं विवरणम्**'[५] इति। पञ्चाशीत्याह्निकसमन्वितगद्यात्मकसुगभीरभावसमुद्ररूपपदच्छेदपदार्थोक्तिविग्रहवाक्ययोजनया आक्षेपसमाधानसंयुतविशालव्याख्यानकलेवरस्वरूपो ग्रन्थोऽयं महाभाष्यनामधेयः सर्वजनविदितः। वाक्यपदीये भर्तृहरिणा महाभाष्यग्रन्थविषये न्यगादि-

''**कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना।
सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने॥**''[६] इति।

महाभाष्ये विराजमानेषु आह्निकेषु नैके विषयाः पतञ्जलिना निरूपिताः। कारकाह्निके कानिचन कारकाणि तेन आक्षेपसमाधानाभ्यां निगदिताः। तत्रस्थितं 'कारके' इति सूत्रमाधारीकृत्य किञ्चित्कथ्यते—

'कारके'(१।४।२३) इति सूत्रम्

प्रायः सर्वैः पाणिनिसम्प्रदायान्तर्गतवैयाकरणैः स्वकीयेषु व्याकरणग्रन्थेषु कारकविषयिणी आलोचना भूरिशः विहिता। परन्तु एतत् विस्मयकरं यत् स्वयं पाणिनिमुनिना तदीयायाम् अष्टाध्याय्यां कारकविधायकं किमपि सूत्रं न सूत्रितम्। केवलं 'कारके' (१।४।२३) इति सूत्रमेकं तेन सूत्रितम्। सूत्रमिदं षट्सु सूत्रभेदेषु संज्ञा-परिभाषा-विधि-नियम-अतिदेश-अधिकारेषु कुत्र अन्तर्यातीति जिज्ञासुना भाष्यकारेण पतञ्जलिना पृष्टम्-'**किमिदं कारके**' इति७। 'कारके' इति सूत्रं किं स्वरूपमिति तदाशयः। कारके इत्यत्र या सप्तमी सा तु सौत्री। प्रसङ्गेऽस्मिन् प्रदीपटीकाकारेण वैयाकरणकैयटेन टीकितम्-'**सप्तमीनिर्देशान्न तावत्संज्ञात्वेनाधिकारः। संज्ञायां भाव्यमानत्वात्प्रथमानिर्देशस्य न्याय्यत्वात्। अथ विशेषणत्वेनाधिकारस्तदा कारकाद्दत्तश्रुतयोरित्यादावपादानादिसंज्ञाविकलस्यापि कारकस्य ग्रहणं प्राप्नोति**'[८] इति।

अनन्तरं भाष्यकृता स्वयमेव 'कारके' इति सूत्रं संज्ञासूत्ररूपेण निर्दिष्टम्-'**कारके इति संज्ञानिर्देशः**'**९ इति**। 'कारके' इति सूत्रेण यदि संज्ञा निर्दिश्यते तदा संज्ञिनिर्देशो विधातव्यः, संज्ञिनिर्देशाभावे संज्ञायाः वैयर्थ्यापत्तेः। अत्र वार्तिककारेण वैयाकरणकात्यायनेन निगदितम्-'**कारके इति संज्ञानिर्देशश्चेत्संज्ञिनो निर्देशः**'' **१० इति**। वार्तिकाशयं स्पष्टीकुर्वता भाष्यकारेण भाषितम्-'**कारके इति संज्ञानिर्देशश्चेत्संज्ञिनोऽपि निर्देशःकर्तव्यः। साधकं निर्वतकं कारकसंज्ञं भवतीति वक्तव्यम्**'[११] इति। 'अदेङ् गुणः' (१।१।२), 'वृद्धिरादैच' (१।१।१) इत्यादिसूत्रेषु संज्ञासंज्ञिनोः उभययोरेव निर्देशः यथा वर्तते तद्वत् 'कारके' इत्यत्रापि संज्ञिनिर्देशः करणीयः, यदि संज्ञी न निर्दिश्यते तदा ग्रामस्य समीपादागच्छति इत्यत्र अकारस्यापि कारकसंज्ञा प्रसज्येत, तथा 'अकथितञ्च' (१।४।५१) इत्यनेन ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति इत्यत्र अपादानादिविशेषकथाभिरविवक्षिते कारके कर्मसंज्ञा कदापि न विधीयेत। एतादृशसमस्यायां समुदितायां

भाष्यकारेण पतञ्जलिना कारके इत्यनेन महती संज्ञा स्यात् इति उपदिष्टम्। करोतीति कारकमिति कारकस्य अन्वर्थसंज्ञा तेन निर्देशिता–'**कारके इति महती संज्ञा क्रियते। संज्ञा च नाम यतो न लघीयः। कुतो एतत्? लघ्वर्थं हि संज्ञा करणम्। तत्र महत्या संज्ञायाः करणे एतत्प्रयोजनमन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत- करोतीति कारकम्।**'[१२] इति। प्रसङ्गेऽस्मिन् कैयटेन भणितं–'**महत्या संज्ञायाः करणादनुमीयते नूनं विशिष्टा ध्रुवादयः संज्ञित्वेन निर्दिष्टाः। यद्विशेषदर्शनात्तदनुरूपा तेषां संज्ञा क्रियते। साध्यत्वेन क्रियैव शब्दात्प्रतीयते इति क्रियाया निर्वर्तकस्य कारकसंज्ञाऽपादानादिसंज्ञा च प्रवर्तते।**'[१३] इति।

अतएव उपर्युक्तालोचनया ज्ञायते यत् कारके इति सूत्रं संज्ञाधिकारसूत्रम्। कारकलक्षणप्रसङ्गे जगदीशतर्कालङ्कारेण चोदितं–'**विभक्त्यर्थद्वारा क्रियान्वयित्वं मुख्यभाक्तसाधारणं कारकत्वम्**'[१४] इति।

'**क्रियानिष्पादकत्वं कारकम्**'[१५] इति मञ्जूषायां नागेशेन निगदितम्।

कारकभेदाः

कारकमिदं षड्विधं कर्तृ–कर्म–करण–सम्प्रदान–अपादान–अधिकरणभेदात्। तदुक्तं परमलघुमञ्जूषायां

> **''कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च।**
> **अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्॥''१६ इति**

एकस्मिन् स्थले यदि नैकेषां कारकाणां प्रयोगः प्राप्यते तदा कः क्रमोऽनुसरणीयः इति संक्षिप्तसारे परामृश्यते—

> **''अपादानसम्प्रदानकरणाधारकर्मणाम्।**
> **कर्तुश्चान्योऽसन्देहे परमेकं प्रवर्तते॥''१७ इति।**

इदानीं प्रसङ्गतया कारकप्रकरणान्तर्गतापादानकारकविधायके 'ध्रुवमपायेऽपादानम्' इति सूत्रे ध्रुवपदस्य तात्पर्यं किमिति समासेन प्रस्तूयते–

'ध्रुवमपायेऽपादानम्' (१।४।२४)

षड्विधकारकेषु अपादानकारकम् अन्यतमम्। अपपूर्वकात् आङ्पूर्वकात् दाधातोः अपादानवाच्ये ल्युटि अपादानशब्दो निष्पद्यते। अपादानसंज्ञाविधायकं प्रमुखं सूत्रं तावत् 'ध्रुवमपायेऽपादानम्'(१।४।२४) इति। त्रिपदात्मकेऽस्मिन् सूत्रे ध्रुवमिति प्रथमान्तं पदम्, अपाये इति सप्तम्यन्तं पदम्, अपादानम् इति संज्ञाबोधकं प्रथमान्तं पदम्। अपाये यद् ध्रुवं तत्कारकं सत् अपादानसंज्ञं विधीयते इत्यर्थोऽनेन प्रकृतशास्त्रेण ज्ञायते। ध्रु स्थैर्ये इति धातुपाठात् ध्रुधातोः पचाद्यचि निष्पन्नो ध्रुवशब्दः स्थैर्यार्थकः। ध्रुवं नाम अवधिभूतम्। द्वयोःसंयुक्तयोः पदार्थयोर्मध्ये चलनहेतुत्वाद्यदा विभागो जायते, तदा चलनस्यानाश्रयो यो भवति तस्यैव ध्रुवत्वं सिद्धं स्यात्। यथा वृक्षात्पर्णं पतति इत्यत्र पतनक्रियायाः अनाश्रयत्वात् वृक्षे एव ध्रुवता सिद्धा। परन्तु कुटस्थनिष्क्रियब्रह्मरूपः अपरो योऽर्थः ध्रुवशब्देन सूच्यते सोऽर्थ इह शास्त्रे अनाभीप्सितः। विषयोऽयं स्पष्टीकुर्वता वाक्यपदीये भर्तृहरिणा भणितम्–

''द्रव्यस्वभावो न ध्रौव्यमिति सूत्रे प्रतीयते।
अपायविषये ध्रौव्यं यत्तु तावद्विवक्षितम्॥''१८इति।

पाणिनिसम्प्रदाये ध्रवलक्षणप्रसङ्गे एवमुच्यते-प्रकृतधात्वर्थानाश्रयत्वे सति तज्जन्यविभागाश्रयो ध्रुवम् इति। संयोगवद्विभागोऽपि द्विष्ठ:। यस्माद्विभक्तो भवतीत्येक:, यो विभक्तो भवनीति अपर:। यथा वृक्षात्पर्णं पतति इत्युदाहरणे पतनक्रियाया: अर्थस्तावत् गतिविशेषो विभागोत्पादकव्यापरविशेषो वा। पतनसमये विभागो यथा वृक्षेऽस्ति, तथा पर्णेऽपि। परन्तु अत्र गतिविशेषविद्यमानत्वाभावाद् वृक्षे ध्रुवत्वं विद्यते पर्णे तु गतिविशेषस्थितत्वाद् अध्रुवत्वम्। तेनात्र वृक्ष एव अपाययुक्त: ध्रुवं वा। परन्तु वृक्षस्य पर्णं पततीति उदाहरणे वृक्षपर्णयोर्मध्ये कोऽपि विभागो न भवति। तेन विभागाभावात्तत्र ध्रुवकल्पना अनर्थका। तस्मादेव तत्र न सिद्धा अपादानसंज्ञा। अत्र या पतनक्रिया विद्यते तस्या अर्थ एवं भवेत्-अधोदेशसंयोगानु-कूलव्यापार:।

ननु किं नाम अपाय:? अपायो नाम विश्लेष इति भट्टोजिदीक्षित:। महाभाष्योद्योतटीकाकारेण वैयाकरणशिरोमणिनागेशेन अपायविषये लक्षित:-**'अपायोऽत्र विभागजसंयोगानुकूलोऽवधिसाकाङ्क्षो गतिविशेष:'१९** इति। अपायो विभागजनको व्यापार इति लघुशब्देन्दुशेखरकृत्।

सूत्रस्थध्रुवपदग्रहणतात्पर्यम्

'ध्रुवमपायेऽपादानम्' इति सूत्रव्याख्यानात्पूर्वं भाष्यकारमनसि संशय उदेति, ध्रुवग्रहणविषयक:। तेन पृष्टं-**'ध्रुवग्रहणं किमर्थम्'२०** इति। ध्रुवग्रहणाभावे यदि अपायेऽपादानम् इत्याकारात्मकं सूत्रं स्यात्तदा का हानि: इति प्रश्नाशय:। अपाये यत्साधनं तदपादानसंज्ञं स्यादिति अर्थे लब्धे सति ग्रामादागच्छति शकटेन इत्यादौ शकटे अपादानसंज्ञा प्रसज्यते, अपाये शकटस्यापि साधनत्वात्। अत्र भाष्यकाराशयो हि प्रस्तुतोदाहरणे करणसंज्ञापादानसंज्ञयो: प्राप्तिरस्ति इति सत्यं, परन्तु करणापादनयो: परत्वात् [('साधकतमं करणम्' (१।४।४२), 'ध्रुवमपायेऽपादानम्' (१।४।२४)] करणसंज्ञा अपादानसंज्ञया बाधिका भविष्यति। प्रदीपटीकाकारेणात्र न्यगादि-**'यथा धनुषा विध्यतीति क्रियमाणेऽपि ध्रुवग्रहणे परत्वात्करणसंज्ञा भवति, एवमक्रियमाणेऽपि शकटस्य भविष्यतीत्यर्थ:'२१** इति। तेन उपर्युक्तोदाहरणे ध्रुवग्रहणस्य नैतत्फलमिति मन्यमानेन पुन: भाष्यकारेण भणितम्-**'इदं तर्हि ग्रामादागच्छन् कंसपात्र्यां पाणिनौदनं भुङ्क्ते'२२** इति। अत्र कंसपात्र्यामपादानसंज्ञा भवति न वा इति प्रश्न:। अत्र आगमनं प्रधानं, भोजनं तु तदङ्गम्। कंसपात्री भुजे: साधनमाध्यमेन आगमनस्यापि साधनं भवति। तेनात्रापि अधिकरणसंज्ञा परत्वात् ['आधारोऽधिकरणम्' (१।४।४५), 'ध्रुवमपायेऽपादानम्'(१।४।२४)] अपादानसंज्ञया बाधिका भविष्यति। विषयोऽयं स्पष्टीकुर्वता नागेशेन उद्योते टीकितं-**'न च भोजनद्वारा गमनसाधनत्वम्। भोजनस्य प्राधान्येन गमनाङ्गत्वाभावात्'**२३ इति।

ननु कुड्यस्य पिण्ड: पतति, वृक्षस्य पर्णं पतति इत्यादौ यथा अपादानसंज्ञा न भवेत्तदर्थं ध्रुवग्रहणं विहितमिति चेन्न, प्रस्तुतसूत्रे ध्रुवग्रहणेन गतिविशिष्टोऽपाय: परामृष्ट:, अत्र तादृशापायाभावान्न अपादानसंज्ञा।

ननु रथात्प्रवीतात्पतित:, अश्वात्त्रस्तात्पतित: सार्थाद्गच्छतो हीन: चेत्यादिषु उदाहरणेषु गतियुक्तत्वात् ध्रुवतापि न विद्यते। तेन गतियुक्तेषु एतेषूदाहरणेषु अपादानसंज्ञा कथं साधितेति मन्यमानेन वार्तिककारेण कात्यायनेन निगदितं–'**गतियुक्तेष्वपादानसंज्ञा नोपपद्यतेऽध्रुवत्वात्**'२४इति। अत्र कैयटेन टीकितम्–'**अचलं ध्रुवमेकरूपं चेति परिस्पन्दे ध्रवता नास्तीति मन्यते। त्रासपूर्वके परिस्पन्देऽनेकार्थत्वाद्धातूनां त्रसिर्वर्तते। त्रस्तश्चाश्वः पातस्य निमित्तमिति पूर्वमश्वस्य त्रस्तत्वेन सम्बन्धः पश्चात्पतित इत्यनेनेति ध्रुवताश्वस्य नास्ति**'।२५ इति।

समस्याया अस्याः समाधानं वार्तिककारेण अतिसरलेन नियमेन साधितम्। भाष्यकारेणापि तद्वार्तिकाशयः सरलतयोपस्थापितः। अत्र वार्तिकमस्ति–'**न वाऽध्रौव्यस्याविवक्षितत्वात्**'२६ इति।

उपर्युक्तेषूदाहरणेषु अध्रौव्यं न विवक्षितम्। तत्र ध्रौव्यमेव विवक्षितम्। कथं स्यात्? प्रवीतात् पतितः इत्यत्र रथे, प्रवीते च ध्रुवता अविवक्षिता, परन्तु रथे यद्रथत्वं रमन्तेऽस्मित् इति रथ इति तद्ध्रुवं तच्च विवक्षितम्। तेनात्र कोऽपि दोषो न भवत्येव। समानमेव अश्वात्त्रस्तात्पतित इत्यत्र अश्वे यदश्वत्वमाशुगामित्वं तद्ध्रुवं तच्च विवक्षितम्। पुनः सार्थाद्गच्छतो हीन इत्यत्र सार्थे यत्सार्थत्वं तद्ध्रुवं तच्च विवक्षितम्। परन्तु भाष्यकारस्य मतमिदं विपरीतुकामः आचार्यः कैयटः जगाद–'**ध्रुवमेकरूपमुच्यते। तच्च ध्रौव्यमपायविषयमश्रीयते। न त्वनवच्छिन्नम् ततोऽपाये यदनाविष्टं तदपाये ध्रुवमुच्यते।**'२७इति। यथा देवदत्तः त्रस्तात् अश्वात् पतितःइत्यत्र देवदत्तकर्तृके पतने अश्वः त्रस्तः सन्नपि, त्रस्तस्याश्वस्यापायनावेशाद् ध्रुवत्वम् विद्यते। अत्र देवदत्तस्यापायावेशादध्रुवत्वं स्पष्टमेव।

पुनः भाष्यकारः आक्षेपति–'**ये त्वेतेऽत्यन्तं गतियुक्तास्तत्र कथम्। धावतः पतितस्त्वमाणात्पतितः**'२८ इति, अत्रापि ध्रौव्यम् अविवक्षितम्। अश्वस्य धावनरूपविशेषणमत्राविवक्षितम्। पूर्वोक्तरीत्या एव समाधानमत्र प्रदीयते। अत्र प्रदीपटीकाकारेण टीकितम्–'**यत्र क्रिया न प्रवृत्तिनिमित्तं किन्तु व्युत्पत्तिमात्रनिमित्तं तत्रैतद्वक्तुं युज्यते। यत्र तु शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं क्रिया तत्र कथं नाध्रौव्यमिति प्रश्नः**'२९ इति। पुनः भाष्यकारस्य मनसि शङ्कैका उदेति यस्यास्तित्वं विद्यते तस्याविवक्षाकरणे किं प्रयोजनम्। तेन भाषितं–'**कथं पुनः सतो नामाविवक्षा स्यात्?**' इति। अत्र समाधीयते भाष्यकारेणोदाहरणेन अलोमिका एडका इत्यत्र लोम्नः विद्यमाने सत्यपि नास्ति इति मन्यते। अनुदरा कन्या इत्यत्रापि कन्यायाः उदरः अस्ति अपि नास्तीति विवक्षा क्रियते। भाष्यकारेणात्र निगदितं–'**सतोप्यविवक्षा भवति। तद्यथा अलोमिका एडका अनुदरा कन्या**'३० इति। यस्यास्तित्वं न दृश्यते तत्र विवक्षाकरणेन प्रयोगः दृश्यते। यथा–समुद्रः कुण्डिका। अत्र कुण्डिकायां पानीयबाहुल्यात्समुद्रत्वं विवक्षितं समुद्रस्य वा सुतरत्वात्कुण्डिकात्वम्। भाष्यकारेण तथाह्यत्र भाषितम्–'**असतश्च विवक्षा भवति समुद्रः कुण्डिका विन्ध्यो वर्धितकमि**'३१ति।

ध्रुवत्वविषये नैयायिकसम्मतं मतं हि–विभागजनकत्वं हि क्रियायामन्वीयते तत्क्रियाशून्यत्वं ध्रुवत्वम् इति। देवदत्तः पर्वतात्पततोऽश्वात्पतति इत्युदाहरणे पूर्वापरक्रमेन द्विविधक्रियाबोधात् तत्र भिन्नं भिन्नमवधित्वमुररीकर्तव्यम्। वाक्यस्यास्यान्वयबोध एवं भवेत्–पर्वतावधिकपतनाश्रयो योऽश्वस्तदवधिकं देवदत्तादिनिष्ठं पतनम् इति। ननु मेषो मेषादपसर्पति इति प्रयोगः कथं स्यात्। अत्र एकस्य मेषस्य कर्तृत्वविवक्षा अपरस्य मेषस्य अपादानत्वविवक्षा विधातव्या। तेनात्र कापि हानिः न सम्भवति।

परन्तु परस्परस्मान्मेषावपसरतः अपसरतो मेषादपसरति मेष वा इत्यादौ अवधित्वं भवति न वा इति प्रश्ने उदिते समाधानमेवं स्यात् यदा द्वौ मेषौ परस्परस्मादपसरतः तदा एकस्य मेषस्य अपरसरणक्रियां प्रति अपरस्य मेषस्यावधित्वम् अविरुद्धमेव। तदुक्तं वाक्यपदीये भर्तृहरिणा–

''मेषान्तरक्रियापेक्षमवधितं पृथक् पृथक्।
मेषयोः स्वक्रियापेक्षां कर्तृत्वं च पृथक् पृथक्॥''३२ इति।

उपसंहारः

पाणिनिना अष्टाध्याय्यामपादानकारकविधानाय अष्ट सूत्राणि सूत्रितानि। तानि च ''ध्रुवमपायेऽपादानम्'(१।४।२४), 'भीत्रार्थानां भयहेतुः' (१।४।२५), 'पराजेरसोढः' (१।४।२६), 'वारणार्थानामीप्सितः' (१।४।२७), 'अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति' (१।४।२८), 'आख्यातोपयोगे' (१।४।२९), 'जतिकर्तुः प्रकृतिः' (१।४।३०), 'भुवः प्रभवः' (१।४।३१) चेति। परन्तु पतञ्जलिना भाष्यकृता 'ध्रुवमपायेऽपादानम्'' इति एकमेव सूत्रम् अपादानविधायकत्वेन स्वीकृत्य अन्यानि उपर्युक्तानि सूत्राणि प्रत्याख्यातानि। पाणिनेः एकः शब्दोऽपि अनर्थकः न भवति, तर्हि किमर्थं तेन भाष्यकारेण सप्त सूत्राणि प्रत्याख्यातानि। तत्र कारणं हि अपादानसंज्ञाविधानकाले मुख्यस्यापायस्य एव ग्रहणं विहितम्। परन्तु महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना अपायस्य द्वैविध्यं कल्पितं–मुख्यापायः बुद्धिव्यवस्थितापायश्चेति। बुद्धिपरिकल्पितापायाश्रयणेनैव 'ध्रुवमपायेऽपादानम्' इति एकेनैव सूत्रेण पाणिनिस्वीकृतानाम्

मनुष्य स्वयं अपने ही कर्मों का फल भोग करता है, अतः दूसरों को दोष न दोकर भगवान से प्रार्थना कर और उनकी कृपा पर निर्भर रहकर धीरजपूर्वक सभी परिस्थितियों को सहते जाना ही उचित है।

जप, ध्यान करना, सत्संग में रहना, अहंकार को किसी भी प्रकार सिर न उठाने देना।

जैसे ही मन में कोई कुभाव उठे, मन से कहना–उनकी सन्तान होकर क्या मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ? देखोगे, मन में बल आयेगा, शांति आयेगी।

—श्रीश्रीमाँ सारदा देवी

श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्दयोः निवेदिता

सौभिकविश्वासः
स्नातकतृतीयवर्षीयः

"उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।
वर्षं तद् भारतं नाम, भारती यत्र सन्ततिः॥" इति।

वयं यदि भारतवर्षं देवीरुपेण चिन्तयामः तर्हि तस्याः देव्याः पूजासमये तन्त्रधारकः भवति श्रीरामकृष्णः, पूजकश्च च स्वामी विवेकानन्दः। सुष्ठु पूजासम्पादनाय सेविकारूपेण निवेदितां चिन्तयामः । सा निवेदिता या विदेशागता सत्यपि भारतमातुः सेवायै आत्मनियोगं चकार।

भगिनी निवेदिता यदा स्वामिविवेकानन्देन सह साक्षात्कारं कृतवती तदा स्वामिपादः ज्ञातवान् यत् भारतवर्षस्य रक्षायै एका दृढ़ा साहसयुक्ता निष्ठावती सिंही अपेक्षिता, निवेदितां व्यतिरिच्य नान्या भवितुमर्हति। अनन्तरं भगिनी निवेदिता भारतवर्षम् आगतवती। स्वामिविवेकानन्देन भणितम्—

"ইংল্যান্ড আমাদের আর একটি উপহার দিয়েছে—মিস মার্গারেট নোবেল।
ইহার নিকট আমাদের অনেক আশা।" इति।

भारतवर्षम् आगमनात् परं भारतवासिनां दारिद्रता अशिक्षिता आत्मविश्वासहीनता इत्यादयो निम्नगामिनः दोषाः तया उपलब्धाः। एतादृश्या अनस्थायाः दूरीकरणार्थं साधारणजनानां नारीणाञ्च आगमनम् अनस्वीकार्यम् इति अनुभूय तेना जनानां मध्ये किञ्चित् आदर्शानां विकाशः कृतः। स्वामिविवेकानन्दस्य सहायिका आसीत् निवेदिता। एकदा स्वप्रतिष्ठिते वोसपाडा इन्याख्ये विद्यालये एका छात्री तृष्णाकातरा जाता। तदा तस्यै जलं दातुं गता निवेदिता तया छात्र्या विदेशिनी इति मत्वा परित्यक्ता। अनया घटनया निवेदिता चिन्तितवती यदि एतादृशः संस्कारः सर्वेषां जनानां मध्ये स्यात्, तर्हि पराधीनभारतवर्षम् अचिरात् स्वाधीनं भवितुमर्हति।

भारतवर्षस्य सेवायै तया वहुकष्टं प्रतिपदं लब्धम्। तथापि भारतवर्षं प्रति तस्याः या अकृत्रिमा श्रद्धा आसीत् सा तु विवेकानन्दस्य समीपात् एव प्राप्रा। निवेदिता-विषये विपिनचन्द्रपालेन निगदितम्—

"নিবেদিতা ভারতবর্ষকে যেরূপে ভালোবাসতেন, ভারতবাসীও ততটা ভালোবাসতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।" इति।

श्रीरामकृष्णस्य साक्षाद्दर्शनं निवेदिता कदापि न प्राप्त वत्यपि उपलब्धवती यत् भारतवर्षस्य द्वे सत्ये स्तः श्रीरामकृष्णः विवेकानन्दश्च। स्वामिविवेकानन्द एव श्रीरामकृष्णस्य प्रतिरूप आसीत् इति तया ज्ञातम्। अत एव दृश्यते यत् भगिनीनिवेदितायाः जीवनयापने कर्मसु सर्वदा एव श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्दयोःआदर्श एव परिस्फुटः। अन्तिमे एतद् वक्तुं शक्यते यत् भारतमानुः सेवायै विवेकानन्दस्य पथप्रदर्शक आसीत्

श्रीरामकृष्णः। कोषसमूहः आसीद् ब्रह्मानन्दादिः पार्षदः। परं मस्तिष्कश्च भगिनी निवेदिता। निवेदिता यदा कुत्रापि स्वाक्षरं करोति तदा स्वनाम्नः प्राक् श्रीरामकृष्णविवेकानन्दयोः नामानौ उल्लिख्य स्वनाम लिखति।—

''श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्दयोः निवेदिता।''इत्येवं रूपेण
सेवाभावः तस्या मनसि कीदृशः आसीत् इति—

"If we learn nothing else, let us learn to give, let us learn to serve, let us learn to renounce." इति उक्त्या एव प्रकाश्यत इति शिवम्।

सारे मतों को नमस्कार करना, पर फिर भी एक चीज है—निष्ठा भक्ति। सभी को प्रणाम करना, लेकिन एक के प्रति हृदय के एकान्तिक प्रेम को निष्ठा कहते हैं।

ईश्वर का सर्वदा नाम गुणगान करना चाहिए और सत्संग हेतु ईश्वर के भक्त या साधु-इनके पास बीच-बीच में जाना चाहिए।

जो खानदानी किसान है, वह बारह वर्ष अनावृष्टि होने पर भी खेती करना नहीं छोड़ता। वैसे ही जो ठीक-ठीक भक्त है और विश्वासी है, वह भी सारा जीवन उनका दर्शन न पाने पर भी उनका नाम गुणकीर्तन करना नहीं छोड़ता।

—श्रीरामकृष्ण

देखो बेटी! जहाँ भी जाओगी उसके चारों ओर क्या हो रहा है क्या नहीं, सबकुछ देखना। और जहाँ रहोगी वहाँ की भी सारी खबरें जानना उचित है।

—श्रीश्रीमाँ सारदा देवी

"समासे श्रीबुद्धः"

सिद्धार्थवैराग्यः

स्नातकद्वितीयवर्षीयः

"क्लेशबन्धनबद्धानां प्रादुर्भूतः प्रमोचकूः।
नमोऽस्तु बोधिसत्त्वाय सम्बुद्धाय नमो नमः"इति

"मानवैः अद्यावधि षन्मात्रंरु तत् साफल्येन समुद्राजलात् अधिकम्"—इति विषयः आदौ तेन भणितः महामानवेन वोधिसत्त्वेन। कथितं तेन दुःखस्य मूलकारणम् अविद्या', तस्मात् पूर्वम् आविद्यादूरीकरणं कार्यम्।

तं प्रति प्रश्नः क्रियते चेत् "किम् अविद्यादूरीकरणं सम्भवम्—?" तेन भाषितम् उदात्तकण्ठेन स्वस्य पूर्वजन्मनः वृत्तान्तादिकम्, पुनः भाषितानि चत्वारि आर्यसत्यानि।

आम्- "दुःखमस्ति, दुःखस्य कारणमपि अस्ति
दुःखावसानं सम्भवम्, दुःखावसानमार्गः" इति।

जन्मनः परमेव मातृवियोगात् स राजनन्दनः सिद्धार्थः मातुर्भगिन्या पालितः।

कालान्तरे स एव बुद्धनाम्ना परिचितः। वहुप्रचेष्टया स अलभत महाज्ञानम्, प्राप्तवान् निर्वाणलाभमार्गम्। भित्तिस्थापनं कृतवान् एकधर्मस्य एकसङ्घस्य च। प्रचारं कृततान् धर्मस्य मूलवाण्याः "अहिंसा एव परमधर्मः" इति। व्याख्यानं कृतवान् कर्मवादस्य। कथितं तेन "कर्मकरणेन फलमवश्यमेव विराजते, सुकर्मणा सुफलं दुष्कर्मणा तद्विरुद्धं फलम्"। इति "फलभोग इह जन्मनि न भवति चेत् परस्मिन् जन्मनि अवश्यमेव भविष्यति"-इति तेन निगदितम्। निर्वाणलाभमार्गं प्रति तेन कथितः अष्टाङ्गमार्गः, स्थानं लब्धवान् सनातनधर्मे विष्णोः नवमावताररुपेण।

जीवनावसानं तु कालस्य नियमः, कस्यापि कृते तस्य न व्यतिक्रमः, राजा वा प्रजा वा सर्वेषां कृते समानः एव तथा हि कालेन सोऽपि गतवान् निर्वाणलाभं कृत्वा परलोकम्, भणितम् तथा-

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्"इति शम्।

सार्धशततमजन्मवर्षे भगिनी निवेदिता

श्रेयान् वन्द्योपाध्यायः

''असौ विदेशिनी दुहिता, सर्वं परित्यज्य मम समीपमागता, अतीव सुभद्रेयं कन्या, अत्यन्तं बुद्धिमती। अनया सहालापेनानन्दं प्राप्नोमि''—इत्युक्तिं चकार स्वामी विवेकानन्दः स्वामितुरीयानन्दं प्रति। कन्येयमद्य प्रभृति सार्धशतवर्षेभ्यः प्राक् आयारल्याण्डदेशस्थस्य कस्यचिद् धर्मयाजकस्य गृहे जनिं लेभे। तदा न कोऽपि जानाति स्म-कन्येयमेकदा सर्वेषां भारतवासिनां सकाशे आगत्य कायमनोवाक्यैर्भारतीया सती लोकमातेति नाम्ना भूषिता भविष्यति। तदानीन्तनकाले छात्रसमाजं प्रति तस्या वक्तव्यमासीत्-मातृभूमेः कल्याणमेव तेषां लक्ष्यं स्यात्। तेषां देशोऽखण्डभारतम्। ते हृदये कुर्युः भारतचिन्ताम्। मनसि च करणीयो जपः-भारतवर्षं भारतवर्षमिति यदैव संग्रामायाह्वानमागमिष्यति तदैव निद्रामग्ना न तिष्ठेयुः। एकतः कोमलस्यान्यतश्च कठोरस्य कष्टस्याधिकारिणी महीयसी नारी भगिनी निवेदिता। इदानीं तस्याः सार्धशततमजन्मवर्षेऽस्मिन् शुभक्षणे वयं तां स्मरामः प्रणमामश्च। ततश्च तन्महाजीवनमालोचयामः।

१८६७ तमे ईशवीयाब्दे अक्टोवरमासस्याष्टविंशतितमे दिवसे सा कन्या अजायत। स्यामुयेन्त्र-रिचमण्डाख्व्यस्तस्या पिता माता च मेरी इसवेलाफद। पितासीत् धर्मयाजकः। दुरदर्शी पिता अनुभवं चकार यत्-दूरस्थाह्वाने आगते कन्यायै कापि बाधा न दातव्या। मनोभावोऽयं पत्नीं प्रति तेन व्यक्तीकृतः।

आध्यात्मिकपरिमण्डले परिवर्धितत्वाद्वैशव-कालादेव मार्गारेटकन्या आध्यात्मिकचिन्तापरायणासीत्। अत्यन्तं तीव्रासीत् जीवनसम्बन्धीया जिज्ञासा। समयेऽस्मिन् आमेरिकाविजयी तरुणसन्यासी विवेकानन्द इंल्याण्डदेशमाजगाम। तन्मुखात् वेदान्तस्य मर्म-वाणीमाकण्य नितरामभिभूता साबभूव। अनिर्वचनीया-नुभूतिविशेषस्तस्याः समग्रं हृदयमधिकृत्य विराजित आसीत्। सा विवेकानन्दचरणेस्वां समर्स्य स्वदेशस्य स्वजनानां च बन्धनं छित्वा भारतमातुः सेवार्थमात्मनियोगं चकार।

१८९८-तमख्रीष्टाब्दे विवेकानन्दस्तस्यै दीक्षां ददौ। तद्दिनात् मार्गारेटनोवेल इति विदेशिनी कन्या 'भगिनी निवेदितेति अभिनवनात्मा भूषिता अभवत्। प्रतिमायां प्राणप्रतिष्ठां विधाय स उवाच-अहं चेत्त्वां सृजामि, तर्हि विनाशस्ते भविष्यति, ब्रह्ममयो माता चेत् सृजामि, तर्हि अमरा त्वं भव। गच्छ-"Indial shall ring witth Nivedita"—इति।

भारतस्य नारीजागरणं निवेदितायाः प्रथम-कर्तव्यत्वेन विवेचित मभवत्। स्त्रीशिक्षाविस्तारेण प्रयोजनमस्ति, किन्तु पाश्चात्त्यानुसारिणीं स्त्रीशिक्षां सा नेच्छति। सम्पूर्णभारतीयपरिवेशे भारतस्य-ऐतिह्यमयी चिरन्तनी शिक्षात्रैकान्तत उपयोगिनी भवेत्। कोऽभावो भारतस्य येनायं देशो भिक्षुक इव पाश्चात्त्यं प्रति दृष्टिं प्रदाय स्थास्यति? एतदर्थं सोत्तरकलिकातायां स्वकीयावासे एकं विद्यालयं स्थापयति स्म। नारीशिक्षाया इतिहासेऽस्य विद्यालयस्प भूमिका अविस्मरणीया।

निवेदिता विद्यादानव्रतमन्तरेणापि पीडितजनानां सेवाव्रतेऽपि मूर्त्तिमती सेविकासीत्। इयमतीव सेवापरायणा नारी प्लेगकलेरादिरोगाक्रान्तानां रोगिणां सेवासु आत्मनियोगं चकार। एकदा वरिशाले वन्या अभवत्। निवेदिता तत्र साहाय्यं कृतवती। उडिष्याञ्चले दुर्भिक्षागमे सा तत्राप्युपस्थितासीत्।

भारतस्य सर्वाङ्गीणोन्नतिर्भगिनीनिवेदितायाः अभिप्रेतासीत्। शिक्षायां, साहित्ये, विज्ञाने, चित्रशिल्पे सर्वत्र तस्या विद्यावत्तायाश्चरित्रवलस्य व्यक्तित्वस्य च प्रभावो लक्ष्यते। तस्याः प्रेरणां सहयोगितां च प्राप्य भारतीयो विज्ञानी जगदीशचन्द्रः फ्रान्सदेशस्य विश्वविज्ञानसभायां सम्मान-पूर्णं पदं प्राप। आध्यात्मिकता हि भारतीयकलाविद्याया मूलमिति विश्वासेनैव निवेदिता मनीन्द्रनाथ-नन्दलालसुप्रमुखं शिल्पिवृन्दमुत्साहितं चकार। भारतीयराजनीतौ अपि तस्याः अवदानमपरिसीमम्। भारतीयस्वाधीनतासंग्रामस्य योद्धृभिः सह तस्या गभीरयोगोऽतिष्ठत्। भारतस्य स्वाधीनतालाभस्तस्या मूलं लक्ष्यमासीत्। तस्याः अयं विश्वास आसीत् यत्, भारतस्य स्वाधीनतैव तस्या मुक्तिसाधिका।

निवेदिता वस्तुतो मुर्त्तिमती तपस्विनी आसीत्। सात्मानं रामकृष्णविवेकानन्दयोः निवेदितेति मन्यते स्म। ततः स्वनामस्वाक्षरकाले सा अलिखत्—Nivedita of Ramakrishna Vivekananda—इति। सा विवेकानन्दस्य मानसकन्यासीत्। सा रामकृष्णस्य जीवनकथाया मध्ये भगवतः शिष्यैः जीवनस्य सादृश्यमनुबभूव। सा श्रीरामकृष्णमेकान्तमाश्रयस्थलं मन्यते स्म। एवमेव निवेदिता रामकृष्ण-विवेकानन्दगतप्राणा आसीत्।

तस्या साहित्यकर्माल्पमपि गुरुत्वपूर्णम्। तस्याः क्रान्तदार्शिमनस्विताया समुज्ज्वलं स्वाक्षरं वर्तते केषुचित् पुस्तकेषु। यथा—"The master as I saw him", "The cradle tale of Hinduiem, "Kali the mother"—इत्यदीनि पुस्तकानि।

परिशेषे रवीन्द्रनाथेन लोकमातेति विशेषणेन भूषिता निवेदिता १९२२-तमख्रीष्टाब्दस्य मतान्तरे १९१२-नमख्रीष्टाब्दस्य अक्टोवरमासस्प त्रयोदश-दिवसे दार्जिलिङ्नगरे आचार्यजगदीशचन्द्रस्य वासभवने यत्र आगता आसीत्, तत्र रामकृष्णविवेकानन्दलोकं प्रत्याजगाम। मृत्युशय्यायां तस्या आश्वासवाणी—"The boat is sinking, but I shall be the sunrice." इति।

सार्धशततमे वर्षेऽस्मिन् अस्या महीयस्या सार्धशततमजन्मवार्षिकंउत्सव उद्‌यापितो भवति। सङ्घेषु शिक्षालयेषु विद्वत्समाजेषु सर्वत्र पूजामङ्गलारात्रिकचण्डीपाठसमवेतहोमादीनां माध्यमेन सार्धशततमजन्मवर्षं श्रद्धया पालितम्। निवेदिताविषये अङ्कनं सङ्गीतं भाषणं प्रबन्धा-दिलिखनमावृत्तिपठनमित्यादिभिः स्मरणं श्रद्धा-स्थापनं च क्रियते।

भारते नवजागरणस्य प्रतिक्षेत्रं यथा स्वामिविवेकानन्दस्य तथा निवेदिताया भूमिका अनस्वीकार्य्या। भारतस्य कृते एकान्ततो निवेदितप्राणेयं विदेशिनी भारतस्य समुन्नतौ तस्या अन्तिमशोणितविन्दुमपि ददौ। अद्य तस्याः पुण्यजन्मनः सार्धशततमवर्षं चलति। अस्मिन् क्षणे तां प्रति श्रद्धानिवेदनमस्माभिः कर्तव्यम्। तया देशसोवायास्तथा नरनारायणपूजाया यः पन्था दर्शितस्तेन पथा अग्रे सरणमस्माकं कर्तव्यम्।

एतत्संकल्पसाधनं सार्धशततमजन्मवर्षस्य तात्पर्य्यम्।

श्रीश्रीमातासारदा सादरमाह—''नरेनो मे सागरपारात् श्वेतपङ्कजमानीतं ठाकुरस्य सेवायै'' इति। श्वेतपङ्कजमेव निवेदितास्वरूपम्। भारतस्य मङ्गलाय हृदयमाधुर्य्यं प्रदाय भारतमेव ऋणग्रस्तं विधाय श्रीरामकृष्णविवेकानन्दचरणे आश्रिता सा भगिनी निवेदिता। अद्य तस्याश्चरण-युगले श्रद्धां ज्ञापयामः, प्रणामं वितरामः, तस्या आदर्शेन जीवनं धन्यं करिष्याम इति शम्।

तथ्यसूत्रम्—

1) निवोधतपत्रिका

2) भारतेर निवेदिता

प्रका : स्वामिसुपर्णानन्द, सम्पा-रामकृष्णमिशन इनस्टिटिउट अव कालचार।

जैसे ही मन में कोई वासना उठे और उसे जानने की इच्छा हो तब अकेले में रो रो कर उनसे प्रार्थना करना। वे मन का सारा मैल और कष्ट दूर कर देंगे और तुम्हें समझा देंगे।

जप-तप के द्वारा कर्मपाश कट जाता है। लेकिन भगवान को प्रेमभक्ति के बिना नहीं पाया जा सकता। जप-तप क्या है जानते हो? उसके द्वारा इन्द्रिय का प्रभाव कट जाता है।

कोई सदैव सुखी नहीं रह सकता, और किसी का पूरा जीवन दुःख में नहीं बीतेगा। जैसा कर्म वैसा फल, वैसा ही संयोग आ जुटता है।

—श्रीश्रीमाँ सारदा देवी

सत्य के लिए सब कुछ का त्याग किया जा सकता है लेकिन किसी भी चीज के लिए सत्य का त्याग नहीं किया जा सकता। सत्य का अनुसंधान अर्थात् शक्ति का प्रकाश -यह दुर्बल या अंधे के समान टटोलने जैसा नहीं है।

—स्वामी विवेकानन्द

भारतीयनाट्योत्पत्तिविषयकपर्यालोचनम्

अर्घ्य-गुप्तः

स्नातकोत्तरद्वितीयवर्षः

भारतीयाः मन्यन्ते वेदः अपौरुषेयः।
तथाहि प्रसिद्धवेदभाष्यकारैः श्रीसायणाचार्यैः
स्वकीये 'वेदार्थप्रकाशः'-नामके वेदभाष्येऽगादि
"यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्॥"१
परन्तु वेदे तु सर्वैषां वर्णानां अधिकारः नास्ति। तथोक्तं श्रीमद्भागवतमहापुराणे—
"स्त्रीशूद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा।"२
तथाहि 'सार्ववणिकिः' वेदरुपेण
सर्वलोकपितामहः ब्रह्मा नाट्यवेदं रचयामास। तथोक्तं
नाट्यशास्त्रे—
"वेदोपवेदैः सम्बद्धो नाट्यवेदो महात्मना।
एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा ललितात्मकम्॥"३
भरतमुनिविरचिते नाट्यशास्त्रे नाट्यवेदः पञ्चमवेदरूपेण स्वीकृतः। परन्तु कदा संस्कृतनाटकस्य समुत्पत्तिर्भवति इत्याहापि वयं निश्चितरुपेण न वक्तुं शक्नुमः।

आदिकविना वाल्मीकिना स्वकीये आदिकाव्ये रामायणे 'नटः', 'नर्त्तकः' 'नाटकः' चेत्यादयः शब्दाः उल्लिखिताः। महाभारतेऽपि व्यासेन कथ्यते—

"पश्यन्तो नटनर्त्तकान्" (2.२१८.१०)। दाक्षीपुत्रः पाणिनिरपि अष्टाध्यायां शिलालेः तथा कृशाश्वस्य नटसूत्रस्य उल्लेखः कृतः।४ पाणिनिमुनेः आविर्भावकालः साधारणतया सप्तमख्रीष्टपूर्वाव्दः इति स्वीक्रियते। अतः नाट्यवेदस्य तथा संस्कृतनाटकस्य उद्भवः बहुपूर्वकाले सञ्जातः इति ज्ञायते। महाभाष्ये 'वलिवन्धः' तथा 'कंसवधः' इति नाटकद्वयस्य नाम प्राप्यते।

नाट्यशास्त्रविषयकेषु ग्रन्थेषु भरतमुनिविरचितं 'नाट्यशास्त्रं' प्राचीनतमं इति सर्वैरेव स्वीक्रियते। नाटकं न स्यात् परन्तु नाट्यशास्त्रं स्यात्-एतत्तु न कदाचिदपि भवितुमर्हति। अतः नाट्यशास्त्रस्य उत्पत्तेः प्रागेव नाटकस्य रचना अभवत् इति अनुमीयते। नाटकस्य उद्भवविषये नाट्यशास्त्रे उत्सते-भगवान् ब्रह्मा ऋग्वेदात् पाठ्यं सामवेदात् गीतं यजुर्वेदादभिनयः अथर्ववेदात् रसः संगृह्य नाट्यवेदं रचयामास। "जग्राह पाठ्यमृग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च। यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि।"५

भगवतः नटराजस्य ताण्डवं तथा भगवत्याः जगदम्विकायाः गौर्य्याः लास्यं चेति नृत्यौ नाट्ये संयोजितवन्तौ। सर्वभूतान्तरात्मा कमलापतिः विष्णुः नाट्यरीतिं प्रणीतवान्। देवलोकस्य शिल्पीः विश्वकर्मा अमरावत्यां सुरम्यं नाट्यमञ्चं निर्मितवान्। ब्रह्मविरचितं 'लक्ष्मीस्वयंवरः' इति नाटकं भरतशिष्याः

अभिनीतवन्तः। 'अमृतमन्थनं' तथा 'त्रिपुरदाहः' इति नाटकद्वयस्य नामोल्लेखमपि नाट्यशास्त्रे दृश्यते। पूर्वे उल्लिखितं यत् ऋग्वेदतः पाठ्यं संगृह्य ब्रह्मणा नाट्यवेदं विरचितम्। गवेषकाणां नये भरतमुनिना उल्लिखितं पाठ्यं नाम संवादसूक्तम्। ऋग्वेदे न्युनतः पश्चदशसंख्यकाणि संवादसूक्तानि परिलक्ष्यन्ते। ते यथा—

१) पणि-सरमासंवाद-सूक्तम् (१०.१०८)

२) अगस्त्य-लोपामुद्रासंवादसूक्तम् (१।१७९),

३) विश्वामित्र-नदीसंवादसुक्तम् (६।३३),

४)इन्द्र-मरूतसंवादसूक्तम् (१।१६५),

५) नेमभार्गवेण सट्ट इन्द्रस्य कथोपकथनं (८/१००)

६) वशिष्ठेण सह तस्य पुत्राणां कथोपकथनं (७।३३)

७) इन्द्रेण सह वृषाकपेः कथोपकथनं (१०।८६)

चेत्यादयः। अतः ख्रीष्टजन्मस्य बहु पूर्वकाले विरचितेषु एतेषु संवादसूक्तेषु संस्कृतनाटकस्य सूचना अभवत् इति अस्माभिः दृश्यते।

केषाञ्चन गवेषकाणां नये छायारूपकं (Shadow Play) संस्कृतनाटकस्य उत्सभूतम्। भवभूतेः उत्तररामचरितनामके नाटके छायासीतायाः अभिनयः एतेषां नये सुप्राचीनस्य छायारूपकस्य परिनिष्ठितरूपम्।

परन्तु पाश्चात्यदेशीयानां गवेषकाणां मतं खलु भिन्नमेव। पिशेलमहाभागः कथयति यत् पुत्रलिकानृत्यतः संस्कृतनाटकस्य उत्पत्तिर्भवति। वङ्गभाषया यत्—'পুতুল নাচ' इति कथ्यते। तन्नये 'सूत्रधारः' 'स्थापकः' चेत्यादयः शब्दाः पुत्रलिकानृत्यतः संङ्कृतनाटकस्य उद्सवभवति इति मतमेव प्रतिपादयति। अपि च ग्रीस्-देशीयनाटकेन सह संस्कृतनाट्यस्य बहूनि सादृश्यानि दृक्पथमायान्ति। संस्कृतनाटकस्य अङ्कविभागः, प्रस्तावना, भरतवाक्यं, नाटकीयपात्रस्य नाट्यमञ्चे प्रवेशस्य तथा प्रस्थानस्य रोतिः, यवनिकेति नामकरणम् इत्येतेषु विषयेषु सह ग्रीकनाट्यस्य सादृश्यं विशेषतया परिलक्ष्यते। परन्तु ग्रीकनाट्यसाहित्यमेव संस्कृतनाटकस्य उत्सभूतं इति मतं न समीचीनम्। ग्रीकनाट्येन सह संस्कृतनाटकस्य सादृश्यापेक्षया वैसादृश्यम् अधिकतया दृश्यते। ग्रीकनाटकस्य देश-काल-क्रियाजातं त्रिविधम् ऐक्यं संस्कृतनाट्ये नास्ति। अपि च 'यवनिका' इति शब्दस्य प्रयोगः अर्वाचीनसंस्कृतनाटके दृश्यते। प्राचीनेषु रूपकेषु शब्दस्यास्य प्रयोगः न विद्यते। 'यवनिका' इत्यनेन पारस्यदेशजातं कारूकार्यमयं वस्त्रमेव वोध्यते—न तु ग्रीकदेशजातं वस्त्रम्। संस्कृतनाटकं खलु भारतीयसाहित्यकाननस्य सुमिष्टः फलविशेषः। पाश्चात्त्यदेशीयैःनाटकैः सह विशेषतः ग्रीकनाटकैःसह कथश्चित्क्षेत्रे सादृश्यमस्ति तथापि तत् न पाश्चात्यमनीषीणां दानम्। एकया सभ्यतया सह अपरसभ्यतायाः मिलनं साहित्यजगति चिरन्तनव्यापारम्। अवशेषेण वक्तुं शक्यते भारतीयसंस्कृतेः वैशिष्ट्यं यत् विविधसंस्कृतिम् आत्मस्थं कृत्वापि स्वीयवैशिष्ट्येण समुज्वलम्। तथोक्तं विश्वकवि रवीन्द्रनाथेन—

"পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।"

तथ्यसूत्राणि—

१) वेदभाष्यभूमिकासंग्रह : पृष्ठाङ्कः-१
२) श्रीमद्भागवतम्, १।४।२५
३) नाट्यशास्त्रम् प्रथमोध्यायः, १८, पृष्ठाङ्कः २
४) ''पारशर्य्यशिलालिभ्यां शिक्षुनटसूत्रयो:'' (४।६।११०)
''कर्मन्दकृशाश्वाद् इनिः'' (४।३।१११)
५) नाट्यशास्त्रम्, प्रथमोऽध्यायः, १७, पृष्ठाङ्कः २
६) भारततीर्थ, रवीन्द्र रचनावली, तृतीय खण्ड, पृष्ठा-७३

ग्रन्थपञ्जी—

ग्रन्थनाम	सम्पादकः	प्रकाशकः
नाट्यशास्त्रम्	पण्डित बटुकनाथ शर्मा तथा पण्डित बलदेव उपाध्याय	चौखम्भा संस्कृत संस्थान
वेदभाष्यभूमिकासंग्रहः	बलदेव उपाध्याय	चौरास्था संस्कृत संस्थान
Abhinavagupta an Philosopical study	Professor Dr. Kanti Chandra Pandey	Chaukhamba Sanskrit Stadies Vol.1

कोई विषय सत्य है या असत्य - यह जानने के लिए उसकी एकमात्र परीक्षा यही है, वह तुम्हें शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से दुर्बल कर रहा है या नहीं, यदि कर रहा है तो उसका विषवत् त्याग करदो, उसमें प्राण नहीं, वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता। सत्य बलप्रद है, सत्य ही पवित्रता प्रदान करने वाला है, सत्य ही ज्ञानस्वरूप है।

—स्वामी विवेकानन्द

अवस्थात्रयविचार:

बाप्पा राजवंशी

(स्नातकोत्तरद्वितीयवर्षः)

मध्यकालिकस्य भारतस्य धार्मिके दार्शनिके चेतिहासे विद्यारण्यस्य नाम महतादरेण गृह्यते। शंकराचार्यैः स्थापितेषु सर्वमठेषु शृङ्गेरीमठ: श्रेष्ठो गण्यते। तस्मिन्नेव सर्वोच्चपीठे शृङ्गेरीमठे शंकराचार्यत्वेनायमभिषिक्त आसीत्। शांकरवेदान्तनिरूप्याणि समग्राणि तत्त्वानि पूर्णत: सुबोध्यानि सुस्पष्टानि च स्युरिति मतिं विधायेयं पञ्चदशी विद्यारण्येन निर्मिता। अस्मिन्प्रबन्धे पञ्च पञ्च प्रकरण्यान्याश्रित्य त्रयो विभागा विनिर्धारिता: -

१। प्रथमस्य प्रकरणपञ्चकस्य विवेकप्रकरणम्।

२। द्वितीयपञ्चकस्याख्या दीपप्रकरणमथ च।

३। तृतीयपञ्चकस्य संज्ञा आनन्दप्रकरणमित्यवधेयम्।

प्रथमप्रकरणे नाम तत्त्वविवेकप्रकरणे अवस्थात्रयविचार: वर्तते।ननु काः नाम अवस्थाः ? इति चेत् उच्यते- जाग्रत् स्वप्नः सुषुप्तिरिति अवस्थात्रयं विद्यते। यदा स्थूलशरीराभिमानी जीवः तदा जाग्रत् इत्युच्यते। यदा सूक्ष्मशरीराभिमानी जीवः तदा स्वप्नः इत्युच्यते। यदा कारणशरीराभिमानी जीवः तदा सुषुप्तिरित्युच्यते। तत्र आदौ जागरे ज्ञानस्य अभेदप्रतिपादने श्लोकस्तावत्-

"शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्याज्जागरे पृथक्।
ततो विभक्ता तत्संविदैकरूप्यान्न भिद्यते "[1] ॥ इति।

श्लोकेऽस्मिन् जागरे ज्ञानस्य अभेदं साधयति। तत्र अस्माभिर्ज्ञेयं किं नाम जागरितमिति चेत् उच्यते- " इन्द्रियैरर्थोपलब्धिर्जागरितम् " इत्युक्तलक्षणे ज्ञानम् एकम् एव,तच्च अखण्डरूपम्। तत्र विषयभेदात् ज्ञानस्य भेदो भवति। अर्थात् भिन्नभिन्नोपाधितया ज्ञानमपि भिन्नं भिन्नं भवति। यथा- घटं पश्यामि चेत् घटविषयकं ज्ञानं भवति , तथैव पटं पश्यामि चेत् पटविषयकं ज्ञानं भवति। अत्र घटविषयः पटविषयः इत्यनेन विषयभेदात् ज्ञानस्यापि भेदो भवति। घटं पश्यामि इत्यत्र घटः उपाधि , तथैव

[1] (पञ्चदशी - १।३)
[2] (कठोपनेषद् - २।१।४)

पटम् इत्यत्रापि पटः उपाधि । अत्र घटपटादि उपाधिभेदात् ज्ञानस्य भेदो भवति । जागरे वेद्याः संविद्विषयभूताः अर्थात् ज्ञानविद्विषयभूताः शब्दस्पर्शादयः आकाशादिगुणत्वेन प्रसिधाः । तदाधारत्वेन प्रसिद्धाः आकाशादयश्च वैचित्र्यात्परस्परं भिद्यन्ते । किन्तु ज्ञानम् एकमेव । तथाहि उच्यते –

"स्वप्नान्तं जगरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति ।
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति "[2] ॥ इति ।

यथा जागरे ज्ञानस्य अभेदः साधितः तथैव स्वप्ने अपि ज्ञानस्य अभेदं साधयति । अतः आदौ श्लोकस्तावत्-

"तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरम् ।
तद्भेदोऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिद्यते "[3] ॥ इति ।

जागरे यथा वैचित्र्यात् विषयाणां भेदो न तु ज्ञानस्य भेदः तथैव "करणेषूपसंहृतेषु जागरितसंस्कारजः प्रत्ययः सविषयः स्वप्नः" इत्युक्तलक्षणायां स्वप्नावस्थायामपि विषयाः एव भिन्नाः, न संविदिति अर्थात् न ज्ञानम् । अत्र वेद्यम् अर्थात् परिदृश्यमानं वस्तुजातं न स्थिरं न स्थायि, प्रतीतिमात्रशरीरत्वात् । जागरे तु परिदृश्यमानं वस्तुजातं स्थिरं स्थायि च, कालान्तरे अपि द्रष्टुं योग्यत्वात् । तन्निगदितमुपनिषदि-

"स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोन-
विंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः " [4] इति ।

एवम् अवस्थाद्वये ज्ञानस्य अभेदः प्रतिपादितः । अधुना सुषुप्तिकाले ज्ञानस्य अभेदप्रतिपादने श्लोकस्तावत्-

"सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोबोधो भवेत्स्मृतिः ।

सा चावबुद्धविषयाऽवबुद्धं तत्तदा तमः " [5]॥ इति ।

श्लोकेऽस्मिन् सुषुप्तिकाले ज्ञानस्य अभेदं साधयति । जाग्रदवस्थायां यथा मुख्यम् इन्द्रियं तथा स्वप्नावस्थायां मुख्यं मनः तथैव सुषुप्तिकाले मुख्यम् अज्ञानम् । अत्रापि

[2] (कठोपनेषद् - २।१।४)
[3] (पञ्चदशी - १।४)
[4] (माण्डूक्योपनिषद् - ४)
[5] (पञ्चदशी - १।५)

उपाधितया ज्ञानं भिन्नं , किन्तु स्वभावतया ज्ञानं भिन्नं नास्ति। वस्तुतः सुषुप्तौ अस्माभिः अनुभूयमानस्य सविशेषं ज्ञानं न भवति। सुप्तोत्थितः एव स्मरति "सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषम्" इति। अतः सुषुप्तिज्ञानं स्मृतिरित्युच्यते। अधुना प्रश्नो भवति सुषुप्तौ अनुभवो भवति न वा। तदा उच्यते- अनुभवो भवति। कथं इति चेत् "या या स्मृतिः सा सा अनुभवपूर्विका" खलु। तद्भणितमुपनिषदि –

"यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते
न कश्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम्।
सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो
ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः "[6] ॥ इति।

एवं प्रकारेण पञ्चदश्यां तत्त्वविवेकनामके प्रथमप्रकरणे जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति नामके अवस्थात्रये विद्यारण्यमुनिना ज्ञानस्य अभेदं प्रतिपादयित्वा सरलैः सुगूढैः प्रचुरार्थभरितैः पद्यैरत्राद्वैतवेदान्तवादस्य सर्वे पक्षाः सुनिरूपिता विवेचिता विवृताश्च। अवस्थात्रये यत् ज्ञानं तत् उपाधिभेदात् भिन्नं, परन्तु ज्ञानम् एकमेव तच्च अखण्डरूपमिति साधितम्। तथा चोक्तं वाचस्पतिना भामत्याम् - "एषु व्यवर्तमानेषु यदनुवर्तते तत्तेभ्यो भिन्नं, यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम् "इति शिवम्।

<u>सहायकग्रन्थाः</u>

१। पञ्चदशी	स्वामी वाणेशानन्दः
२। ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषदः	श्रीवासुदेवशर्मा
३। कठोपनिषद्	स्वामी भूतेशानन्दः
४। उपनिषद्ग्रन्थावली	स्वामी गम्भीरानन्दः
५। Mandukya Upanisad	Swami Chinmayananda

[6] (माण्डूक्योपनिषद् - ५)

"संस्कृतम्" - यत्र मातृभाषा

भास्करच्याटार्ज्जिनः

रामकृष्णमिशन्-विद्यामन्दिरस्य
संस्कृतस्नातकोत्तरद्वितीयवर्षीयस्य

सर्वासां भाषाणां मातृरूपा संस्कृतभाषा देवभाषा वेति कथ्यते । इयं भाषा यथा वैज्ञानिकी तथा संगणकयन्त्रोपयोगिनी च । एतादृशगुणविशिष्टा सत्यपि इयं भाषा यतः समाजे व्यवहारिकभाषारूपेण न गण्यते तदर्थं भाषेयं मृतभाषा इति निन्दकमतिः । परन्तु एतैः संस्कृतभाषां प्राणहीनरूपेण स्वीकुर्वद्भिः निन्दकैः न ज्ञायते यत् - भारतवर्षेऽस्मिन् सन्ति केचन जनपदाः,यत्र बालवृद्धादयः सर्वे संस्कृतभाषया एव आदरेण वार्तालापादिकं सर्वं कार्यं कुर्वन्ति । इदानीं संस्कृतभाषा येषु येषु जनपदेषु समादृता भवति तेषां जनपदानां विवरणं समासेन प्रस्तूयते –

१: कर्णाटकराज्यस्य मत्तुरनामधेयग्रामः

कर्णाटकराज्यस्य शिमोगामण्डलान्तर्गते मत्तुरनामधेये ग्रामे विराजमानाः प्रायः चतुःसहस्रसंख्याकाः मानवाः संस्कृतभाषामेव व्यवहारिकभाषारूपेण स्वीकुर्वन्ति । दयादाक्षिण्यादिमानवगुणानां उत्कर्षसम्पादिकां संस्कृतभाषामेव मातृभाषारूपेण स्वीकृत्य तत्रस्थजनाः समाजे उन्नताः सञ्जाताः । अनया भाषया ते न केवलं सम्भाषणादिकार्यं सम्पादयन्ति ; अपि च कर्मक्षेत्रे, आपणे, दूरवाणीव्यवहारकाले संस्कृतं व्यवहरन्ति । मर्यादालाभार्थं वृत्तिलाभार्थं वा भाषेयं न तैः शिक्षिता, अपि च मातृरक्षार्थं सन्तानाः यथा तत्पराः भवन्ति तेषां सविधे संस्कृतभाषारक्षणमप्यनुरूपकार्यम् ।

प्राथमिकशिक्षाप्रदानसमयात् आरभ्य उच्चस्तरीयसमयपर्यन्तं तत्र संस्कृतभाषा एव आश्रीयते । तत्रस्थः सारदाविलास-उच्चविद्यालयः शिक्षाप्रतिष्ठानेषु अन्यतमः यत्र संस्कृतभाषया सर्वं कार्यं प्रचलति । एतदपि उल्लेख्यं यत् जातिधर्मनिर्विशेषं यथा हिन्दवः इमां भाषाम् अधीयते तथा महम्मदीयादयः अन्ये सम्प्रदायाः अपि । किञ्च संस्कृतमाश्रिते ग्रामे अस्मिन् संस्कृतप्रेमिनां वैदेशिकानां गमनागमनं विस्मयकरम् । प्रायः त्रिंशतं वत्सरान् यावत् संस्कृतभाषां प्रति तेषां श्रद्धार्घः यथा प्रशंसनीयः तथा मनोहारी च ।

मत्तुर ग्रामस्य प्रभावात् तत्पर्श्ववर्तिनि **होसाहल्ली**नामके ग्रामे अपि संस्कृतभाषा मातृभाषारुपेण समादृता दृश्यते । वेदाद्यध्ययनं वैदिकमन्त्रानुसारं यागादिकार्यञ्च सम्पादयतां ग्रामवासिनां वेदमयं जीवनयापनं नूनं शाघनीयम् ।

मध्यप्रदेशान्तर्गत: झिरिनामक: जनपद: -

कर्णाटकीयमत्तुरनामधेयग्रामं व्यतिरिच्य मध्यप्रदेशीय-झिरिनमके ग्रामे अपि संस्कृतचर्चा प्रशंसार्हा । राजगरमन्डलान्तर्गते ग्रामेऽस्मिन् प्राय: सहस्रसंख्याका: जना: निवसन्ति। तेषु शिशु-युवक-वृद्धादय: सर्वे ग्रामवासिन: मातृभाषारुपेण सुमधुरसंस्कृतभाषामेव अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र संस्कृतभाषाया: प्रचारे प्रसारे च "संस्कृत-भारती" इति संगठनस्य अवदानम् अनस्वीकार्यम् । २००२ ईशवीयाव्दे संस्कृतभारत्या: एकया सहकर्मिण्या विमला-तिवारी इति नामधेयया रमण्या संस्कृतभाषाप्रचारार्थं य: सुमहान् उद्योग: आश्रित: ,तेनैव तत्रस्थमानवमन:सु देवभाषां प्रति श्रद्धा जागरिता।तेन तदारभ्य अद्यपर्यन्तं कथितभाषारुपेण तस्मिन् संस्कृतभाषा एव प्रचलति। सम्भाषणज्ञापने "नमो नम:" तथा शुभकामनावसरे "शुभमस्तु" इति च पदप्रयोग: संस्कृतपाठकानां चेतांसि ह्लादयति । किंच तत्रत्या: कर्षका: कर्षणसमये दुग्धदोहनकाले च गोभि: सह संस्कृतभाषया एव व्यवहरन्ति। एतदपि उल्लेख्यं यत् प्रात:कालमारभ्य रात्रिपर्यन्तं वेदादिशास्त्राणां पठनपाठनं, स्तोत्राणाम् आवृत्तिकरणं चेत्यादीनि कार्याणि ग्रामस्य पवित्रतां वर्धयन्ति एव ।

एवं मध्यप्रदेशान्तर्गते **मोहाद**ग्रामे तथा **भागुयार**नामधेये ग्रामे अपि संस्कृतभाषामाधारीकृत्य तत्रस्थै: मानवै: सर्वाणि कार्याणि सम्पादितानि दृश्यन्ते। तत्र नस्ति कोऽपि सम्प्रदायभेद: न वा वैषम्यनीति: । जनमन:सु यथा संस्कृतभाषा अधिकतया जागरिता स्यात् तदर्थं सर्वकारीयप्रचेष्टा नूनं तत्र प्रशंसार्हा ।

उल्लिखितेषु एतेषु ग्रामेषु प्राचीनसंस्कृतभाषामाश्रिता: जना: वर्तमानकालोपयोगिन: न ; इति ये खलु मन्यन्ते ते तु विकृतमनस: इति मे मति: । यतो हि आधुनिकप्रयुक्त्या सह तेषां साहचर्यं प्रशंसार्हम् । Smart Phone, Computer, Laptop इत्यादीनि आधुनिकयन्त्राणि तेषामपि नित्यप्रयोजनसाधकानि भवन्ति । तत्रापि अध्यापका:, चिकित्सका:, वैज्ञानिका:, यन्त्रिणश्च गृहे गृहे प्राप्यन्ते । किञ्च संस्कृतं तेषां ज्ञानविवर्धकं कार्यसहायकञ्च भवति ।

यदि एते कतिपया: ग्रामा: संस्कृतभाषाम् आश्रित्य अग्रेसर्तुं शक्नुवन्ति तर्हि समग्रभारतवर्षे संस्कृतभाषा कथं न प्रसरति? यदि संस्कृतभाषा भारतवर्षस्य मातृभाषारुपेण स्वीकृता स्यात् तदैव भारतवर्षस्य सर्वाणि गृहाणि संस्कृतगृहाणि तथा सर्वे मानवा: देवमानवा: भवेयु: । ऋषिप्रणीतानां भारतीयैतिह्यसंरक्षकाणां रामायणमहाभारतादिग्रन्थानां या भाषा सा तु संस्कृतभाषा एव।तां भरतीयसंस्कृतिरक्षकां मातृसमां भाषां संरक्षितुम् अस्माभि: महती प्रचेष्टा करणीया इति शम् ।

रूपकालंकारस्वरूपविमर्शः

सन्दीपजाना
विद्यावारिधि-शोधच्छात्रः,
रामकृष्णमिशन्विद्यामन्दिरम्, बेलुडमठः

प्राचीनतमालंकारेषु रूपकं तावदानन्यमयते। आचार्यभरतस्य नाट्यशास्त्रे उक्तेषु अलंकारेषु चतुर्षु रूपकम् अन्यतम्। रूपकशब्दस्य व्युत्पत्तिगतार्थो हि – रूपणं रूपं, तत इतच्प्रत्ययेन रूपितः, रूपणवान् इति। विषयिणा विषयस्य रूपवतः करणात् रूपकम् इति। उपमानस्य रूपेण उपमेयः रूपितः भवति, तस्मात् रूपकस्य एतादृशं नामकरणम्। अर्थात् रूपयति एकतां नयतीति रूपकम्। रूपकालंकारः अयं सर्वैः आलंकारिकैः स्वीकृतः अपि तत्स्वरूपनिर्णये पण्डावतां मतानैक्यं परिलक्ष्यते। आचार्यभरतेन तदीये नाट्यशास्त्रे द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां रूपकालंकारस्य स्वरूपं निर्दिष्टम्। भरतमुनिनये रूपकं स्वविकल्पेन स्वकल्पनया वा रूपितं भवेत्। किञ्च, रूपकं तुल्यावयवलक्षणयुक्तं तथा किञ्चित्सादृश्यसम्पन्नलक्षणयुक्तं चेति भेदेन द्विविधं स्यात्। तस्य द्वितीयलक्षणानुसारम् अनेकेषु द्रव्येषु आनुषङ्गिकादिगुणाश्रितौपम्येन निश्चिततया रूपवर्णनमेव रूपकम्। भरतमुनेः द्वौ श्लोकौ तावत् -

"स्वविकल्पैर्विरचितं तुल्यावयवलक्षणम्।
किञ्चित् सादृश्यसम्पन्नं यद्रूपं रूपकं तु तत्।।

नानाद्रव्यानुषंगाद्यैर्यदौपम्यगुणाश्रयम्।
रूपं निवर्णनायुक्तं तद्रूपकमिति स्मृतम् ।।"[i] इति।

आचार्यभरतस्य एताभ्यां लक्षणाभ्यां वक्तुं शक्यते यत् तेन उपमारूपकयोर्मध्ये पार्थक्यं सूचितम्। तन्मते उपमाया आधारो हि सादृश्यं तथा रूपकस्याधारो हि औपम्यम् अर्थात् किञ्चित्सादृश्येन सम्पन्नम्। उपमाया आधारो हि गुणाकृतेः सादृश्यं रूपकस्य आधारो गुणः, यः नैकानां द्रव्याणाम् आनुषङ्गिकेन आधारेण सम्पन्नः।

परवर्तिसमये आलंकारिकेन भामहेन तदीयस्य काव्यालंकारस्य द्वितीये परिच्छेदे रूपकालंकारस्य लक्षणप्रसङ्गे निरूपितम् -

" उपमानेन यत्तत्त्वमुपमेयस्य रूप्यते।
गुणानां समतां दृष्ट्वा रूपकं नाम तद्विदुः ।।"[ii] इति।

अर्थात् भामहमते गुणसाम्यवशात् उपमानेन सह उपमेयस्य अभेदकल्पना रूपकम्। तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यते चेत् एतत् परिलक्षितं भवति यत् भरतभामहाभ्यां प्रदर्शितयोः रूपकालंकारस्य लक्षणयोः किमपि पार्थक्यं नास्ति। उभौ आलंकारिकौ गुणसाम्यं प्रति रूपं प्रति च गुरुत्वम् आरोपितवन्तौ। परम् एतद् वक्तुं शक्यते यत् भरतस्य लक्षणं विस्तृतं वर्णनात्मकं च, भामहस्य विवेचनं तावत् संक्षिप्तं व्याख्यापेक्षि च। काव्यादर्शकारेण आचार्यदण्डिना तदीयस्य काव्यादर्शग्रन्थस्य द्वितीयपरिच्छेदे रूपकचक्रं रचितम्। तेन रूपकलक्षणमेवं निगदितम् –

"उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते।।" [iii]इति।

अर्थात् यस्याम् उपमायाम् उपमानोपमेययोः भेदः तिरोहितो भवति सा उपमैव रूपकम्। अर्थाद् अतिसादृश्यवशात् उपमानोपमेययोः भेदो यदि तिरोहितो भवति, तदा तादृशं साधर्म्यमेव रूपकनाम्ना अभिहितं भवति। तस्य लक्षणमिदम् अत्यन्त्यं संक्षिप्तं वैज्ञानिकञ्च। यथा कान्तं चन्द्रमिव मुखम् इत्यत्र उपमा तथा चन्द्रमुखम् इत्यत्र रूपकं विद्यते। गुणाधिक्यात् चन्द्रमुखयोर्मध्ये यः अभेदः तदेव रूपकम्।

आचार्येण उद्भटेन स्वकीये काव्यालंकारसारसंग्रहे रूपकालंकारस्य लक्षणप्रसङ्गे भणितम् -

" श्रुत्यासम्बन्धविरहात् यत्पदेन पदान्तरम्।
गुणवृत्तिप्रधानेन युज्यते रूपकं तु तत्।। "[iv] इति।

अर्थात् यत् अभिधार्थेन असम्बद्धं तथा गुणवृत्त्यर्थेन लक्षणार्थेन वा युक्तं भवति तद्धि रूपकम्। वास्तविकदृष्ट्या उद्भटस्य लक्षणमिदं पूर्वलक्षणापेक्षया अधिकविकसितं वैज्ञानिकञ्च। परवर्तिनि काले आलंकारिकशिरोमणेः आचार्यमम्मटस्य लक्षणे अस्य प्रभावः परिलक्षितः भवति। यद्यपि आचार्येण भरतेन तस्य लक्षणे 'गुणाश्रय' इति पदस्य तथा भामहेन 'गुणानां समताम्' इति पदस्य च प्रयोगः विहितः, परं तथापि आचार्येण उद्भटेन स्वकीयलक्षणे 'गुणवृत्तिप्रधानप्रयोग' इतस्य प्रयोगः कृतः। अनेन तस्य लक्षणस्य सूक्ष्मता द्योतिता।

परवर्तिनि समये आचार्येण रुद्रटेन स्वकीये काव्यालंकारे रूपकालंकारस्य लक्षणं दत्तं -

" यत्र गुणानां साम्ये सत्युपमानोपमेययोरभिदा।
अविवक्षितसामान्या कल्प्यते इति रूपकं प्रथमम्।।"[v] इति।

रुद्रटस्य मतानुसारं गुणसाम्यात् एव उपमानोपमेययोर्मध्ये या अभेदकल्पना विहिता, तदेव रूपकम्। अत्र समानधर्मस्य वर्णना न विद्यते। तेन प्रदत्ते लक्षणेऽस्मिन्

भामहलक्षणस्य प्रभावः परिलक्षितः। रुद्रटस्य काव्यालंकारस्य टीकाकारनमिसाधुनये लक्षणे अविवक्षितसामान्या इति पदस्य प्रयोगः विहितः उत्प्रेक्षालंकारात् रूपकालंकारस्य पार्थक्यसूचनाय।

परवर्तिनि समये आचार्यमम्मटस्य रूपकलक्षणमत्यन्तं गुरुत्वपूर्णम्। तन्मते भेदे विद्यमाने सति अपि अतिसाम्यवशात् उपमानोपमेययोः यः अभेदः तदेव रूपकालंकारः। रूपकलक्षणप्रसङ्गे तेन न्यगादि -

"तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः"[vi] इति ।

अस्य लक्षणमिदमुपमालंकारस्य परम्परानुसारम्। भेदे विद्यमाने उपमानोपमेययोः यदि साधर्म्यं स्यात्तदा उपमालंकारो भवति, यदा अभेदः स्यात्तदा रूपकालंकारो भवति। तेन वृत्तौ स्पष्टतया निगदितं 'अतिसाम्यात् अनपह्नुतभेदयोः अभेदः' इति। अर्थात् परस्परविरुद्धधर्मद्वारा उपस्थितस्तथा भिन्नस्वरूपद्वारा प्रकाशितः उपमानोपमेययोः यः काल्पनिकः अभेदः, स एव रूपकालंकारः। यथा 'मुखं चन्द्रः' इत्यत्र मुखत्वं चन्द्रत्वं च रूपे परस्परविरुद्धधर्मद्वारा उपस्थिते भवतः अपि उभययोः मध्ये यः अभेदारोपः तदेव रूपकम्। रूपकालंकारे योऽभेदः सः आहार्यः आरोपितो वा। परं भ्रान्तिमति अलंकारे यः अभेदः आरोपितो भवति स न वास्तविकः परं मिथ्याज्ञानजन्यः। अपह्नुतौ अभेदोऽयम् आरोपितो भूत्वा उपमेयस्य विषयस्य वा निषेधं करोति। तस्मादपह्नुतौ अतिव्याप्तिः न दृष्टा भवति। निगीर्याध्यवसायेन अतिशयोक्तौ रूपकस्यातिव्याप्तिः न भवति। यतो हि रूपके अभेदारोपः गौणसारोपलक्षणास्थले क्रियते परं अतिशयोक्तौ गौणसाध्यवसानलक्षणास्थले विधीयते। अप्पयदीक्षितादयः नवीनाः आलंकारिकाः रूपके लक्षणां न स्वीकुर्वन्ति।

आचार्यमम्मटात्परं आलंकारिकशिरोमणिना अलंकारसर्वस्वरचयित्रा रुय्यकेन प्रदत्तं रूपकलक्षणम् अतीव गुरुत्वपूर्णम्। भेदाभेदतुल्यसादृश्यमूलकानाम् अलंकाराणामालोचनायाः परम् अभेदप्रधानसादृश्यमूलकानाम् अलंकाराणाम् आलोचनावसरे तेन रुय्यकेन आदावेव रूपकालंकारस्य आलोचना विहिता। तेन रूपकलक्षणमेवं भणितम् -

"अभेदप्राधान्ये आरोपे आरोपविषयानपह्नवे रूपकम् "[vii] इति।

अर्थात् उपमेयम् अपह्नुतं न कृत्वा अभेदप्राधान्यवशात् उपमानस्य यः आरोपः क्रियते, तद् एव रूपकम्। वृत्तौ तेन स्पष्टतयोदीरितम्-

"अभेदस्य प्राधान्यात् भेदस्य वस्तुतः सद्भावः आरोपोऽत्रान्यावापः। तस्य विषयविषय्यवष्ट-बन्धत्वाद्विषयस्यापह्नवेऽपह्नुतिः। अन्यथा तु विषयिणा विषयस्य रूपवतः करणात् रूपकम् "[viii] इति।

अतिशयोक्तौ आरोपविषयानपह्नवे इति पदस्य प्रयोगः कृतः रूपके तस्यातिव्याप्तिनिषेधाय। यतो हि अपह्नुतौ विषयः उपमेयं निषेधयति, तस्मात् तत्रातिव्याप्तिर्न भवति। रूपकलक्षणनिरूपणे आचार्ययोः दण्डिरुय्यकयोः मध्ये सादृश्यं परिलक्ष्यते। आचार्यरुय्यकेन वृत्तौ निगदितं - 'साधर्म्यं त्वनुगतमेव'। सादृश्यनिमित्तकालंकारः तेन रूपकालंकारस्य मूलरूपेण स्वीकृतः। 'साधर्म्यं त्वनुगतमेव' इति वाक्यस्य व्याख्यानसमये विमर्शिनीकारेण निरूपितम् -' अनेन च सादृश्यनिमित्त एवारोपो रूपकमित्युक्तं भवति' इति ।रूपकालंकारविषये जगन्नाथः जगाद -

"सादृश्यमूलकमेव च तादात्म्यं रूपकमामनन्ति"[ix] इति।

अत एव वक्तुं शक्यते यत्, आचार्यरुय्यकस्य रूपकलक्षणम् आचार्यमम्मटकृतलक्षणस्य विकसितरूपम् । तस्माद् उभयोः लक्षणे एकीकृत्य वक्तुं शक्यते - 'अपह्नवे आरोपविषये अभेदप्राधान्ये आरोपो रूपकं भवेत्।।' इति।

साहित्यदर्पणकारेणाचार्य-विश्वनाथेन तदीये साहित्यदर्पणे रूपकालंकारलक्षण-प्रसङ्गे भणितम् –

"रूपकं रूपितारोपो विषये निरपह्नवे" ।।[x]इति।

अर्थात् विषयमुपमेयं वा निषिध्य उपमेये उपमानरूपेण निरूपितवस्तुनः यदि अभेदारोपो विधीयते तदा रूपकालंकारो भवति। वृत्तौ निगदितं - 'रूपित इति परिणमनात् व्यवच्छेदः। एतच्च परिणामप्रस्तावे विवेचयिष्यामः। निरपह्नवे इत्युपह्नुतिव्यवच्छेदार्थम्।' लक्षणे रूपित इति पदप्रयोगेन परिणामालंकारात् रूपकालंकारः पृथग्भवति। अपह्नुत्यलंकाररूपकालंकारयोः मध्ये पार्थक्यसूचनाय निरपह्नवे इति पदं दत्तम्। उपमायाः सादृश्यं मुख्यार्थद्वारा प्राप्यते। तस्मादेव उपमायां 'साम्यं वाच्यम्' इति पदं प्रयुक्तम्। रूपकस्य साम्यं व्यङ्ग्यरूपेण प्रतिभाति। गुणक्रियाभ्याम् उपमेयः अन्वितो भवति चेदुपमालंकारो भवति। यथा -'मुखचन्द्रं चुम्बति' इति। उपमानेन सह गुणक्रिये अन्विते भवतः चेत् रूपकालंकारो भवति। यथा-मुखचन्द्रः देदीप्यते इति। सम्यक् विचार्यते चेदेतत्स्पष्टं भवति यदाचार्यविश्वनाथस्य रूपकलक्षणम् अतिव्याप्त्यादिदोषरहितं सुस्पष्टं च।

परवर्तिकाले आचार्येण अप्पयदीक्षितेन स्वकीये चित्रमीमांसाग्रन्थे रूपकालंकारलक्षणमेवं लक्षितं —

"आरोपविषयस्य स्यादतिरोहितरूपिणः।
उपरञ्जकमारोप्यमानं तद्रूपकं मतम्।।"[xi] इति।

अभेदप्रधानालंकाराणां निरूपणावसरे अप्पयदीक्षितेन आदौ एव रूपकालंकार आलोचितः। तन्मते आरोप्यमानोपमानद्वारा तिरोधानरहिते आरोपविषये उपमेये यदुपरञ्जनं तदेव रूपकालंकारः। तस्य लक्षणे प्रदत्तानि आरोपविषयातिरोहितरूपोपरञ्जकादीनि पदानि गुरुत्वपूर्णानि। वृत्तौ तेन स्पष्टतया निरूपितम् - "अत्रारोपविषयस्य इत्यनेन उत्प्रेक्षातिशयोक्त्योः व्यावृत्तिः। तत्र मुखदेशारोपविषयत्वाभावात्। अतिरोहितरूपेण इत्यनेन ससन्देहभ्रान्ति-मदपह्नुतीनां व्यावृत्तिः, तेषु ससन्देहभ्रान्त्यपह्नवैर्विषयस्य तिरोधानात्। उपरञ्जकमित्यनेन समासोक्तिपरिणामव्यावृत्तिः। तयोर्हि नोपरञ्जकत्वम्, विषयेष्वताद्रूप्यापादकत्वलक्षणं समासोक्तौ व्यवहारमात्रसमारोपेण ताद्रुप्यप्रतीतेरेवाभावात्।"[xii] इति।

सप्तदशशताब्द्यां रसगङ्गाधरकारेण आचार्यजगन्नाथेन स्वकीयग्रन्थस्य द्वितीयानने अलंकारसम्बन्धिनी आलोचना विहिता। रूपकालंकारलक्षणप्रसङ्गे तेन निरूपितम् - "उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेणोपमेये शब्दान्निश्चीयमानम् उपमानतादात्म्यं रूपकम्। तदेवोपस्कारकत्वविशिष्टमलंकारः।।"[xiii] इति।

अन्तिमे विभिन्नानामालंकारिकाणां मतमाधारीकृत्य वक्तुं शक्यते यद् रूपकं न केवलमेकं अलंकारमात्रमपि तु काव्यरचनशैल्याः एकं महत्त्वपूर्णतत्त्वम्। उपमाया इव रूपकालंकारस्य व्यापकविस्तृतिः। अस्य रूपकस्य आलोचनावसरे आलंकारिकैः रूपकस्य नैके भेदाः उपभेदाः च कल्पिताः।

रूपकालंकारस्य विभागाः

रूपकालंकारस्य विभागविषये आलंकारिकाणां वैमत्यं दृश्यते। आचार्यभरतेन स्पष्टतया रूपकालंकारस्य विभागो न कृतः परन्तु साङ्गरूपकमिति नाम प्रदत्तम्। आचार्यभामहेन रूपकालंकारस्य द्विविधः विभागः प्रदर्शितः, एकदेशविवर्त्तिरूपकं समस्तवस्तुविषय-रूपकञ्चेति। समस्तैः उपमानैः समस्तेषु उपमेयेषु आरोपः समस्तवस्तुविषयरूपकम्। कतिपयावयवद्वारा आरोपः एकदेशविवर्त्तिरूपकम्।

आचार्येण दण्डिना काव्यादर्शे उपमाया इव रूपकस्यापि नैके भेदा प्रदर्शिताः। ते च १.समस्तरूपकम्, २.असमस्तरूपकम्, ३.समस्तव्यस्तरूपकम्, ४. सकलरूपकम्,

५.अवयवरूपकम्, ६. अवयविरूपकम्, ७. एकाङ्गरूपकम्, ८. युक्तरूपकम्, ९.अयुक्तरूपकम्, १०.विषयरूपकम्, ११. सविशेषणरूपकम्, १२. विरुद्धरूपकं चेति।

आचार्यरुद्रटेन रूपकालंकारस्य विभिन्नाः विभागाः कृताः। तन्मते रूपकं द्विविधं वाक्यरूपकं समासरूपकं च। पुनः समासरूपकं त्रिविधं सावयवरूपकं निरवयवरूपकं संकीर्णरूपकञ्चेति। सावयवनिरवयवरूपके पुनः उभये एव द्विविधे समस्तवस्तुविषयरूपकम् एकदेशीयरूपकञ्चेति।

सर्वस्वकारेण आचार्येण रुय्यकेन रूपकालंकारस्य त्रिविधः भेदः विहितः। ते च भेदाः निरवयवरूपकं सावयवरूपकं परम्परितरूपकञ्चेति। निरवयवरूपकं पुनस्तेन केवलमालाभेदेन द्विधा विभक्तम्। सावयवरूपकमपि तेन समस्तवस्तुविषयैकदेशविवर्तिभेदेन द्विविधम्। परम्परितरूपकमपि चतुर्विधं तन्नये। एवंप्रकारेण रूपकालंकारस्य अष्टविधो विभागो विहितः। तदीयः रूपकविभागोऽयम् अप्पयादिभिः नवीनालंकारिकैः अपि अनुमोदितः। एतद् व्यतिरिच्य दण्डिरुद्रटादीनां वाक्यरूपकसमासरूपकादयो विभागाः तेन स्वीकृताः।

साहित्यदर्पणकारेण आचार्यविश्वनाथेन रूपकालंकारस्य भेदोपभेदविषये सविस्तरम् आलोचना प्रदर्शिता। मन्ये, स मम्मटादिभिः आलंकारिकैः प्रभावितो भवति। विश्वनाथनये परम्परितसाङ्गनिरङ्गभेदेन रूपकालंकारः त्रिविधः—

यदि एकः आरोपः अपरम् आरोपितं प्रति कारणं भवति तदा परम्परितरूपकालंकारो भवति। परम्परितरूपकमपि पुनः श्लिष्टाश्लिष्टभेदेन द्विविधम्। परम्परितरूपकस्य लक्षणविभागप्रसङ्गे तेन निरूपितं-

" यत्र कस्यचिदारोपःपरारोपणकारणम्।
तत्परम्परितं श्लिष्टाश्लिष्टशब्दनिबन्धनम्।
प्रत्येकं केवलं मालारूपञ्चेति चतुर्विधम्।।" [xiv]इति ।

श्लिष्टपरम्परितरूपकम् अश्लिष्टपरम्परितरूपकं चेति मालाकेवलभेदेन द्विविधम्। एवं परम्परितरूपकं साकल्येनाष्टविधम्। निम्ने श्लिष्टपरम्परितरूपकस्योदाहरणं प्रदीयते –

"आहवे जगदुद्दण्ड राजमण्डलराहवे।
श्रीनृसिंहमहीपाल स्वस्त्यस्तु तव बाहवे।।" इति।

उदाहरणेऽस्मिन् राजमण्डलपदं श्लिष्टं द्व्यर्थवाचकं वा। अस्यैकः अर्थस्तावत् राजमण्डलम् अपरो हि चन्द्रमण्डलम् । अपि च अस्य आरोपः विजिगीषोः राज्ञः बाह्वोः तथा राहोः

विहितः। यतो चन्द्रराह्वोः शत्रुता सर्वजनविदिता। अत्र एक एव आरोपः अन्यम् आरोपं प्रति कारणं भवति। तस्मादेवात्र श्लिष्टपरम्परितरूपकं दृष्टम्।

अङ्गयुक्ते उपमेये अङ्गयुक्तस्य उपमानस्य यदि आरोपः भवति तदा साङ्गरूपकं भवति। समस्तवस्तुविषयरूपकम् एकदेशविवर्तिरूपकं चेति भेदेन साङ्गरूपकं द्विविधम्। अस्य लक्षणविभागविषये आचार्येण विश्वनाथेन भणितम् -

" अङ्गि यदि साङ्गस्य रूपणं साङ्गमेव तत्।
समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्ति च।। " इति।

आरोप्योपमानानि सर्वाणि शब्दवाच्यानि भवन्ति चेत् समस्तवस्तुविषयकसाङ्गरूपकं भवति। किञ्च, किमपि आरोप्योपमानं यदि अर्थगम्यं भवेत्तदा तत् एकदेशविवर्ति साङ्गरूपकं भवति। तदुदाहरणं यथा –

" रावणावग्रहक्लान्तमिति वागमृतेन सः।
अभिवृष्य मरुत् सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदधे।।" इति।

उदाहरणेऽस्मिन् मेघावग्रहामृतशस्याः हि उपमानभूताः। एतेषामुपमानानाम् अङ्गी हि मेघः, अवग्रहादयस्तस्य अङ्गभूताः। पक्षान्तरे, कृष्ण-रावण-वाक्-मरुतः उपमेयाः। कृष्णोऽत्र अङ्गी, रावणादयस्तस्याङ्गानि। अत्र अङ्गिनि कृष्णरूपे उपमेये अङ्गिमेघरूपोपमानस्याभेदारोपो भवति। अपरतः उपमेयस्य कृष्णस्याङ्गभूतेषु रावण-वाक्य-मरुत्प्रभृतिषु उपमानस्य मेघस्याङ्गभूतानाम् अवग्रहामृतशस्यादीनां यथाक्रमम् आरोपे सति रूपकालंकारसङ्गतिर्घटते।

निरङ्ग इति नाम्ना एव अवगम्यते यत् यस्य अङ्गं नास्ति। अङ्गरहितोपमानस्य अङ्गिनि उपमेये अभेदारोपो भवति चेत्तदा निरङ्गरूपकं भवति । मालाकेवलभेदेन रूपकमिदं द्विविधम्। तदुदाहरणं यथा -

"निर्माणकौशलं धातुश्चन्द्रिका लोकचक्षुषाम्।
क्रीडागृहमनङ्गस्य सेयमिन्दीवरेक्षणा।।" इति।

अत्र अङ्गीन्दीवरेक्षणारूपे उपमेये विधातुः निर्माणकौशलं, लोकलोचनचन्द्रिका, अनङ्गानां क्रीडासमूहाः चेत्यादीनि अङ्गिभूतानि उपमानानि मालावत् अभेदारोपितानि भवन्ति। तस्मादेव उदाहरणमिदं निरङ्गिमालारूपकनिबद्धम्। एवम्प्रकारेणाचार्येण विश्वनाथेन रूपकस्य अष्टविभागाः प्रदर्शिताः। एतद् व्यतिरिच्यापि तेन अधिकारूढवैशिष्ट्यसंज्ञकं रूपकम् आलोचितम्।

सप्तदशशताब्द्याः आलंकारिकेण आचार्यजगन्नाथेन प्राचीनमतानुसारं रूपकम् अष्टविधमिति प्रदर्शितम्। एतद् व्यतिरिच्यापि तेन वाक्यार्थोपमा इव वाक्यार्थरूपकं स्वीकृतम्।

रूपकालंकारालोचनायाः परिशेषे वक्तुं शक्यते यत् आरोपमूलकालंकाराणां मूलभूतालंकारस्तावत् रूपकालंकारः। न केवलं संस्कृतसाहित्येषु अपि च संस्कृतेतरसाहित्येषु अपि रूपकस्य प्रयोगाधिक्यं दृश्यते। आङ्गलसाहित्यस्य 'metaphor' इत्यनेन सह रूपकालंकारस्य सादृश्यं प्रत्यक्षीभूतं भवति।

तथ्यसूत्राणि

[i] ना.शा.-१६।५६-५७

[ii] का.अ.(भामह)-२।१३

[iii] का.द.-२।६६

[iv] का.लं.सा.सं.-२।२२

[v] काअ.(रुद्रट)-८।३८

[vi] का.प्र.१०/१३९

[vii] अ.स.सूत्रं २६

[viii] तदेव वृत्तिः

[ix] रस.ग. पृ.२९७

[x] सा.द.-१०।२८

[xi] चित्र.मी.सम्पा.कालिकाप्रसाद शुक्ला, पृ.१६१

[xii] चित्र..मी.पृ.१६२

[xiii] रस.ग.सम्पा.मथुरानाथ शास्त्री, पृ-२९७

[xiv] सा.द.सम्पा.कृष्णमोहन शास्त्री, पृ.६३८.

अनुशीलिताग्रन्थसूची

1. अवस्थी, ब्रह्ममित्रः. *अलंकारकोषः*. दिल्ली: इन्दुप्रकाशन्, १९८९.
2. आनन्दवर्धनः. *ध्वन्यालोकः*. सम्पा. विष्णुपदभट्टाचार्यः. कोलकाता: संस्कृतसाहित्यपरिषद्, १९८३.
3. उद्भटः. *काव्यालंकारसारसंग्रहः*. सम्पा. नारायणदास-वनहट्टी. पूना: भाण्डारकर-ओरियन्टाल्-रिसार्च्-इन्स्टिटिउट्, १९८२.
4. जगन्नाथः. *रसगङ्गाधरः*. सम्पा. मथुरानाथशास्त्री. वाराणसी: मतिलालवनारसीदासः, १९९०.
5. दण्डी. *काव्यादर्शः*. सम्पा. चिन्मयीचट्टोपाध्यायः. कोलकाता: पश्चिमबङ्गराज्यपुस्तकपर्षद्, १९९५.
6. दाशगुप्तः, सुरेन्द्रनाथः. *काव्यविचारः*. कोलकाता: चिरायतप्रकाशन्, २००४.
7. वामनः. *काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः*. सम्पा. अनिलचन्द्रवसु. कोलकाता: संस्कृतवुक्-डिपो, २००७.
8. विश्वनाथः. *साहित्यदर्पणः*. सम्पा. कृष्णमोहनशास्त्री, वाराणसी: चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्, २०१४.
9. भामहः, *काव्यालंकारः*. सम्पा. रामानन्दशर्मा, वाराणसी: चौखम्बासंस्कृतसिरिज्-अफिस्, २०१३.
10. भरतः. *नाट्यशास्त्रम्*. सम्पा. पारसनाथद्विवेदी. वाराणसी: सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, २००९.
11. भट्टाचार्यः, अमियकुमारः. *साहित्येर दोष गुण ओ अलंकार प्रसङ्गे आचार्य मम्मट*. कोलकाता: संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, २०१२.
12. मम्मटः. *काव्यप्रकाशः*. सम्पा. वामनाचार्यः. दिल्ली: परिमल् पाब्लिसार्स्, २००८.
13. मिश्रः, जयमन्तः. *काव्यविच्छित्तिमीमांसा*. निउ दिल्ली: राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्, १९९८.
14. रुय्यकः. *अलंकारसर्वस्वम्*. सम्पा. रेवाप्रसादद्विवेदी. वाराणसी: चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्, १९३९.
15. रुद्रटः. *कव्यालंकारः*. सम्पा. रामदेवशुक्लः. वाराणसी: चौखम्बाविद्याभवनम्, १९६२.

ISSN No. 2321-9076